একুশে লিটলম্যাগ

বিশেষ
তারাশঙ্কর
সংখ্যা

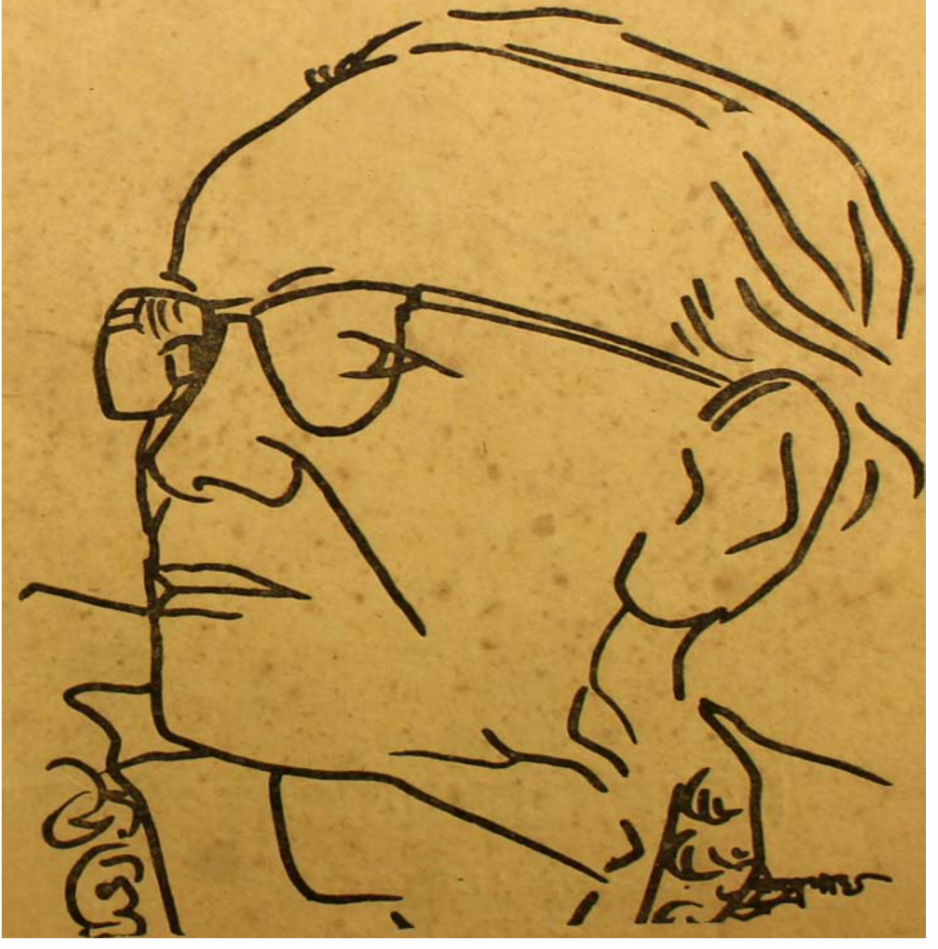

With best Compliments of

HAZRA SYNDICATE

AE-137, SALT LAKE
CALCUTTA-700064

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষ ৩ □ সংখ্যা ১-৩ □ ১৯৯৮
(জানুয়ারি—সেপ্টেম্বর)

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস
সহযোগী □ সুমিত্রা দস্তচৌধুরী

যোগাযোগ □ এন ২১, নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১
দূরাভাষ : ৫১২-২০৬৪

With best Compliments from

A WELL WISHER

Halmira Estate Tea Pvt, Ltd.

23/24, Radhabazar Street
Calcutta-700001

একুশ শতাব্দী

(মাঘ ১৪০৪—আশ্বিন ১৪০৫)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়—৮

সাহিত্যজীবনের রূপরেখা : তারাশঙ্কর ☐ তারাপদ আচার্য ৯

সুন্দর ও তারাশঙ্কর ☐ সুমিতা চক্রবর্তী ২৫

তারাশঙ্করের গল্প ☐ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ৪১

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজ গতির ধারা ☐ অলোক রায় ৫৮

সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লেখক তারাশঙ্কর ☐ সরোজ মোহন মিত্র ৬৭

তারাশঙ্কর : সৃষ্টি মনন এবং প্রগতিশীলতা ☐ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮

সেই নারী, নামে 'সারী' ☐ উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৯১

তারাশঙ্করের গান ☐ কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ৯৫

নাট্যকার তারাশঙ্কর ☐ পরিমল ঘোষ ৯৯

আঞ্চলিকতার প্রশ্নে ধাত্রীদেবতা ☐ সাগর বিশ্বাস ১০৩

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সময়ের নিখুঁত ছবি ☐ কিন্নর রায় ১১৩

বসন্ত উৎসব : দোল পূর্ণিমা ☐ সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯

তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত চিঠি ☐ কমল মমিন ১২৪

গ্রন্থপঞ্জী ☐ ১৩০

প্রচ্ছদ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাধরা আলোচনার বাইরে জন্মশতবর্ষে তারাশঙ্করের উপন্যাস ও গল্প নিয়ে নতুন আলোচনা যা সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অপরিহার্য।

অলোক রায়ের

তারাশঙ্কর দেশকাল

নিউ লাইট

১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

—কলকাতা-৭০০০০৯

With best Compliments from :

GOPAL HARDWARE

30, Krishnagopal Jeu Road
Birati
Calcutta-700051

SUVRIDHI FINANCIAL SERVICES LTD

M/s. Triveni Steel & Forging

23A N. S. ROAD, CAL-I
5th Floor, Room-19

উত্তর ২৪ পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনভবন, বারাসাত

স্বল্প সময়ে জলাভূমির উন্নতি সাধন ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবে নিবিড় মৎস্য চাষের একমাত্র দিশারী "উঃ ২৪ পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা" মীন ভবন বারাসাত।

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারীক তথা জেলায় মুখ্য কার্য্য নির্বাহী আধিকারীক ও সহঃ মৎস্য অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য

চেয়ারম্যান, এফ. এফ. ডি. এ. এবং

সভাধিপতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ, বারাসাত

শ্রীঅরুণ মিশ্র আই. এ. এস

জেলা সমাহর্তা

উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত

শ্রীনির্মলেন্দু বোস

মুখ্য কার্য্য নির্বাহী আধিকারীক

উঃ ২৪ পরগণা মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা

বারাসাত

বিশরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। কারণ পঞ্চায়েত আপনার, আপনিও কাজের অংশীদার।

অভিনন্দনসহ—

দিলীপ সেনগুপ্ত

প্রধান,

বিশরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

উত্তর ২৪ পরগণা

Good wishes from

A WELL WISHER

Ratan Khan

২৫ বৎসর ধরে বহু সুখ-দুঃখের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর আজ আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষে উপনীত। এই উপলক্ষে আমাদের সমস্ত সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও কর্মী বন্ধুদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আগামী দিনে উষার কিরণ আলোকিত করুক আমাদের সকল সদস্যদের জীবনের চলার পথ।

উষা মিউচ্যুয়াল বেনিফিট সোসাইটি লিঃ

২, দুর্গা চরণ ডাক্তার লেন,
কলিকাতা-১৪, দূরভাষ : ২৪৪-৪১৬৮
(ভারত সরকার দ্বারা "মিউচ্যুয়াল বেনিফিট সোসাইটি" হিসাবে ঘোষিত)

২৫ বছর সদস্যদের সেবায় নিয়োজিত।

Tushar Kanti Bhadra

18, West Kamalapur
Dum Dum Cantt. Calcutta-700028

Manufacturer of Round Screen Printirng Machine & Synthetic Gum Tube Sealling Machine. Also help learn silk screen printing & synthetic gum manufacturing process.

শিশু শিক্ষার বিশ্বস্ত বিদ্যালয়

নব শিশু নিকেতন

বিশরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রকাশিত হলো বিষ্ণু বিশ্বাসের গল্পের বই

সাত পুরুষের গোরস্থান

একুশ শতাব্দী

● সম্পাদকীয়

অবশেষে তারাশঙ্কর সংখ্যা বের করতে পেরে আমরা খুশি। ভারমুক্ত। সমকালীন বাঙলা সাহিত্যের যে সকল খ্যাতিমান লেখক এ সংখ্যায় লিখলেন তাঁদের জন্য অভিনন্দনের বদলে উত্তমর্ণের আসন পাতা রইলো। অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও অলোক রায় তাঁদের প্রকাশিতব্য বই-এর অংশবিশেষ তুলে দিয়ে পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়েছেন। ঢাকা থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক কমল মমিন 'তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত চিঠি' শীর্ষক লেখাটি পাঠিয়ে সময়ের দায়ভার বহন করেছেন।

পরিকল্পনা পর্বেই আমরা বাঙলা প্রকাশনা জগতের সেইসব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের আবেদন জানিয়েছিলাম যাঁরা তারাশঙ্করের বই কিংবা তারাশঙ্কর সম্পর্কিত বই প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে একটি প্রতিষ্ঠানও সে আবেদনে সাড়া দেননি। প্রকাশনা-জগতের বাইরে থেকে যাঁরা সামান্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এ সংখ্যায় তারাশঙ্করের একটি সামগ্রিক গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশ করা হলো। এটা করতে গিয়ে দেখা গেছে এবিষয়ে নানান অসঙ্গতি ও তথ্যভ্রান্তি এখনও বহাল আছে। সেইসব অসঙ্গতির জট খুলে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা থাকলেও এ তালিকা অকাট্যতার দাবি রাখছে না। তারাশঙ্করের প্রকাশিত বইয়ে খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ খুব কম দেখা যায়। পাঠকের সুবিধার্থে বাঙলা সালের পাশাপাশি সম্ভাব্য খ্রিস্টীয় সাল উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাপাখানার ভুত কাউকেই ছেড়ে কথা কয়না। অতএব সামান্য ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। কিছু কিছু শব্দে বানানের হেরফের থাকবে, যেমন করল / করলো, কোন / কোনো এইরকম। এক্ষেত্রে লেখকের ইচ্ছে ও প্রবনতা বজায় রাখা হয়েছে। কোনো কোনো লেখায় কিছু বিতর্কের গন্ধ থাকলেও চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়নি।

সুধী পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। □

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ॥ বড়দিদি ৮·০০ ॥ পরিণীতা ৮·০০ ॥ চন্দ্রনাথ ৯·০০ ॥ পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ॥ বিরাজ বৌ ১২·০০ ॥ অরক্ষণীয়া ৮·০০ ॥ বামুনের মেয়ে ১০·০০ ॥ গৃহদাহ ১৮·০০ ॥ গল্প সংকলন ১৮·০০ ॥ নিষ্কৃতি ৮·০০ ॥ স্বামী ৮·০০ ॥ পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ॥ নববিধান ৮·০০ ॥ বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৫·০০ ॥ রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ॥ কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ॥ মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ॥ দত্তা ১৫·০০ ॥ চরিত্রহীন ২০·০০ ॥ পথের দাবী ১৮·০০ ॥ কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ॥ প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ॥ নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ॥ বিজয়া ১০·০০ রমা ৯·০০ ॥

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ॥ পথের দাবী ২০·০০ ॥ চরিত্রহীন ২২·০০ ॥ দেনা-পাওনা ১৮·০০ ॥ শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ॥

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ॥ সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ॥

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-১৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

সাহিত্যজীবনের রূপরেখা ঃ তারাশঙ্কর

তারাপদ আচার্য

১

জীবনের পঞ্চাশ বছর বয়সসীমায় পৌঁছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৮ ১৯৭১] আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। এটি প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' নামক সেকালের বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় 'আমার সাহিত্য জীবন' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৩৬০ সালে [অর্থাৎ ১৯৫৩] সেটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই গ্রন্থে লেখক শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যজীবনী লেখেননি, এতে অনেক আটপৌরে দৈনন্দিনের কথা আছে, অনেক আত্মপ্রশংসা ও আত্মপ্রচারও আছে। অবশ্যই সেটা দোষাবহ নয়। কেননা, তাঁর মতো অতো প্রতিষ্ঠিত লেখকের দিক থেকে এসব জানতে পারার সুযোগ পেলে পাঠকরা যে উপকৃত হবেন, সে খুবই স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেই আমাদের এই লেখার অবতারণা। তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাসের প্রসঙ্গ এসে পড়বে মাঝে মাঝে। আমরা মনে রাখছি, যে-কোনো কথাশিল্পীর রচনার মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের অনুসঙ্গ এসে পড়ে। এছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একধরণের প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতার জন্যই তাঁরা লেখেন আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস। এই অর্থে অনেক বিদেশী ঔপন্যাসিকের মতো আমাদের শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' [সমগ্র], বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্করের সমস্ত লেখা পড়লে বোঝা যায় যে, সাধারণ ভাবে তিনি খুব সহজ-সরল রেখায় এঁকেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মানব-মানবীর ছবি। খুব একটা জটিল নগরজীবনের রূপরেখা, যা দেশকে ছাড়িয়ে আরো দূরের পৃথিবীকে, মানুষকে, যুগযন্ত্রণাকে এবং যুগোত্তীর্ণ মানববিশ্বকে অনুসরণ করতে চায়, তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে তার কোনো প্রকাশ নেই। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা,

জ্ঞানার্জন, প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেই তিনি আবর্তিত হয়েছেন। ফলে, অনেকক্ষেত্রে সরল এবং একমাত্রিক হয়ে উঠেছে তাঁর লেখা। কিন্তু তাতে আছে সৃজনশীল মনের আশ্চর্য ছবি :

'হঠাৎ আমার ছ'বছরের কন্যা বুলু মারা গেল।

আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবনের প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু'নৌকায় দু'পা রেখে চলা—তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় ক'রে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না এলে বোধহয় তা হ'ত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না পড়তাম, তবে বেদনা রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।'

এই সময় থেকেই তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুধুমাত্র সাহিত্যকে অবলম্বন করে আবর্তিত হতে শুরু করলো। রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি টেনে এভাবেই তিনি পুরোপুরি সাহিত্যনির্ভর হয়ে উঠলেন।

যে-কোনো লেখকের একটি অন্তর্জীবন এবং একটি বহির্জীবন থাকে। বহির্জীবন কোনো অর্থেই কিন্তু তুচ্ছ নয়। কেননা, সেখান থেকেই তো অভিজ্ঞতার উপাদান মিলে যায়, যা না হলে অন্তর্জীবনের ভিতর থেকে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন বলতে যা বোঝায় তা হলো রাঢ়-বঙ্গের লৌকিক জীবনের কথা। এবং সেই সঙ্গে আছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণীর অভিজাত্য, দম্ভ, শিল্পসঙ্গীতপ্রীতি, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার-না-মানা। এই হার-না মানা চরিত্রগুলির যে মানবিক উপাদান, সেটাই তো সর্বকালের আধুনিক মানসতা। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তরুণ বয়সে তারাশঙ্করের এক আশ্চর্য শ্রাম্যমান জীবন ছিল। ছোটো ধরনের জমিদার পরিবারের সন্তান তিনি। কিন্তু উদাসিক নন, সাধারণ গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া এবং তাদের জীবনের অনুপুঙ্খ জেনে নেওয়ার যে প্রবণতা, আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আলোকিত বোধ করি। এভাবেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তখন বৃটিশ যুগ, সেজন্য রাজনীতি করা লোকদের অন্যতম ভূমিকা ছিল জনসেবা। আজকের মতো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি। দেশবাসীর সেবাই ছিল তাঁর আদর্শ। এজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে। তবে এই যে বেরিয়ে পড়া, লোটা-কম্বল নিয়ে ঘুরে

বেড়ানো. প্রধানত বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া,—এর মধ্যেই নিহিত তাঁর ভবিষ্যতের পথরেখা,—তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো পটভূমি :

'দেশসেবার বাতিক যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাতে আর কৃত্রিমতা থাকে না। বাংলা সাহিত্যে বাউণ্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খমানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র ; কিন্তু সকল বিপদ আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারীতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মত আবির্ভূত হয়েছে ; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ঐ রকম। মদ গাঁজাটা খাই না—কিন্তু তারও চেয়ে কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি, ঘুরে বেড়াই। বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪/২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ'মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয়নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রী দেবতা'র মধ্যে আছে।'

জীবনের এই অভিজ্ঞতা কাজে আসছে। যখন বুঝতে পারছিলেন না যে, কোন পথে তিনি চলবেন, রাজনীতি না সাহিত্য, তখন অনেকটা ঘোরের মধ্যে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে থাকতে থাকতে তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠছিল, যদিও গান্ধীবাদী রাজনীতির পথ ছিল তাঁর পথ, তবুও তিনি নিজেরই অজ্ঞাতসারে বুঝতে পারছিলেন তাঁকে সরে আসতে হবে ও-পথ থেকে। মূলত লেখালেখির পথই তাঁর পথ, তাঁর জীবনের ভবিতব্য। সেজন্য তিনি ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছিলেন এই ভাবনায় যে, লেখক হিসেবেই তাঁকে দাঁড়াতে হবে। একটি আশ্চর্য কঠিন-কঠোর মানসতা ছিল তাঁর, সাধনা ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠানো গল্প যখন অনুমোদিত ও প্রশংসিত হচ্ছিল, তখন তিনি

বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর নিজস্ব পথে চলা শুরু হলো। তাছাড়া আদর্শগত একটা বিশ্বাস ও চরিত্রশক্তি তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বিশেষত কন্যা বুলু-র মৃত্যুর পর তিনি লিখলেন 'বাণী মা' গল্প। এই গল্পের বিশ্লেষণধর্মী ভাবনার মধ্যে তারাশঙ্কর তাঁর ভিতরকার বড়ো-আমি-কে যেন আশ্চর্যভাবে জাগিয়ে তুলেছেন বলে মনে হয়ঃ

'বাণীর আগে একটি মেয়ে ছিল। কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম বুলবুল। বুলবুল সংক্ষিপ্ত হইয়া শেষে বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল। প্রথমটা সে আঘাতে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি, অদ্ভুত অপূর্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালোবাসিতে পারে, শোকের নির্মম আঘাত না পাইলে সে উপলব্ধি মানুষ করিতে পারে না। নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মত হৃদয়ের আবরণটা না ভাঙিলে অন্তস্তলের শস্য পানীয়ের অমৃত স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু শোক চিরদিন থাকে না। চিরদিন কেন, বোধ করি, যে সুখকে মানুষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আক্ষেপ করে, তার চেয়েও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। শোক আস্বাদে অতি তীব্র অপূর্ব, তার প্রভাব অতি-অতি পবিত্র। শোক মানুষকে উদার করে পঙ্কিল হীনতার ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়, সে শোক অল্পক্ষণ স্থায়ী।'

এই যে প্রতীতি এবং এই যে দার্শনিক প্রজ্ঞালোক উন্মোচিত হয়ে উঠেছে এখানে, তা একজন যথার্থ লেখকের চরিত্র। লেখাই তাঁর জীবনধর্ম।

এর পরও, রাজনীতি থেকে সরে আসার পরও তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান জীবন কাটিয়েছেন। নানা জায়গায় ঘুরেছেন, নানা মানুষের সাহচর্যে এসেছেন। তাঁরা খুব শিক্ষিত না হলেও তাঁরা যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী, সে অতি স্বাভাবিক। তারাশঙ্করকে বহু বহুদূর দেশে যেতে হয়নি। তাঁর বাসস্থানের নিকটবর্তী গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে শুধু মানুষ দেখেছেন, পেয়েছেন তাদের ভালোবাসা, দেখেছেন তাদের শঠতা-কাপুরুষতা, তাঁদের অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয় এর ভিতরে মিলেছে অন্যতম আরেক মানব জীবনধারা। এই তুচ্ছ অতি সাধারণ মানুষের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে সব মহৎ মানবপ্রাণ। তাদের ঔদার্য একেবারে আকাশছোঁয়াঃ

'পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপ-পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।'

এই যে ঘুরে বেড়ানো, গ্রামে গ্রামে মেলায় মেলায়, নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে এবং বৈষ্ণবদের আখড়ায় অথবা যাত্রাপালা. ঝুমুর, কবিগান—এসবের মধ্যে যে লোকজীবনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, লেখক তারই মধ্যে নিমজ্জিত থেকে আশ্চর্য সব জীবনরস আস্বাদন করেছেন এবং আহরণ করেছেন আবহমান মানবসম্পর্কের অনেক মণি-মানিক্য-হীরে-জহরত :

'দিন কয়েক পরেই এলাম একটি নিবিড় পল্লীগ্রামে। আমাদেরই মহলে। যেখানে বাসা হ'ল, তার সামনে একটি ছায়ানিবিড় আখড়া, বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোক বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজনে রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ! বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। আমি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরই ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটী ক'রে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে একখানি ঝকঝকে মাজা রেকাবীতে দু'খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো-কয়েক দারুচিনি, একটি ছোট এলাজ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে—বললে, প্রভুর জয় হোক।'

এইসব অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে 'রসকলি' এবং 'রাইকমল' নামক আশ্চর্য সব রচনা। বৈষ্ণবীয় আখড়ার মতো লেখক ঘুরেছেন বেদের দলের জমায়েতে বা অস্থায়ী তাঁবুতে, তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে এবং কিছু গল্পে তার অনুসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। লোকজীবনের কথা তিনি বলেছেন 'কবি' উপন্যাসে। এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। তাদের বাস্তব প্রেক্ষাপট এতোই প্রবল ও যুগান্তকারী যে, তাতে বোঝা যায় লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা কতোটা অকৃত্রিম। তারাশঙ্করের আরেকখানি মহৎ উপন্যাসের নাম 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।' হাঁসুলী বাঁকের কাহার বাউরীদের বাস্তব জীবনছবি এই লেখা। এইসব অবহেলিত অন্তজশ্রেণীর মানুষদের কী নিবিড় ভাবেই না অনুধাবন করেছেন লেখক। এ সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন' নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকালবেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার 'কবি' উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প শোনে। রাজা পয়েন্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে, নাকছবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে—হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভাল আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে?'

জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার এই যে পটভূমি—এতে কোনো ফাঁকি নেই। ফলে তারাশঙ্করের সাহিত্যকীর্তির মধ্যপর্ব পর্যন্ত যেসব মানবমানবীর সঙ্গে পাঠকের দেখা মেলে তাদের সবার বিষয়ে লেখক যেন অবলীলায় বলে দিতে পারেন এই রকম সব কথা: 'আমার 'কবি' উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই।' ফলে, এই মানুষরা যেন তাঁর ভিতরে চলে আসে একেবারে। অবশ্যই তা আসে। যাদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করেন, পরিচিত হন, পরম আত্মীয়তার সম্পর্কে বাঁধা পড়েন, তারা সবাই তো তাঁকে নসুবালার মতো করে কুশল জিজ্ঞাস করে: '—হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে?' শুধু তাই নয়, এই বাস্তব পরিবেশের মানবমানবীরা তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করে অনেকটা ভিন্নতর হয়ে যায়। প্রকৃতিজগতের সম্পূর্ণ কাঁচামাল তো আর সাহিত্য হতে পারে না। তার সঙ্গে এসে মেশে লেখকের মনের কল্পনা-মণীষা। এ সম্পর্কে গভীর তত্ত্বকথা খুব সহজ করে বলেছেন তারাশঙ্কর। বলেছেন আপন প্রজ্ঞালোক থেকে:

'আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল।

শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হ'ল, আমি কেমন করে অচিন্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে

সোনার কাঠি ছুঁড়িয়ে গেলাম। যার স্পর্শে ঘুমন্ত অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্প লেখার ও টেই একটা বড় সমস্যা। সবই হয় কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী —তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন—আর মন্ত্রই বলুন—এটা কারুর কাছ থেকে শিখেছেন কি না—অথবা শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কি না। তবে আমার মনে হয়—ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন ক'রে জানি না—শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে—ফুটে ওঠে এইটুকুই আমার সম্বল।'

লেখক এই যে সম্বলের কথা বলেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে, তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমস্ত লেখাটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি—সে খুবই দুর্লভ, আর সেজন্যই একে বলে প্রতিভা। প্রতিভাহীন অগণিত কবি-সাহিত্যিক আছেন পৃথিবীতে, তাঁরা অনেক লিখেছেন, কিন্তু কি এমন এসে যায় তাতে? সেসব লেখা তো একদিন হারিয়ে যায়, কেউ মনে রাখে না। অথচ, সেই আদিকালের নাম-না-জানা শিল্পীর গুহাচিত্র অথবা ভগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভাস্কর্য, সেসবের সংগ্রহ আমাদের অভিভূত করে। কেননা, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের প্রাণিত করে, জীবনকে শত-সহস্রধারায় উন্মোচিত করে দেয়—আমরা জীবনের একটা অন্যতর মানে পেয়ে যাই। এই অর্থে, গ্রীক্ নাটক, ঋগ্বেদের কিছু সূক্ত, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ—এঁদের লেখায় আছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ফলে, সে লেখা বা সে শিল্প কোনোদিন মরে না। এই যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি, এ কেউ শাস্ত্রপাঠ বা জ্ঞানার্জনের সাহায্যে লাভ করেন না। এ শক্তি সহজাত। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, জ্ঞানার্জনের সাহায্যে এ শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশে সহায়তা মেলে।

৩

অবশ্যই তারাশঙ্করের লেখায় এ শক্তির অনেক প্রমাণ আছে। তাঁর সমস্ত লেখাতে যদি এই 'প্রাণশক্তি' অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে ভুল হবে। তাঁর অজস্র সাধারণমানের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে প্রবল ও ভাস্বর হয়ে থাকে 'রাইকমল' 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম,' 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' প্রভৃতি। আর গল্প বলতে যেসব যুগান্তকারী লেখাগুলির কথা মনে আসে, তা হলো 'রাইকমল,' 'মালাচন্দন', তারপর 'জলসাঘর,' 'যাদুকরী,' 'তারিণী মাঝি' ও

'অগ্নিদানী'। উল্লেখ থাকা ভালো যে 'রাইকমল' প্রথম গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'রাইকমল' উপন্যাসে।

'গণদেবতা' [১৯৪০] উপন্যাসে তারাশঙ্কর শুনতে পেয়েছিলেন অনাগত নতুন যুগের পদধ্বনি। বাঙলার গ্রাম-সমাজের প্রচলিত কাঠামো যে ভেঙে পড়ছে এবং সেখানে নির্মিত হচ্ছে গণজীবনের নতুন ইমারত, সেকথা লেখকের ভ্রাম্যমান জীবনের প্রেক্ষাপটে ধরা পড়েছিল। এই অর্থে 'গণদেবতা' যুগপরিবর্তনের উপন্যাস। রূপান্তরের রেখাচিত্রটি তারাশঙ্কর যে ভাবে এঁকেছেন :

[১] 'নাপিত বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার সবাই আমাদের [গিরিশ-অনিরুদ্ধের মতো গ্রামের মানুষদের] ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে—ওই অল্প ধান দিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ির দোরে অর্জুনতলায় খান কয়েক ইট পেতে রয়েছে, বলে, 'পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও—'

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে একটি গাছ কাটার ঘটনা। বিক্রী করে দেবে বলে রহম শেখ একটি তালগাছ কেটেছিল।

[২] 'গাছটা তাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনোদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল। একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেটাই আসল কথা। তিন পুরুষের মধ্যে ওই গাছটার স্বামীত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই। তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যে-বাবুকে। রহমের বাপ জমি বিক্রী করিবার পর বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে—রহমও চষিতেছে। কোনোদিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই, জমিটা তাহাদের নয়।'

যে-কোনো সৃষ্টিশীল মন এভাবেই দেখতে পায় যুগের পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ব্যাপারটি 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও আছে। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র চাষী অথবা ক্ষেতমজুরকে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তুই-তুকারী করে কথা বলেন। করালী কাহার এর প্রতিবাদ করেছিল, যেমন প্রতিবাদ করেছিল 'গণদেবতা' উপন্যাসের দেবু ঘোষ। সে-ও কানুনগো-কে তুই-তুকারীর

জবাবে তুই-তুকারী করেছিল।

এই ধরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিত আরো আছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে অথবা 'জলসাঘর' গল্পে। এখানে শিবনাথ এবং বিশ্বম্ভর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। তাঁরা ব্যবসাবৃত্তির কাছে মাথা হেঁট না করলেও সামন্ত-আভিজাত্যের যে অবসান ঘনিয়ে আসছে, সে খুব প্রবলভাবেই বুঝেছিলেন তারাশঙ্কর। শিবনাথ চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায়। আর, বিশ্বম্ভর তাঁর দেখা বা জানা কোনো সামন্ত-প্রতিভূ।

এই প্রসঙ্গে পৌঁছবার পূর্বে আমরা লেখকের একটি যুগান্তকারী উপন্যাসের কথা বলে নিতে পারি। উপন্যাসটির নাম 'কবি'। এখানে একটি প্রেমের ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব আছে। তার একদিকে বসন, অপরদিকে ঠাকুরঝি, আর, মাঝখানে নিতাই কবিয়াল। এই লেখায় তিনি যথার্থ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতায় অমৃতফল বলতে যেগুলিকে বোঝায় 'কবি উপন্যাসটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

এখানে বাস্তব জীবনসত্যে বিধৃত মানবমানবীরা যেন প্রাণ পেয়ে সজীব ও সচল হয়ে আছে। অবশ্য 'কবি'র মতো 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' সম্পর্কেও একথা সত্য।

৪.

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ চরিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষত তারাশঙ্কর নিজেই আছেন। তাঁর জীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলির সম্পূর্ণ অবয়ব এখানে ধরা পড়েছে বলেই মনে হয়। এই উপন্যাস এবং 'জলসাঘর' গল্প একেবারেই প্রতীকধর্মী রচনা। সামন্তদের জীবনের যে মহৎ দিকটি এইসব লেখায় প্রতিফলিত, সেসব চরিত্রের মানুষের সংখ্যা খুবই বিরল ছিল। কেননা, সমস্তপ্রভুরা তো প্রজা সাধারণের ওপর অত্যাচার করেছেন এবং শোষণ করেছেন। এর থেকেই এসেছে গণ-অভ্যুত্থান। পৃথিবীর সবদেশেই এটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সুখে-দুঃখে সহায়তা দান, জমিদার ও সাধারণ প্রজার মধ্যে কোনোরকম ভেদরেখা বজায় না রাখা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো নিয়ে তাঁর যে ব্যক্তিজীবন, সেটা একেবারে সামন্তপ্রভুদের উল্টোপিঠ। একারণেই তিনি জমিদার হয়েও শোষণ ও শাসন-বিমুখ এক মুসাফির মানুষ। তাঁর ঔদার্য ও মানবপ্রীতির নিদর্শন :

'মেয়েটি চলিয়া গেল ; তাহার পদক্ষেপের মধ্যেও সমতা নাই, পায়ে পায়ে

টোকর খাইতে খাইতে সে চলিয়াছে। শিবনাথ সহসা ক্ষণপূর্বের মনোভাবের জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল, নিজের কাছেই নিজে অপরাধ বোধ করিল। তাহার মনে হইল, লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ওই মেয়েটির উদরে জ্বলিতেছে। সে ক্ষুধার অন্ন তাহারাই পুরুষানুক্রমে কাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে, সে নিজেও খাইয়াছে।'

দুর্ভিক্ষপীড়িত একটি ক্ষুধাতুর মেয়ের প্রসঙ্গে এই ভাবনা—এ ঠিক যথার্থ মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মহৎ মানুষের ভাবনা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যিনি ভাবছেন, তিনি একজন ছোটো আকারের সামন্তপ্রভু। এরপর আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাব। এই পাঠ অভিজ্ঞতায় উপনীত হলে আমাদের মার্ক্সীয় তত্ত্বের কচকচানি থেমে যায়। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে একজন সামন্তও কী অসাধারণ মহত্ত্বে নিজেকে উত্তীর্ণ করে নিতে পারেন!

'অন্দর হইতে বাহির হইয়া একটা বড় রাস্তা-ঘর অতিক্রম করিতে হয়, শিবনাথকে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। দরজার মুখেই কতকগুলি বোরকা-পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মর্যাদাশালী মুসলমান ঘরের স্ত্রীলোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানকার সাধারণ চাষী-মুসলমানদের মেয়েরা তো বোরকা পরিয়া বাহির হয় না; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দ্বিপ্রহরে ইঁহারা কোথায় আসিয়াছেন, এখানেই বা দাঁড়াইয়া আছেন কেন? শিবনাথ ফিরিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবে অথবা নিতাকে ডাকিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় একটি মহিলা বোরকার একাংশ মোচন করিয়া বলিল, বাপ!

শিবনাথ সসম্ভ্রমে বলিল, বলুন, মা, আমাকে বলছেন? এই দুপুরে আপনারা কোথায় এসেছেন?

বৃদ্ধা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এ ধুপের চেয়েও জ্বালায় জ্বলছি যে বেটা; আর এ সময় ভিন্ন পথঘাট দিয়ে চলবারও যে জো নাই!—বলিয়া একটি পোটলা খুলিয়া কতকগুলি রুপার অলঙ্কার ও খানকয়েক সেকেলে জীর্ণ শাল বাহির করিয়া বলিল, জান বাঁচাও বেটা, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন। কচি বাচ্চারা না খেয়ে মরে যাবে বেটা, আর আমাদের দুশমনও বাগ মানছে না, পেট জ্বলে খাক হয়ে গেল বাপ। এ রেখে কিছু টাকা—দশটা টাকা আমাকে দাও বেটা।

শিবনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল, চোখে তাহার জল আসিতেছিল।'

মানুষের প্রতি এই যে মর্যাদা জ্ঞাপন, এর একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং স্বতন্ত্র

শিক্ষা আছে। লেখক কোথা থেকে এতো বড়ো মানবিকতার শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে অনুমান করা যায়, এ তাঁর সহজাত অভিজ্ঞান। এমনও হতে পারে যে, পূর্বপুরুষের রক্তধারার সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এই শিক্ষা—এই মহাপ্রাণতা! সাধারণ মানুষের দিক থেকে এর প্রতিদানও পেয়েছেন তিনি :

'এ ছাড়া এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক। এদের অতিথি হয়েছি, পরিচর্যায় পরিতৃপ্ত হয়েছি। এমনও হয়েছে, গরমের দিন, মশার উপদ্রব, সঙ্গে মশারি নাই—তাদেরও মশারির অভাব, যা আছে তাও বের করতে লজ্জা পেয়েছে—সুতরাং বিনা মশারিতেই শুয়ে মশার কামড়ে অস্থির হয়েছি—এমন সময় পাখার হাওয়া গায়ে লেগেছে। গৃহস্বামী নিজে কখন উঠে এসে বাতাস করতে শুরু করেছেন। অথচ গ্রামের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশিষ্ট লোকে যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, উঠেছেন কোথায়? বা উঠেছিলেন কোথায়?—উত্তরে যখন গৃহস্বামীর নাম করেছি তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, উঠবার আর জায়গা পেলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি যে, এতবড় কুটিল মামলাবাজ কুক্কুরী আর দ্বিতীয় নাই এ অঞ্চলে। বলেছেন, যে অন্ন পেটে গিয়েছে তা হজম হলে হয়। গ্রাম্য ভদ্র জনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মত আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার সব জেনেছিলাম সে দিন—ওদেরই একজনের মত।'

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, জীবন অভিজ্ঞতা মন্থনজাত এই অমৃতের যেখানে অভাব ঘটেছে, শেষপর্বের সেইসব লেখায় এসেছে, চমক বা গিমিক। এসেছে আকস্মিকতা। এই পর্বে, যার সূত্রপাত 'আরোগ্য নিকেতন' থেকে, এখানে তিনি বিফল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য তো আকাশ ছোঁয়া। একজন লেখকের জীবনের সবটাই সাধারণত সফল হতে পারে না।

তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্যজীবন'-এর এক জায়গায় বলেছেন, 'উনিশ শো তেত্রিশ সালে ওই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একখানি পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করিলাম। সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকা পর্ব শেষ ক'রে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল। কল চৌবাচ্চা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম, ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি করে রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হ'ত। আসবাব কিছু ছিল না, একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য জিনিস থাকত; মেঝের উপর শতরঞ্চি পেতে, সুটকেস টেনে সেইটাকেই রাইটিং ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করতাম। কিছুদিন পর আলিপুরের আদালতের কাছে পুরোনো আসবাবের দোকান থেকে একটা কুশন-মোড়া আধা-সোফা এবং একটা ফোল্ডিং চেয়ার কিনেছিলাম। বিকেলবেলা ফোল্ডিং চেয়ারটা বের করে বাইরে গলি-রাস্তায় পেতে বসে আরাম করতাম। বিড়ি টানতাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আরো বিচিত্র। ওখান থেকে রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের মোড়ে যেতাম চা খেতে। তা সে যতবারই ইচ্ছে হোক না কেন। দুপুর রাত্রির আহারের ব্যবস্থা প্রথম মাসটা করেছিলাম—আমাদেরই দেশের কয়েকটি ছেলের মনোরঞ্জন সরকার, বাদল, সুধীর আরও দু-তিনজন ভাগ্যান্বেষণে ওইখানেই মহানির্বাণ রোড, অশ্বিনী দত্ত রোড এবং মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনের সংযোগ-স্থলে কয়লার ডিপো খুলেছিল, তার সঙ্গে ছিল দুধের ব্যবসা, মুদিখানা। ওদেরই সঙ্গে মাসখানেক খাওয়াদাওয়া করেছিলাম, তারপর পাইস হোটেলে।'

এর মধ্যেই ধরা পড়েছে একটা পরিষ্কার ছবি। ব্যক্তিজীবনে কতোই-না অর্থকষ্ট সহ্য করেছেন লেখক। অথচ, তিনি এসব না করতেও পারতেন। মোটামুটি ছোটো ধরণের জমিদার বাড়ির ছেলে তিনি। অন্যান্যদের মতো ব্যবসা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। স্ত্রীর সেরকমই পরামর্শ ছিল। আর, তিনি সে পরামর্শ অনুসরণ করছিলেন না বলে স্ত্রীর দিক থেকে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করেছেন। দুর্ভিক্ষের দিনে চরমতম অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েও তিনি স্ত্রীর অর্থ অথবা গয়না হাত পেতে গ্রহণ করেননি। স্ত্রী দিতে চাইলেও তিনি এড়িয়ে গেছেন; এই যে তেজ বা অহঙ্কার, যাকে বলে আত্মমর্যাদাবোধ, এরই জোরে তিনি চরমতম কৃচ্ছ্র সাধন করেছেন। স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির প্ররোচনা তিনি এড়িয়ে গেছেন, কোনো বিরোধ বা ঝগড়া নয়,

হাসিমুখে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছেন তিনি। মানুষ হিসেবে তিনি অনেক বড়ো মাপের ছিলেন বলে পেরেছিলেন অতোদূর পর্যন্ত কঠোর হতে। নিজেকে দরিদ্রতম অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়েছেন, প্রায় সর্বহারাদের মতো জীবন কাটিয়েছেন, তথাপি মাথা নত করেননি। শিবনাথের পিসিমা যে বলতেন, 'না খাবো উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত'—এই প্রবাদ বাক্যটি যেন জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল তাঁর। জমিদারীর নিষ্ঠুর শোষণ ও অত্যাচারের পথে নয়, ব্যবসাদারীর নিকৃষ্ট হীনমন্যতায় নয়, একজন সাহিত্যরচয়িতার সর্বব্যাপী মহিমায় তিনি নিজেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। গভীর নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন তাঁর ইপ্সিত পথের লক্ষ্যে। এই যে তাঁর হার-না-মানা মনোভাব, এর পরিণতি ভয়ংকর হতে পারতো, তিনি সাহিত্যজীবনে বিফল হতে পারতেন, কিন্তু তাই বলে তিনি আপস করেন নি। তিনি কোনো নিশ্চিত সাফল্যের স্থূল অর্থকরী জীবনের পথে পরিচালিত করেন নি নেজেকে।

এদিক থেকে ভাবলে শিবনাথ এবং বিশ্বম্ভর চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল খুবই প্রবল। একজন সত্যাশ্রয়ী মানবপ্রেমিক জমিদার শিবনাথ, দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে প্রজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তাদেরই একজন হয়ে। নিজের ভোগসুখের জন্য নয়, প্রজাদের দুঃখমোচনের জন্য পথে নেমে আসতে পারেন। কিন্তু নিজের যেটুকু সঙ্গতি, তার মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন, হঠাৎ আভিজাত্যের দম্ভে হঠকারীর মতো কাজ করেন না, সেই শিবনাথই তারাশঙ্কর। আবার জমিদার বিশ্বম্ভরের মতো জেদও আছে তাঁর, তবে সে জেদ কোনো বিকৃত দম্ভ অনুসারী নয়, সে তাঁর নিজের সাধনার পথে এগিয়ে চলার জেদ। সাহিত্য সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই ব্রত পালনে বিঘ্ন ঘটবে ভেবে তিনি চাকরিও নেননি। চাকরি নয়, ব্যবসা নয়, জমিদারি নয়,—শুধুই সাহিত্য—যেন সর্বব্যাপী এক বিরুদ্ধতা ভেদ করে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর গঞ্জনা এবং শ্বশুরবাড়ির প্ররোচনা তিনি হাসিমুখে এড়িয়ে গেছেন। শিবনাথ অতি সাধারণমানের জমিদার। কোনো রকম আর্থিক সচ্ছলতা নেই বলে, বিরূপ-মনোভাবাপন্ন স্ত্রী এবং বিরূপ-মনোভাবাপন্ন শ্বশুর বাড়ির প্রতিটি মানুষ। শিবনাথের মায়ের শেষ সময়ে গৌরীকে আনতে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসেন নি। ফলে, শেষমুহূর্তে

তাঁর সঙ্গে একবার দেখাও হলো না। শ্রাদ্ধের সময় বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে গৌরী এলেন। কিন্তু এসেও তাঁদের মনের কী অদ্ভুত বিরূপতা! জমিদার শিবনাথের ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতি ওঁদের কাছে কী প্রবল ও ভয়ংকর তার প্রমাণ-স্বরূপ কমলেশের মনোভাব: 'শিবনাথকে তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা চাকুরি দিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া কৈফিয়ৎ লইলে কেমন হয়? অথবা টাকা ধার দিয়া ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া নির্মম আকর্ষণে টানিলে কেমন হয়?'

এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনির মতো গৌরীও শিবনাথকে কলকাতায় গিয়ে চাকরি নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবসাও করতে পারা যায়। টাকার অভাব হবে না। কয়লার ব্যবসা করলে যতো খুশি টাকা ঋণ পাওয়া শিবনাথের পক্ষে অসম্ভব নয়। জমিদারির এইসব গ্রাম্য ঝামেলা থেকে বহুদূরে শহরে শান্তির নীড় রচনা করতে চেয়েছিলেন গৌরী। কিন্তু বাস্তবে তা যে কোনোদিনই সম্ভব নয়, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। কেননা, শিবনাথের সঙ্গে তো মাটির যোগসূত্র আছে। তাঁর কাছে মা ও মাটি সমান। গ্রামের সাধারণ গরিব-দুঃখী প্রজাদের জন্য সবসময় তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। বর্ষা ঠিকমতো না হওয়ায় যখন মাঠের ধান মাঠেই বিনষ্ট হতে বসেছিল, তখন শিবনাথ তাঁর জমিদারির নিজস্ব খাস পুকুরগুলির সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে ধানচারাগুলি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পুকুরের সব মাছ নষ্ট হয়ে গেলে যে জমিদারের অনেক ক্ষতি হবে, তা তিনি ভালোই জানতেন। কিন্তু সমস্ত কিছু ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে তিনি। তিনি ভেবেছিলেন সমস্ত পুকুরের জল ছেড়ে দিয়ে ধানচারা বাঁচাবেন:

'সমস্ত পুকুরের জল ছেড়ে দেবে নাকি?

হ্যাঁ, বলেছি। তুমি মাঠের অবস্থা দেখ নি গৌরী—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অসহিষ্ণু গৌরী বলিল, দরকার নেই আমার দেখে। কিন্তু পুকুরের মাছ কি হবে শুনি?

আবেগময় কণ্ঠে শিবনাথ বলিল, মানুষ মরে যাবে গৌরী, ধান না হলে মানুষ মরে যাবে।

কিন্তু মাছের টাকাটা লোকসান হবে, সে কে দেবে?

লোকসান স্বীকার করতে হবে, না করে উপায় নেই। ধান না হলে দুর্ভিক্ষ হবে, আমরাও হয়তো খেতে পাব না।

বাবাঃ, তোমার ধানের চরণেও প্রণাম, তোমার জমিদারির চরণেও প্রণাম।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু আবার তাহার মন ধীরে ধীরে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; এইটুকু কিশোর বয়সে স্বার্থের এমন লোলুপতা দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর দুঃসহ ক্ষুব্ধতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল।'

কিন্তু এই যার মানসিকতা সেই গৌরীকে তিনি জয় করেছিলেন তাঁর শান্ত ও সমাহিত ব্যক্তিত্বের দ্বারা। তাঁর নির্লোভ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানসিকতা এতোটাই সারবত্তাময় ছিল যে একদিন সকলেরই মাথা হেঁট হয়ে গেল। যিনি একজন মহাপ্রাণ ও উদারচেতা মানুষ, যিনি দেশ ও মানবকল্যাণকে আপন জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্রত বলে মেনে নিয়েছেন এবং সেই পথে ধীর, অথচ আত্মনিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, তাঁকে কয়লার ব্যবসায়ে,অথবা শ্বশুর-বাড়ির ব্যবসায়ে প্ররোচিত করা যে একেবারেই সম্ভব নয়, সেকথা বোঝবার মতো যোগ্যতা ছিলনা গৌরীর, অথবা, গৌরীর বাপের বাড়ির লোকদের।

তাঁরা কেউই বুঝতে পারেন না যে, দেশকে মাটিকে মা বলে ধ্যান করেন শিবনাথ। তাঁদের কারো সে মহাপ্রাণতা নেই, তার দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, দেশের দুর্গত মানব সাধারণের জন্য কাজ করার মধ্যে যে চরিত্র গরিমা আছে তার যথার্থ স্বরূপ কী হতে পারে। সেজন্যই শিবনাথের এই দেশ ও মাটির প্রতি আবেগ তাদের কাছে নিষ্ফল মনে হয়ঃ

'কার্তিকের প্রারম্ভ, শেষরাত্রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে, প্রভাতে শিশিরকণায় সমস্ত যেন ভিজা হইয়া থাকে। সূর্য দক্ষিণায়নে ক্রমশ দূরে হইতে দূরান্তরে চলিয়াছেন, তবুও এবার রৌদ্রের প্রখরতা এখনও কমে নাই। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই রৌদ্রের মধ্যে যেন একটা জ্বালা ফুটিয়া উঠে সে জ্বালায় শোষণে মাটির বুকের রস নিঃশেষিত হইয়া শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী শস্যক্ষেত্রে শস্যশীর্ষগর্ভা ধান্যশ্রী নীরস ধরণীর বুকের উপর তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় কিশোরী কন্যার মত এলাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর বিবর্ণতা কিশোরীর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে। মাঠজোড়া ধানগাছগুলির

পাতার প্রান্তভাগ হলুদ হইয়াছে। তবুও উদ্গমোন্মুখ ধান্যশীর্ষের একটি ক্ষীণ হৃদ্য গন্ধে প্রান্তরটা ভরিয়া উঠিয়াছে—ধান্যময়ীর অঙ্গ-সৌরভ। আর কানে বাজিতেছে, মাঠজোড়া সোঁ-সোঁ শব্দ। তৃষ্ণায় মরণোন্মুখ কিশোরীকন্যার জন্য, আপন তৃষ্ণার জন্য ধরিত্রী জল চাহিয়া কাঁদিতেছেন।'

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হলো মাটি। কেননা, মাটিতেই আমাদের জন্ম এবং মাটিতেই আমাদের জীবন। সেই মাটিকে ভালোবাসতে না পারলে কখনো কোনো মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়। ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করা যায়, অত্যাচারী জমিদার হয়ে প্রজাপীড়ন করে বেশ সুখে থাকা যায়, কিন্তু এই সহজ সুখের পথ তো আর সবার জন্য নয়। একজন শিবনাথ প্রজাদের জন্য নিজের অনেককিছু ছাড়তে পারেন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি শুকিয়ে যাওয়া ধানজমিতে জল সেচের জন্য নিজের সবগুলো পুকুরের জল দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছিল। সেসব তিনি হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ব্যবসা করার মতো অর্থকরী পথ অবহেলিত হয়। দুর্গত মানবাত্মার জন্য তাঁর হৃদয়বেদনা সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম। তারই মানবিক ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তারাশঙ্করের লেখায়। এখানেই তিনি মহৎ এবং এখানেই তিনি কালজয়ী।

এই হলো তারাশঙ্করের জীবন এবং এই হলো তারাশঙ্করের সাহিত্য। এই দুটি যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে আছে, সেখানে তাঁর সাফল্য একেবারে আকাশছোঁয়া। তাঁর জন্মশতবর্ষে এই আমাদের অনুধ্যান। □

সুন্দর ও তারাশঙ্কর

সুমিতা চক্রবর্তী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যিক ছিলেন, প্রাবন্ধিক ছিলেন না। কয়েকটি প্রবন্ধ অবশ্য লিখেছিলেন তিনি। তার অধিকাংশই বিভিন্ন সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ। শেষ জীবনে লিখেছিলেন গ্রামীণ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন—'গ্রামের চিঠি' নামে। আর লিখেছিলেন আত্মকথা, আত্মস্মৃতি। অবশ্যই তাঁর একটি জীবনদর্শন ছিল। কিন্তু দার্শনিক ধরনের মানুষ তিনি ছিলেন না। শিল্পী রূপে তাঁর চারণভূমি ও অবলম্বন ছিল বাস্তব জীবন; নির্বস্তুক ভাবনা অর্থাৎ 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আইডিয়া'-র জগৎ নয়। তাঁর প্রবন্ধের ভিৎ ও উপাদানও বস্তু-নিষ্কাশিত এবং সাবয়ব অর্থাৎ 'কংক্রিট'।

যদি তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত ভাবনা নিয়ে অথবা কোনো নিরবয়ব আইডিয়া নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন তাহলে কি তাঁর কোনো লেখায় সুন্দরের ধারণা অভিব্যক্ত বা বিশ্লেষিত হত? জোর করে এ-বিষয়ে বলা যাবে না কিছু। কিন্তু এটুকু হয়তো বলা যায় তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে আমরা তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত পার্থিব সুন্দরের এক মূর্তি দেখতে পাই। তার রূপ কিন্তু সরল নয়। তা জটিল; তা সুন্দরের সঙ্গে অ-সুন্দর—এমনকি বীভৎস ও কুৎসিতের সংশ্লেষে ব্যঞ্জিত; তবুও তা এক অপরূপ শিল্পের সুন্দর কে তুলে ধরে।

'সুন্দর' বলতে ঠিক কী বোঝায়, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু 'সুন্দর' ও 'সৌন্দর্য'-এর উল্লেখ ও প্রসঙ্গ আছে বেশ স্পষ্টভাবেই। বিনা অলংকারে কাব্য সুন্দর হয় না—একথা বলেছেন ভামহ তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে। 'কাব্যালংকার সূত্র' প্রণেতা বামন বলেছেন 'সৌন্দর্যমলংকারম্'। কিন্তু তাঁর মতে কাব্যসৌন্দর্যের নিত্য ধর্ম হচ্ছে গুণ এবং অনিত্য উপাদান হল অলংকার। এখানে 'গুণ' শব্দে তিনি নির্দেশ করেছেন 'কর্তারোধর্মাগুণাঃ'। অর্থাৎ কাব্যের যে বা যারা কর্তা, তাদের ধর্মই হল গুণ। বীররসের কাব্য হলে 'বীরত্ব', মধুর রসের কাব্য হলে 'মধুরতা'-ই হবে তার গুণ। মনে রাখতে হবে প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলা হয়েছে এবং সেই রস হৃদয়ভাব

থেকেই জাগ্রত হয়—একথাও বলা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বে আটটি স্থায়ী হৃদয়-ভাবের মধ্যে ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা-কেও স্বীকার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রসশাস্ত্রীরা স্বীকার করেছেন রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস রসের অস্তিত্বও। অতএব সমীকরণটি থেকে যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছই তা এই—কাব্যের অন্তর্ভূত ভাববস্তুর ধর্ম যদি 'জুগুপ্সা' হয় তাহলে এই জুগুপ্সাই সেই কাব্যের 'গুণ'। এই 'গুণ'-ই হল কাব্যসৌন্দর্যের নিত্যধর্ম। এই ধর্মকে ঠিকমতো ব্যঞ্জিত, বা আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের সূত্র অনুসারে যথোচিতভাবে 'ধ্বনিত' করতে পারলেই কাব্য হবে সুন্দর। খুব মোটা দাগের তুলনা দিয়ে বলা চলে ফুলের উপর প্রজাপতির বর্ণনাও যেমন সুন্দর হতে পারে, তেমনই হতে পারে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্য। এই সিদ্ধান্তে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সর্বত্রই ধ্রুপদী শিল্পতত্ত্বে, ধ্রুপদী সাহিত্যে দেখতে পাই এর নিদর্শন। যা বাস্তবসম্মত এবং নিবিড় হৃদয়ভাবস্পন্দিত তার ব্যঞ্জনাই কাব্যরস তথা কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে। শিল্প-রচনারীতির ঔচিত্যে ও সামঞ্জস্যেই শিল্পের সুন্দর ওঠে জেগে। অনৌচিত্যই অসুন্দর—আর কিছুই অসুন্দর নয় শিল্পের ভুবনে।

ধ্রুপদী যুগের পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বেও এইভাবেই, সামঞ্জস্য অর্থাৎ 'প্রপোর্শন-' এর নিরিখে নির্দিষ্ট হতো সৌন্দর্যের মানদণ্ড।

রেনেসাঁস-পর্বে তত্ত্বগতভাবে এর অন্যতর কোন ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবল রেনেসাঁস-এর প্রাণধর্মটি মানবতন্ত্র ছিল বলে যা মানবমুখীন তাই ন্যায় এবং সুন্দর; যা মানব-বিরোধী তাই অন্যায় ও অসুন্দর—এমন একটা বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। যা প্রচলিত ও প্রথাগত ন্যায়ের বিরোধী—তারও সৌন্দর্য কখনো কখনো রেনেসাঁস ও রেনেসাঁস উত্তরকালীন শিল্পীরা অনুভব করেছিলেন। সেই উপলব্ধির মূলে কিন্তু আছে রেনেসাঁস-এর মূলমন্ত্র মানবতন্ত্রেরই প্রেরণা। ধরা যাক শেকসপিয়র রচিত শাইলক আর ক্যালিবান চরিত্রদুটির কথা। তারা সেইকালের প্রথাগত ধারণায় সুন্দর নয়। সাম্যময় মানবাধিকারের যুক্তির দিক থেকে খ্রিষ্টীয়দের হাতে নিত্য-অপমানিত ইহুদির প্রতিবাদী কণ্ঠ শাইলকের সংলাপে ভাষিত হয়েছে বলেই শেকসপিয়রের শাইলক নিজের দাবিতে সুন্দর হয়ে উঠেছে। খ্রিষ্টীয় শ্বেতাঙ্গ 'সভ্যতা'-র প্রতিনিধিদের হাতে দাস হয়ে যেতে বাধ্য হওয়া, আত্মগ্লানি ও আত্মদহন জর্জরিত ক্যালিবানও একই কারণে শিল্পোত্তীর্ণ সুন্দরের সোপানে এসে দাঁড়ায় মিরান্ডা

ও ফার্ডিনান্ড-এর পাশেই। কিন্তু মানবতন্ত্র-বিরোধী ইয়াগোকেও যে সুন্দর করে তুলতে পেরেছিলেন শেকসপিয়র কলমের শক্তিতে —তা এজন্যই যে তাঁর মত মহৎ শিল্পীর মনের গড়নে অনেকখানি ছিল সেই ধ্রুপদী নিরাসক্তি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সুন্দরের সন্ধান করবার সময়ে আমাদের ধ্রুপদী সৌন্দর্যবোধের নিরপেক্ষতাগুণের চেয়েও বেশি মনে রাখতে হবে এই রেনেসাঁস যুগসুলভ মানবতন্ত্র সাপেক্ষতার দিকটি।

ইউরোপের শিল্পতত্ত্বে ধ্রুপদী সৌন্দর্য-ধারণায় পরিবর্তন ঘটালেন রোমান্টিক যুগের কবিরা। কোলরিজ তাঁর 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া' গ্রন্থে 'বিউটি' বা সৌন্দর্যের ধারণা নিয়ে লিখে ফেললেন অনেক কথা। তিনি কিছুটা দার্শনিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ভাববাদীও ছিলেন। তাঁর লেখায় 'বিউটি'-র ধারণার সঙ্গে এসে মিলল 'ট্রুথ্' অর্থাৎ 'সত্য সম্পর্কিত ধারণা। সত্য ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর তত্ত্বে। কীটস্-এর 'ওড অন্ আ গ্রীসিয়ান আর্ন' কবিতার সেই বিখ্যাত পঙক্তি—'Beauty is truth, truth beauty'তে যার প্রতিভাস। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-এর লেখায় প্রধান ঝোঁকটা পড়েছে আনন্দ বা 'প্লেজার' এর উপর। যা আনন্দ দেয় তাই কাব্যের মর্মবস্তু হওয়া উচিত— এরকমই বলেছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ভাবনায় সত্য, সুন্দর আর আনন্দের ধারণা মিলে গেল এক আধারে। তাঁর চেতনালোকে 'সত্য' অর্থে পরিবেশের বাস্তবতা নয়, 'সত্য' হল এক পূর্ণ চরিতার্থতার উপলব্ধি যেখানে মানবচৈতন্য নিবিড়ভাবে অনুভব করবে নিজেরই সত্তাকে। সেই সত্যই এনে দেবে পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি। আর তা দেবে বলেই সে হবে সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ বস্তুত এক সত্যবোধের দর্শন। এই সত্যবোধের স্থান সর্বাগ্রে বলেই সারাজীবন তিনি কীটস্ রচিত পঙক্তিটির ঈষৎ ভ্রান্ত পুনরুচ্চারণ করে গেলেন সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় প্রবন্ধে। এই ভ্রান্তি তাঁর বাসনারই প্রতিফলন। একটিই উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—"…সেদিন কবি কীটসের বাণী মনে পড়ল : Truth is beauty and beauty truth অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই।" (ভূমিকা, সাহিত্যের পথে)। কীটস্-এর যথাযথ উক্তিটি হল 'Beauty is truth, truth beauty'।

আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে আসবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় শিল্পের

সুন্দরের ধারণাটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। তিনিই প্রথম বাঙালি শিল্পতত্ত্ববিদ্—যদিও খুব নতুন কোনো কথা তিনি বলেননি। কখনো পাশ্চাত্য, কখনো প্রাচ্য শিল্পতত্ত্বের সূত্রই পুনরুচ্চারণ করেছেন—কখনো সজ্ঞানে, কখনো স্বতোৎসারিত ভাবে, পূর্ব-পঠিত বিষয়াবলী থেকে অর্জিত ধারণাবশত। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' (প্রচার, মাঘ, ১২৯১) প্রবন্ধে তাঁর উক্তি—"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন; অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" উক্তি এইটুকুই। সৌন্দর্য কী—তার কোনো ব্যাখ্যা নেই এই নির্দেশে।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কয়েকবার 'সৌন্দর্য' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। প্রথমে বলেছেন—"সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্য থেকে মনে হয় সৌন্দর্য এবং বাস্তবতা ('স্বভাবানুকারী' শব্দটিতে বাস্তবতা ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে?)—দুটি পৃথক পৃথক গুণ। কিন্তু তারপরে তিনি যা বলেন তাতে সেই ধারণাও অক্ষুণ্ণ থাকে না। এর পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, সাহিত্য এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয়। সাহিত্যিক মানুষের মনকে সেই নৈতিক সমুন্নতির পথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কি করে তিনি তা করবেন? শোনা যাক বঙ্কিমের কথা—"কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্যসৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক।" এতেও কিন্তু বোঝা গেল না 'সৌন্দর্য' কাকে বলে, সে বিষয়ে বঙ্কিমের অভিমত কী?

বঙ্কিমচন্দ্র এর পরে লিখেছেন—"যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না।" এখানে দেখা যাচ্ছে—সৌন্দর্য ও বাস্তবের অনুকরণ (স্বভাবানুকারিতা)-কে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক পৃথক বলছেন না। বরং বলছেন বাস্তবতা সৌন্দর্যেরই একটি লক্ষণ।

এর পর বঙ্কিম আবার বলেছেন—"তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ সৌন্দর্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।" 'সৌন্দর্যের অনেক অর্থ' বললেও 'স্বভাবানুকারিতা' ছাড়া সৌন্দর্যের আর কোনো লক্ষণের কথা এখানে বললেন না বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু কয়েক ছত্র পরে বললেন—"এইরূপ যে সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি গুণে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান।" তাহলে যা 'স্বভাবানুকারী' অর্থাৎ বাস্তবের অনুকরণ তা ও সৌন্দর্যের লক্ষণ ; আবার যা 'স্বভাবাতিরিক্ত,' অর্থাৎ বাস্তবের অনুকরণ নয়—তাও সৌন্দর্যের লক্ষণ।

প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেন—"যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে থেকে সৌন্দর্য সম্পর্কে একটিই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় যা চিত্তকে আকৃষ্ট করে তাই সৌন্দর্য। ব্যাপারটার মধ্যে ব্যক্তির আত্মগত দৃষ্টি কোনই প্রাধান্য পায় না শেষ পর্যন্ত। কার চিত্ত কিসে আকৃষ্ট হবে তার কোনই নির্দিষ্টতা নেই। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিকেই আরো গভীর করে বলেছেন—যা আনন্দ দেয়, তাই সুন্দর। কিন্তু যা সত্য তাই আনন্দময়—একথা বলবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য' শব্দে বাস্তবের অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তি ছাপিয়ে যে পূর্ণ চরিতার্থতাবোধের উপলব্ধিকে বোঝেন, বঙ্কিম 'সত্য' শব্দে তা বোঝেন না। 'যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে তাহাই সৃষ্টি'—একথা বলবার সময়ে 'সত্য' অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু সৌন্দর্যের লক্ষণ ঠিকমত ব্যাখ্যা করে দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। শিল্পের সুন্দর এক রহস্যময় ও আকর্ষক উপলব্ধি যা মনকে মুগ্ধ করে—এর বেশি কিছু বলতে পারেননি তিনি। আমরাও বোধহয় এর বেশি কোন স্পষ্টতর ব্যাখ্যা দিতে পারব না। 'সৌন্দর্যের বসতি দ্রষ্টার চক্ষুতে'-এই প্রবচনই শেষ পর্যন্ত মান্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-শিল্প-তত্ত্বে সুন্দরকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে তার সঙ্গে কোলরিজের 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া' (১৯১৭) গ্রন্থের ব্যাখ্যার যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কোলরিজ-ই প্রথম বলেছিলেন—কবিতার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা কিন্তু শেষ লক্ষ্য হল সত্য (Truth)। গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কোলরিজ যেখানে চেতনা (Consciousness) সম্পর্কে তাঁর দশটি সিদ্ধান্ত

উপস্থিত করেছেন সেখানে বার বার আছে 'সত্য' প্রসঙ্গটি। কোলরিজের কথায়—একটি 'চরম' সত্য আছে যা 'আত্মস্থ', নিঃশর্ত এবং 'স্বপ্রকাশ' (Self grounded, unconditional and known by its own light)। তাঁর মতে 'সত্য' অতুলনীয় (unique) এবং 'সাবজেকটিভ' আর 'অবজেকটিভ'-এর মিশ্রণ। এই মিশ্রিত উপলব্ধি অর্থাৎ সত্যবোধ-ই হল ব্যক্তির চেতনা। এই চেতনা সক্রিয় হতে চায় (will to act)। রবীন্দ্রনাথ বার বার বিকশিত হয়ে উঠতে চাওয়ার কথা—নিজেকে অনুভব করতে চাওয়ার কথা বলেছেন। এই 'সাবজেক্ট' 'অবজেক্ট' 'সীমাবদ্ধ' ও 'অসীম'-এর মধ্যে সমন্বয়-সাধক প্রক্রিয়ার মধ্যেই সৃষ্টি রহস্যের ক্রিয়াটি নিহিত। কোলরিজ মনে করেছেন 'উচ্চতর চেতনা'রই প্রকাশ 'ব্যক্তি'-র (Individual) মধ্যে। এবং অবশেষে বলেছেন—"This higher consciousness is linked with the beautiful which in essence lies in the unity and harmony of the subject and the object."

নিঃসন্দেহেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিষয়টি আরো পরিপূর্ণ ভাবে মননগোচর হয়। কিন্তু আনন্দ, উচ্চতর চেতনা, ব্যক্তির প্রকাশ অভিলাষ এবং সৌন্দর্য—এই সবের সঙ্গে কাব্য সৃষ্টির দার্শনিকতাময় সংমিশ্রণের ধারণা কোলরিজ-এর চিন্তাতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল।

তারাশঙ্কর দার্শনিক ছিলেন না। পরিপূর্ণ ভাবে জীবন-বাস্তব সচেতন, মৃত্তিকালগ্ন এক শিল্পী মনের অধিকারী ছিলেন। আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী হলেও তিনি পার্থিব জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় বিলীন দেখতে চাননি। তাঁর জীবন-দর্শন এই ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর, জন্ম-মৃত্যুর প্রান্তিক গ্রন্থিবদ্ধ, রিপু-পীড়িত বাস্তব জীবনেরই দর্শন।

মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে সুন্দর আর অসুন্দরের এক রকম ভেদ রেখা টেনে নিয়েছে। সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচারে না গিয়ে বলা যেতে পারে সেই সুন্দরের ধারণা গঠনের সৌষম্য অর্থাৎ 'সেন্স অভ্ প্রপোর্শান'-এর উপরই নির্ভর করে। সুষমতার বোধ অনেকটা সমতাময় বিন্যাস-ভিত্তিক হয়ে থাকে। ইংরেজিতে যাকে বলে সিমেট্রি।।

কিছুটা মনস্তাত্ত্বিকতাও মিশে আছে আমাদের সুন্দরের ধারণায়। যা সরাসরি ক্ষতিকর, যন্ত্রণাদায়ক, বর্জনযোগ্য, অসুবিধাজনক তাকে আমরা সাধারণত সুন্দর দেখি না। যেমন ক্ষতস্থান, জঞ্জাল, নর্দমা, বস্তি, ভাঙা

বোতল, পুরোনো ঝাঁটা। বাস্তব জীবনে যা ইন্দ্রিয়রম্য ও সুখকর তাকে সুন্দরের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার একটা প্রবণতা আছে আমাদের।

প্রাচীন ধ্রুপদী যুগ থেকে শুরু করে, রেনেসাঁস যুগ অতিক্রম করে রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত চলে আসা এই সুন্দরের ধারণায় এক ধরনের পারম্পর্য ছিল। এই পরম্পরার নির্যাস থেকেই গড়ে উঠেছে সুন্দরের প্রথাসিদ্ধ ধারণাটি। এই ধারণা থেকে চিরকালই চাঁদ, ফুল, পাখিকে সুন্দর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে চাঁদ রাহু গ্রস্ত নয়; সে ফুল নয় কীট দষ্ট; সেই পাখির শিল্পিত মূর্তি আমরা দেখেছি নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক, ময়ূর, কপোত, দোয়েল, টুনটুনির মধ্যে; শিকারি বাজের মাংসাশী হিংস্রতা 'সুন্দর' রূপে আমাদের কল্পনায় ততটা আসেনি।

প্রথাসিদ্ধ এই সুন্দরের ধারণায় প্রথম পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন বোদলেয়র—সেই অমেয় প্রতিভাবান ফরাসি ভাষা-শিল্পী। তিনি কেবলই কবি ছিলেন না—প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পীও ছিলেন। তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম 'রোমান্টিকতা কী'। প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন—'সুন্দরের অভিব্যক্তিই রোমান্টিকতা।' তার পরেই তিনি উচ্চারণ করেছেন এক আশ্চর্য বাক্য—সুন্দরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। বলেছেন—'সুন্দর হল সেই অনুভূতি যা প্রগাঢ় উপভোগ্যতা এনে দেয়; এবং সুন্দর হল বিকলাঙ্গতা ও বিষমতা সম্পর্কেও সুগভীর উপলব্ধি।' সুন্দরের চেতনায় এই প্রবল অভিনবত্বের সংযোজনের কারণেই বোদলেয়র সর্বগ্রাহী, সর্বগ্রাসী আধুনিকতাবোধের প্রবক্তা বলে গণ্য হয়ে থাকেন। সুন্দরের এই বোদলেয়রীয় ধারণা রবীন্দ্র-মানসে সাড়া তুলতে পারেনি। অবশ্য বোদলেয়র তিনি যত্ন সহকারে পড়েননি বলেই জানা যায়। আধুনিক কবি ও কথাশিল্পীরা অসুন্দরের বেসাতিকেই আধুনিক বলে থাকেন—একথা বার বার ক্ষোভের ও বিরাগের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে।

॥ ২ ॥

বাঙলা কথা-সাহিত্যে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ যেন একই সঙ্গে ছিলেন অত্যন্ত নতুন ও অত্যন্ত পুরোনো। ভারতবর্ষ গ্রামকেন্দ্রিক দেশ। রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দ্বারা শাসিত ও চালিত দেশ। পাঠান ও মুঘল রাজত্বকালে কোনো কোনো অঞ্চলে শাহিবাগ ও নবাবি স্থাপত্য সমন্বিত কিছু

নগর গড়ে উঠলেও বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও অসংগঠিত ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামোটির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিত্ত প্রধানতই ছিল ভূমি-জাত। মানুষ ছিল দুই শ্রেণীর—ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীন। ভারতের পুরোনো শহরগুলি এই ব্যবস্থার সঙ্গে ছিল মানানসই। যেমন বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, জয়পুর—এমনকি দিল্লি। তখন নগর গড়ে ওঠার জন্য বড় বড় অফিস, আদালত, কারখানা প্রয়োজন হত না। শাসকের বসবাস থাকলেই নগর গড়ে উঠত। আর নগরে বহু মানুষের যাতায়াত থাকত বলে আপনা থেকেই গড়ে উঠত হাট ও বাজার।

ব্রিটিশ শাসকের হাতে ভারতের নতুন নগর-সভ্যতার পত্তন হয়। সে নগরগুলি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কেন্দ্র রূপে পরিকল্পিত। যে সব শহরে যারা বাস করতে লাগল তাদের সংযোগ প্রথম থেকেই গ্রামের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা ছিন্ন হয়ে চলার দিকে অগ্রসর। সেসব শহরের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক প্রকৃতই শোষক ও শোষিতের। শহর সেখানে চতুর শোষক আর গ্রাম নিরুপায় ভাবে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে। সামন্ততন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, ভূম্যধিকারী বর্গ নির্ভুল নিয়মে ব্রিটিশ প্রভুর অধীন প্রজায় পরিণত হল, এবং নগরমুখী হল। নাগরিক অর্থনীতি আর বাণিজ্যনীতি গ্রামের মানুষের কাছে হয়ে গেল অচেনা, দুর্বোধ্য এবং প্রতারক।

এই পরিস্থিতিতে নব্যশিক্ষিত বাঙালি; ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি; ইংরেজের বাণিজ্য, প্রশাসন, আদালত, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী, নবোদ্ভূত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের কাছে পুরোনো গ্রামের চেয়ে নতুন শহরই হয়ে উঠল বেশি চেনা, প্রিয়তর। বাঙালি হয়ে উঠতে লাগল নাগরিক। যদিও সে নাগরিকতা ঔপনিবেশিকতার খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ বলে তার বিকাশ হল বিষমমাত্রিক এবং অনেকখানি অ-স্বাভাবিক। অসম্পূর্ণতার চেয়েও বড় হয়ে উঠল অসামঞ্জস্য।

কিন্তু বাঙলার কথা সাহিত্যিকেরা—ঔপন্যাসিক আর ছোট গল্পকারেরা প্রধানত এই কলকাতা শহরকে ঘিরেই সঞ্জীবিত হলেন সাহিত্যপ্রেরণায়। ভবানীচরণ আর কালীপ্রসন্ন তাঁদের নক্‌শায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে হলেও, আঁকলেন কলকাতারই ছবি। প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' কলকাতার এক ধনী পরিবারের চিত্রণ। বঙ্কিমচন্দ্র আর রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে হয় ইতিহাস নতুবা নাগরিকতা ফুটে উঠেছে। তাঁদের উপন্যাসে গ্রামের প্রেক্ষাপট আছে কিন্তু

চরিত্রগুলি কোনো অর্থেই গ্রামীণ নয়। গ্রামীণ অর্থনীতি, ভূমি ব্যবস্থা, উৎপাদন, বিপণন-পদ্ধতি, প্রজা জমিদার সম্পর্ক উপজীব্য নয় সে সব উপন্যাসের। একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর লেখার বিষয়বস্তুতে ততটা ঔপনিবেশিক নাগরিকতার উপর নির্ভর করেননি। কিন্তু যেহেতু উপন্যাস-পাঠকের প্রধান অংশই নাগরিক রুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত বাঙালি—তাই চাহিদা ও জোগানের অমোঘ নিয়মে বাঙলা উপন্যাস প্রধানত নগর-কেন্দ্রিক এবং নাগরিকতা-কেন্দ্রিকই হয়ে থাকল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতি, ভূমিব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক নগর-ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাত সম্পূর্ণেই অনুপস্থিত। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও নব্য ধনতন্ত্রের সংঘাতের একটা দিক আছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও বিষয়টি আদর্শের দিক থেকে উপস্থাপিত, বাস্তবের দিক থেকে নয়। শরৎচন্দ্র, কিছুটা সরল ভাবে হলেও, দু'তিনটি উপন্যাসে অবশ্য সে সত্যের উদ্ঘাটন কিছুটা করেছেন। যেমন 'পল্লী সমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'পণ্ডিতমশাই'। কিন্তু গ্রাম-বাঙলার প্রকৃত পরিস্থিতির ব্যাপ্তি, জটিলতা ও সংকট তাঁর উপন্যাসেও সেভাবে অনুভূত হয় না কারণ উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুটি থেকে যায় নরনারীর হৃদয়-ঘটিত সমস্যা।

বাঙলা কথা সাহিত্যের এই ধারাবাহিকতাবহির্ভূত লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ প্রথম স্নিগ্ধ আলোক দীপ্তিতে আমাদের চোখ ফিরিয়ে দিলেন গ্রামের দিকে তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে এবং কিছু ছোট গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৩৬-এ প্রকাশিত দুটি মহৎ উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির বিবর্তনই মূল কথা। নাগরিক মননের বিশ্লেষণের আলো ফেলে তিনি দেখেছিলেন গ্রামের সংকটকে।

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তারাশঙ্করই কোনদিন সেই উপরিসৌধ, নাগরিকতার টানে গ্রামীণ শিকড়টির মূলোচ্ছেদ করেননি নিজের মন থেকে। তিনি তা করতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর মানসিকতা, তাঁর বিশ্বাস, সংস্কার, তাঁর চরিত্রের অন্তঃস্রোত ও নিহিত সূত্র সমূহ সবই চিরকাল লগ্ন থেকেছে বীরভূমের লাল মাটি ও গ্রামের অভাব কঠোর মানুষগুলির জীবনের সঙ্গে।

সেই গ্রাম গঙ্গা বা পদ্মা তীরবর্তী শ্যামলতায় উদ্ভাসিত গ্রাম নয়। কঠিন মাটি, শুকনো ধুলো, শীর্ণ নদী, তপ্ত হাওয়া-র বীরভূমের গ্রাম। সে সব গ্রামের সাজ-সজ্জা নেই, সহজ ফলন নেই। অভাব-জীর্ণ, অ-সুন্দর, রুক্ষতার মধ্যে সে সব অঞ্চলের মানুষের জন্ম; জন্মাবধি সামাজিক অসাম্য ও নৈসর্গিক

নির্মমতার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ টিকিয়ে রাখা। তবু তারই মধ্যে তার বিত্তহীন কিন্তু মনো-ঐশ্বর্যময় নাচ-গান, উৎসব, তার প্রেম, অপ্রেম, শোষণ, প্রতিরোধ। অনন্ত জীবন সংগ্রামের মধ্যে আর কোন সুন্দর না থাক; 'বেঁচে থাকা'-ই যে আশ্চর্য এক সুন্দরের নির্যাস তুলে আনে—সেই রূপময় উদ্ভাসগুলি ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায় তাঁর শিল্প-মূর্তির ভিতর-বাইরের গঠনে থেকে গেছে তাঁর নিজস্ব শিল্প সুন্দরের চেতনা।

তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব সুন্দরের ধারণাটি পেয়েছিলেন ঐ মৃত্তিকালগ্ন আর শ্রমকঠিন জীবন যাপনে স্পন্দিত মানুষকে দেখে; পেয়েছিলেন ঐ রুক্ষ প্রকৃতির দিকে দু'চোখ মেলে তাকিয়েই। কোন পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ থেকে নয়। শরৎচন্দ্র আর বিভূতিভূষণও যথেষ্ট পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করেছিলেন কিন্তু তারাশঙ্কর করেননি। আমরা তাঁর সঙ্গে হার্ডি-র তুলনা করি কিন্তু হার্ডি তাঁর অপঠিত ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় সমকালীন গল্প, উপন্যাস তিনি পড়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সব লেখার সঙ্গেও নিবিড় পরিচয় তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য তাঁর পঠিত ছিল। ধ্রুপদী শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে, রেনেসাঁস ও রোমান্টিক যুগ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই আংশিক। এবিষয়ে তিনি কিছু লেখেননি। এবিষয়ে আলাপ চারিতাও করতেন বলে জানা যায় না। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাহিত রোমান্টিক সুন্দর সম্পর্কিত কোন ভাবনা তাঁর মনে প্রবেশ করেনি। কোলরিজ আর বোদলেয়র—সত্য, সুন্দরের মিলিত আদর্শের প্রবক্তা আর কদাকারের (deformity) অভ্যন্তরস্থ সুন্দরের নবদ্রষ্টা—এই দুজনের সম্পর্কেই তারাশঙ্কর ছিলেন অনবহিত।

তারাশঙ্কর তাঁর সুন্দরের বোধ গড়ে নেবার পথে অবশ্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। কৌলিক ধর্মে শাক্ত আর মনের ধর্মে অনেকখানি বৈষ্ণব তারাশঙ্করের মনে পুরাণবাহিত, অধ্যাত্মিকতা-জারিত ভারতীয় সৌন্দর্য বোধের প্রশস্ত স্থান ছিল। মধ্যযুগীয় সাহিত্য তিনি কিছু পড়েও ছিলেন। ধর্মগ্রন্থও পড়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থই আমাদের প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য। বৈষ্ণবীয় প্রেম ধর্মে মানব মন ও প্রকৃতি যে মধুরতায় নিষিক্ত হয়ে দেখা দেয় সেই মাধুর্যবোধের উত্তরাধিকারও বর্তেছিল তাঁর রূপ-দৃষ্টিতে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় সুন্দরের বোধ কিন্তু কিছুটা বিচিত্রই। পাশ্চাত্য ধর্মচেতনায় দেবদেবীদের রূপ প্রথাসিদ্ধ সুন্দরেরই অনুবর্তী। গ্রীক দেবদেবীরা অধিকাংশেই পরম রূপবান। সেই রূপে অঙ্গ-সংস্থানের সামঞ্জস্যই প্রধান বিবেচ্য। পশু, মানুষ মিশ্রিত কোন কোন জীব যখন গ্রীক পুরাকথায় দেখা দিয়েছে তখন তাকে অ-সুন্দর ও বিকৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় পুরাণের কথা ভাবা যাক। জটাজুটধারী, ভস্মমাখা, ব্যাঘ্রচর্মবাস, সর্পভূষণ গঞ্জিকাসেবী, দেবতা—তারই পায়ে ভক্তের মাথা পরম নির্ভরতায় লুটিয়ে থাকে। শ্মশানচারিণী, ডাকিনী-যোগিনীপরিবৃতা, খড়্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, তামসী নগ্নিকা-মূর্তিতে গৃহাঙ্গনের মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করা কি করে সম্ভব তা এমনকি রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পারেননি। কিন্তু বাঙলার মানুষ অনায়াসেই তা করে থাকে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা-মূর্তি আর যাই হোক প্রথাসিদ্ধ অর্থে সুন্দরের মূর্তি নয়। যামিনী রায়ের ছবিতে দেখি হাতির মাথাওয়ালা হৃষ্ট পুষ্ট প্রাণীটিকে কোলে নিয়ে 'গণেশ জননী'-র স্নিগ্ধ মাতৃরূপ। বাঙালি চিত্রশিল্পীর পক্ষেই তা কল্পনা করা সম্ভব। এই চিত্রশিল্পীও তাঁর গ্রামীণতা বর্জন করেননি কখনো। রাধারুষ্ণ কাহিনীতে অবশ্য যে মিলন, বিরহের কথাচিত্র আছে তা প্রথাসিদ্ধ অর্থেই সুন্দর। তারাশঙ্করের সৌন্দর্য-চেতনায় এই দুই ঐতিহ্যেরই পরিগ্রহণ আছে।

তবু বলব না—এই ধারাবাহিকতা থেকেই উৎসারিত তারাশঙ্করের সৌন্দর্য-চেতনার সমগ্র বলয়। তার উৎস প্রধানত তাঁর চিত্তলোক; তাঁর নিখাদ নিসর্গ দৃষ্টি, তাঁর অকৃত্রিম মানবপ্রীতি, অভাবি মানুষের প্রতি দরদ।

তারাশঙ্করের সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ—দীর্ঘতর করে দেওয়া চলে। আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ তুলে দেব আমাদের বলবার কথাটির সমর্থন রূপে।

কোনো পাঠকের মনে না রেখে উপায় নেই 'ডাইনী' গল্পের ছাতি-ফাটার মাঠের সেই প্রায় অপার্থিব শুষ্কতার বর্ণনা—"ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রাম চিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়।

...ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলোর একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত,

ভয়ঙ্কর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ।"

সুন্দর একে বলা চলে না, আবার অ-সুন্দরও একে বলা অসম্ভব! রুদ্র ভয়ঙ্করতার যে রূপ আছে তার উপলব্ধি এই বর্ণনায় জাগাতে পারেন তারাশঙ্কর। এই রূপ সত্যের—যে অর্থে সত্য বাস্তব। বাস্তবের তীব্রতর বিদ্ধ অন্তরাত্মা যেন অ-লৌকিক অবলম্বন করে আশ্রয় খোঁজে। সেই অ-লৌকিকতার ছোঁয়া এই রূপকে দিয়েছে রহস্যময়তা। তবু এই রহস্যও বাস্তবের, আর সেই বাস্তব বীরভূমের মাটির।

শুষ্কতার রূপ ছেড়ে আমরা যদি বর্ষণের দৃশ্যে চলে যাই তখনও দৃষ্টান্তের অভিনবত্ব খুঁজে পাই তারাশঙ্করের লেখায়:

"বৃষ্টির ধারায় আকাশের ধুলো ধুয়ে নেমে গিয়েছে মাটিতে। বাতাসের বেগে মেঘপুঞ্জের দ্রুত আবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালো মেঘের বিচিত্র বর্ণসংস্থান হয়েছে সেখানে; হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে 'হাতী-নামা' ধরা পড়ে, কোপাইয়ের বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পাওয়া যায়।...
শিল পড়ছে অজস্রধারে, ক্রমশ মোটা হচ্ছে আকারে! ঝরঝর শব্দে পড়ছে। চালে ধুপ-ধুপ শব্দ উঠছে। নীলাবাঁধের পদ্মপাতাগুলো ফুটে ফেটে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেল। কাহারেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখছে শিলাবৃষ্টি। মাট-ঘাট ঘরের চাল সব শিলার খণ্ডে ছেয়ে সা—দা হয়ে গেল।

ঝড়বৃষ্টি শিলাবর্ষণে লণ্ডভণ্ড করে ঘণ্টা দু'য়েক পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কালবৈশাখী থেমে গেল। অস্ত যাবার মুখে সূর্যও দেখা দিলে। লাল হয়ে গেল আকাশটা।"

এই বর্ষণ-বর্ণনায় রবীন্দ্র যুগের বারিপাত দৃশ্যের সঙ্গে তারাশঙ্করের দৃষ্টির পার্থক্য খুব বেশি করে চোখে পড়ে। চালের 'ধুপ ধুপ' শব্দে, বাঁধের পদ্মপাতাগুলি শিলার আঘাতে 'ফুটে ফেটে ছিঁড়ে টুকরো' হয়ে যাবার বাস্তব রূপটি তারাশঙ্করের নিজের চোখে দেখা দৃশ্যেরই নির্মাণ। 'কালবৈশাখী' থেমে গিয়ে আবার সূর্য দেখা দেবার দৃশ্য যখন আঁকেন তিনি সেখানে রাবীন্দ্রিক ধরনে কোনো মঙ্গলবিধায়কের আবির্ভাব অনুভব করেন না। 'লাল হয়ে গেল আকাশটা'—এই সংক্ষিপ্ত, দৃঢ় সরল, অ-পল্লবিত বাক্যে কেবল এক রক্তাভ যন্ত্রণাময়তা, এক আর্ততাই যেন ভেসে থাকে। সে আর্ততা শিলাঘাতে

ঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে যাওয়া কাহার পাড়ারই বিপন্নতা।

নিসর্গের সুন্দর ছবিও তারাশঙ্কর এঁকেছেন। সাধারণত যখন মানুষের মনের প্রসন্নতা, প্রেম আর প্রীতিবোধের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক মিলিত হয়ে যায় তখনই সেই মনের কমনীয়তা নিসর্গকে কমনীয় রূপ দেয়। ভালোবাসার নারী কালোশশীর সঙ্গে বাঁধের ধারে এসেছে আহত, রক্তাক্ত বনোয়ারী। দেহে তার জ্বালা কিন্তু সঙ্গিনী আছে প্রিয় নারী তাই নিসর্গ বুঝি কোমল-সুন্দর—

"আকাশে সবে চাঁদ উঠেছে। একপাশ খাওয়া লালবরণ মস্ত চাঁদ! হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে গাছের মাথায় মাথায় আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে; গাছের ডাল-গুলির পাতায় চিক চিক করে নাচছে উঠতি চাঁদের লালচে আলোর ছটা। আলো নাচছে না; পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে—চাঁদের আলোই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে উড়ন্ত প্রজাপতির হিলহিলে পাখনার মত।··· দেখতে দেখতে চাঁদের আলো দুধবরণ হয়ে গাছপালা বাঁশবন ঝলমল করে নদীর বুকে নামল। কোপাইয়ের জলে গলানো রুপোর ছটা জেগে উঠল। কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে; যেন খিল খিল করে হেসে ঢলে গড়িয়ে পড়েছে। ওই ছটায় কালোবউকে বড় সুন্দর লাগছে।"

এমন বর্ণনা আরো অনেকবারই পাওয়া যাবে তাঁর লেখায়। কিন্তু প্রতিটি বর্ণনাতেই দেখা যাবে পার্থিব বাস্তবের নির্ভুল প্রতিফলন। এমন কি, পূর্বোক্ত বর্ণনাংশে পাঠককে তিনি বলে না দিয়ে থাকতে পারেন না—"আলো নাচছে না; পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে,"। ···বাস্তবের উপকরণ ও গড়ন থেকেই শিল্পের সুন্দরকে নির্মাণ করেছেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের মতো 'সত্য' আর 'বাস্তব'-এর মধ্যে পার্থক্য দেখেননি। কোলরিজের পরিশীলিত, উচ্চতর চেতনা যা সত্যবোধের জন্ম দেয় —যে সত্যবোধ পার্থিব অসঙ্গতির মধ্যে, বৈপরীত্যের মধ্যে, আত্মদৃষ্টি ও বস্তুদৃষ্টির মধ্যে (সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ) সমন্বয় সাধন করে সেই দার্শনিক প্রত্যয় ভূষিত সত্য ধারণা নিয়ে তিলমাত্র ভাবনা ছিল না তারাশঙ্করের। তাঁর দৃষ্টিতে জীবন-বৈচিত্র্যই একমাত্র সত্য। সেই সত্যের জোরেই শিল্প রূপবান। তবে জীবন-বৈচিত্র্য মানে মানব মনেরই বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে। তাই প্রেমস্পর্শে নিসর্গ সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকবার। 'কবি' উপন্যাসের সেই সুপরিচিত উপমা মনে পড়বে—মাজা পিতলের ঘড়া মাথায় শ্বেতবসনা কিশোরী—যেন 'স্বর্ণশীর্ষ কাশ'। 'কালো কেশে রাঙা কুসুম' দেখার সেই মধুর মুগ্ধতা। কিন্তু নিতাই কবিয়ালের

মনের আলো পড়েই সুন্দর হয়েছে এই রূপ। এখানেই রেনেসাঁস উত্তরকালীন মানবদৃষ্টির মহত্ত্বের স্বীকৃতি যেন সুন্দর দর্শনে।

বোদলেয়র বলেছিলেন কুৎসিতেরও সৌন্দর্য আছে। তারাশঙ্করের লেখার বহু বর্ণনাংশ সে কথাই মনে করিয়ে দেয় আমাদের। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে করালী-র প্রিয় কুকুর কালুয়ার মৃত্যুদৃশ্যটি দেখা যাক—

"কালুয়া মনিবের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্থির হতে পারল না সে। কোন ভীষণতম যন্ত্রণায় তাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পাক দিয়ে ফিরতে লাগল কালুয়া। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পড়ে গেল মাটিতে, মুখ ঘষতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে লাগল।

করালী তার পাশে বসে গায়ে হাত বুলাতে লাগল, কিন্তু কুকুরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে; মনিব করালীকেও কামড়াতে এল। ছটফট করতে লাগল, মাটি কামড়াতে আরম্ভ করলে, কখনও মুখ তুলে চেঁচালে···অসহ্য যন্ত্রণা অভিব্যক্ত করলে, তারপরই মাটিতে মুখ ঘসলে।

করালী স্থির হয়ে বসে দেখছিল। তার টর্চটার দীপ্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হঠাৎ সে মৃদুস্বরে ও বিস্ময়ে আতঙ্কের সঙ্গে বললে—রক্ত!

—রক্ত!

—হ্যাঁ।

সে আঙুল দেখালে—কালুয়ার নাকের ছিদ্রের দিকে। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। শেষে ঘটল একটা বীভৎস কাণ্ড। হঠাৎ চোখ দুটো ফুলে উঠে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা পড়ল কালো রোমের উপর দিয়ে। সমস্ত কাহারপাড়া দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল।"

বিবরণটি মনোরম নয়, দৃষ্টিনন্দনও নয়। বীভৎস ও কুৎসিত। অসহায় ও প্রবল এক যন্ত্রণার মৃত্যু। তার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় লেখক সঙ্কুচিত হননি। খানিকটা ন্যাচারালিজম্-এর স্পর্শ মিশিয়ে রচনা করেছেন বীভৎসতার শিল্প-মূর্তি। আমাদের চিত্ত শিহরিত হয়। হাত মুঠো হয়ে আসে। বর্ণনা অন্তে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। আহত, মরণমুখী পশুটির শারীরিক কষ্ট যেন আমাদেরও চোখে মুখে তাপ ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমরা বর্ণনাটি আগাগোড়া না পড়ে পারি না। কাহারপাড়ার লোকেদের মতো, করালীর মতো আমরাও এই যন্ত্রণাদৃশ্য দেখতে থাকি। আমাদের আকর্ষণ করে এই ছবি. আমাদের ফ্যাসিনেট করে। রাবীন্দ্রিক সুন্দরের ছবি এ নয়, কিন্তু বোদলেয়রীয় সুন্দরের

চিত্রণ অবশ্যই। 'ক্লেদজ কুসুম'—বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়!

মানব-অস্তিত্বের প্রথম লড়াই কিন্তু নিসর্গের সঙ্গে। প্রকৃতিকে জিতে নেবার চেষ্টাতেই মানবসভ্যতার পত্তন। সেই সংগ্রামের রূপ যখন অনাবরণ হয় আমাদের সামনে তখন তার নিষ্ঠুরতা আমাদের গ্রাস করে কিন্তু তীব্র সত্যবোধের টানে আমাদের আকর্ষণও করে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে লেখক যে কাহার সমাজের কাহিনী শুনিয়েছেন তাদেরও জীবন সংঘর্ষময়। সংঘাত প্রকৃতির সঙ্গে, হিংস্র পশুর সঙ্গে, উৎপীড়ক মানুষের সঙ্গে। অন্ধতা কুসংস্কারের সঙ্গেও লড়াই তাদের। আর লড়াই নিজেদের মধ্যে—নেতৃত্বের লড়াই। ক্ষমতার সংঘাত। উৎপীড়কের প্রতি প্রতিবাদী সঙ্ঘবদ্ধতা এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর দেখাননি ততটা। কিন্তু কাহারদের জীবনযাপনের ধরণটার মধ্যেই একটা মরিয়া লড়াই আছে। উপন্যাসের প্রথমেই আছে কাহারদের পিটিয়ে বাঘ মারার বর্ণনা। তারপরেই আছে ফাঁদ পেতে শুয়োর ধরার বিবরণ। একটি পা বেঁধে গিয়ে শুয়োর তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়তে পারে না। সেই অবস্থায় লাঠির আঘাতে আঘাতে মারা পড়ে চলৎশক্তিহীন, অসহায় শুয়োর। নালা বেয়ে চলে আসা কুমিরের খবর পেলে কুমিরকে তারা নালায় আটকে নিষ্ঠুরভাবে দু তিন দিন ধরে ঠেঙিয়ে মারে। এই উপন্যাসে গাছের তলায় আগুন জেবলে গাছের ওপরে জড়িয়ে থাকা বিশাল সাপ মেরেছে করালী। করালীর মারা সাপটির পেট ফেটে বেরিয়ে এসেছে আগের রাতে গিলে ফেলা বুনো শুয়োরের বাচ্চা। তারাশঙ্কর কোথাও বর্ণনাংশগুলি চেষ্টা করে বীভৎস করে তোলেননি আবার চাপাও দেবার চেষ্টা করেননি। জীবন-বাস্তবের এই দৃষ্টা—ঠিক যেমন ঘটেছিল তেমন ভাবেই বিবৃত করেছেন ঘটনা। জীবনের সংঘাতের সত্যরূপ বলেই দৃশ্যগুলির মধ্যে ফুটেছে এক প্রবল রক্তাভা। এই চিত্রমালাকেও একরকম সুন্দর না বলে তো উপায় নেই আমাদের। হিংস্রতার, নিষ্ঠুরতার, কুৎসিতের রূপ যেন ফেটে পড়ে তারাশঙ্করের বর্ণনায়, এই দৃষ্টান্তগুলি কিন্তু বোদলেয়রীয় নয়।

বোদলেয়রের সৃষ্ট ক্লেদ-জাত সুন্দর এক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ততার সূচক। কিন্তু তারাশঙ্করের রচিত এই ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্যগুলি জীবনের সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা সূচিত করে। এই প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বৈরথ, এমনকি এই নিষ্ঠুরতাও জীবনের স্বাভাবিক সচলতার অঙ্গীভূত। জীবন থাকলে এই নিষ্ঠুরতাও থাকবেই। এত বাস্তব অর্থে সত্য বলেই সে সত্যের রূপরচনা শিল্পের সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলে।

মানব মনের প্রীতিস্নিগ্ধতা যেখানে জড়িয়ে থাকে কোন পরিবেশে সেখানে তা অত্যন্ত সাধারণ হলেও এক মনোহরণ সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলে! এ জাতীয় সুন্দরের ছবি আঁকতে সব লেখকই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যখন স্নিগ্ধ সুন্দরকে চিত্রিত করেন বা উজ্জ্বল সুন্দরকে উদ্ভাসিত করেন তখন সেখানে মেশে রোমান্টিক কল্পনা, কিছু অতিশয়োক্তি। তারাশঙ্কর কোনো বাড়তি অলংকরণ ব্যবহার করেন না। তাঁর বর্ণনা সবটাই খাপে খাপে বাস্তবের গায়ে এঁটে থাকে।

"তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন, সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।"—'রসকলি' গল্পে মঞ্জরী বৈষ্ণবীর ঘরটি—উপকরণে নয়, মঞ্জরীর যত্নে সুন্দর, সেবায় সুন্দর এই ঘর। বাস্তবকে কোথাও অতিক্রম করে যেতে হয়নি তারাশঙ্করকে।

শেষ সুন্দরের ছবিটি একটি সাপের। দেখেছিল 'নারী ও নাগিনী' গল্পের খোঁড়া শেখ। সে সাপ ধরে, সাপ নাচায়, সাপ ভালোবাসে। তার অনুরাগের চোখে সে একটি সাপকে দেখেছিল—"ঈষদ্দূরের প্রান্তরের বুকে বোধহয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃ সূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল—বাঃ!"

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখাতেও দ্রষ্টার মনের রঙে রাঙানো দৃশ্যের সৌন্দর্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। নবকুমারের দৃষ্টিতে সমুদ্র, গোরার চোখে সুচরিতা, শ্রীকান্তর দৃষ্টিতে অন্ধকারের রূপ। কিন্তু সূর্যোদয়ের রক্ত আভায় কিশোর কালো সাপের হিল্লোল—তারাশঙ্করের আগে কোথায় বাঙলা সাহিত্যে! তারাশঙ্কর এই সুন্দরকে নির্মাণ করতে পেরেছিলেন কারণ প্রকৃতির বুকে এই রূপ নির্মিত হয়ে গেছে আগেই। তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে আর সৃষ্টিতে 'সুন্দর' আসলে বাস্তবেরই পুনর্নির্মাণ। □

তারাশঙ্করের গল্প

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

জমিদারী অবক্ষয়ের ট্র্যাজিক শিল্পরূপকে তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে যে গভীর মমতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে পূর্ববর্তী কোন কথা সাহিত্যিকের হাতে অনুরূপ দক্ষতার প্রমাণ আমরা পাইনি। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তারাশঙ্করের নামের সঙ্গে পড়ন্ত জমিদারী ব্যবস্থার মর্মান্তিক নাটকীয় চেহারাটি যেন মিশে একাত্ম হয়ে আছে। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্প রচনার ক্রমিকে বিবর্তনটি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে তাঁর বিখ্যাত 'জলসা ঘর' কিংবা 'রায় বাড়ি' গল্পের পাশাপাশি একটু আগে থেকেই অন্য অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছিল যেগুলি সমকালীন কোন গল্প লেখকের মধ্যে ছিল না। তারাশঙ্করের আবির্ভাবের একটু আগে থেকেই সুপ্ত জান্তব বৃত্তি বা যৌন কামনা বাসনার গল্প লেখা শুরু হয়েছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, যুবনাশ্ব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ গল্পকারদের হাতে। কিন্তু জান্তব-বৃত্তির সঙ্গে মানুষের আত্মিক ক্ষুধা, হিংস্রতার সঙ্গে সারল্য বা শিল্প প্রতিভা—এই জাতীয় বৈপরীত্যের সহাবস্থান তারাশঙ্করের প্রথম যুগের স্মরণীয় গল্পগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

গল্প লেখার প্রথম যুগ থেকেই মানুষের এই বিপরীত স্বভাব সম্পর্কে তারাশঙ্কর সচেতন হয়ে ওঠেন এবং এই সচেতনতাই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে দিতে থাকে। বয়ঃসন্ধির উদ্দীপ্ত নানা সাহিত্যরূপের চর্চা কাটিয়ে তারাশঙ্কর যেদিন সিউড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটি বিনিদ্র রাতে 'কালি কলম' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বেনামী বন্দর : জনি ও টনি' পড়ে ফেললেন তখন দুটি গল্পের বিন্যাস ভঙ্গিতে—বিশেষ করে শৈলজানন্দের গল্পটিতে—'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত নিজেরই লেখা 'স্রোতের কুটো' গল্পটির যেমন মিল পেলেন, তেমনি অমিলও দেখলেন। প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দের গল্পের মানুষগুলো যে জৈবিক বেগে বড় বেশি অভিভূত, এটা তাঁর ভালো লাগলো না। তাঁর ইচ্ছে হলো, এ জাতীয় গল্প তিনিও লিখবেন, কিন্তু নিছক জৈবিক বেগে বশীভূত মানুষ

নয়, জৈবিক আবেগের সঙ্গে সাত্ত্বিক মুক্তির যে দ্বন্দ্বে মানুষ চিরকাল হারছে বা জিতছে সেই মানুষই হবে তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য। তবু কল্লোল-কালি কলমের লেখকরাই যে তারাশঙ্করের এই আত্মদর্শন ঘটালেন একথা হয়তো পুরোপুরি সত্যি নয়। কারণ প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দের লেখা দুটি পড়ার আগে তিনি 'স্রোতের কুটো' নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন তাতে হিংস্র জৈবিক বৃত্তির ভেতর থেকেই শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত পত্নী-প্রেমিক আত্মভোলা সঙ্গীতরসিক একটি মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল। ভাইঝি গৌরীর সগোত্রে বিয়ে ঠিক হয়েছে এটা সহ্য করতে না পেরে তার ওপর স্নেহবশত গোপাল ভাই রাখালকে হিংস্রভাবেই মেরে বসেছিল। এই অন্যায় করেই তাকে সমস্ত গ্রামের লোকজনদের কাছে বদনাম নিতে হলো, অসামাজিক বৃত্তি নিতে হলো, স্নেহের ভাইঝির কাছে অপমানিত হতে হলো, স্ত্রী কাতির সঙ্গে ব্যবধানও তো বেড়েই চললো। স্বামীর ওপর যথেষ্ট মায়া-মমতা থাকলেও স্ত্রী কাতি ঘটনাচক্রে গোপালের কাজকর্মে বিরক্ত ও আহত হয়ে গোপালকে তাড়িয়ে দিলো। শেষ কালে ডাকাতিতে গোপাল ধরা পড়লো। ওদিকে কাতিও জলে ডুবে মরেছে। বহুকাল পরে শুষ্ককেশ-শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত গোপাল তার মাটিতে মিশে-যাওয়া ভিটের সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীর হাতে পোঁতা করবী গাছটির দিকে তাকিয়ে আছে, বসন্তের ছোঁয়ায় যে গাছটি রক্তকরবীর ভারে ঈষৎ নত হয়ে পড়েছে। স্নেহান্ধ একটি মানুষ হঠাৎ অন্ধ আক্রোশে যে হিংস্র কাজটি করেছিল তার জন্যে সে অনুতপ্ত ছিল, কিন্তু নির্মম উদাসীন সমাজ তাকে সুস্থ জীবনে ফিরতে দেয়নি : 'তার বুভুক্ষু প্রাণ অহরহ চিৎকার করছে—শান্তি, একটুকু সহানুভূতি, একটুকু প্রাণের টান, নইলে সে যে আপনাকে অনুভব করছে ছিন্নবন্ধন, স্থানভ্রষ্ট উল্কার মতন, বন্যার স্রোতের মুখের কুটোর মত ভেসেই চলেছে, ভেসেই চলেছে।' গোপালের এই পরস্পর বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্ব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বহুকাল বাদে ভিটের সামনে এসে—স্ত্রীর হাতে পোঁতা রক্তকরবী গাছটির সামনে দাঁড়িয়ে এই পরিণতি অবধারিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অসহায় স্নেহ প্রেমে কাঙাল একাধিক চরিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়—অন্য সমালোচকরা যদিও এই পর্বে শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কথাই বলেছেন।

জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধ—এই দুয়ের দ্বন্দ্বের যে বিশাল জনগণের প্রতি তারাশঙ্করের লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যকে স্থির রেখেই তারাশঙ্কর তাঁর বহু গল্পে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর নিজের বিশেষত্বটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'ডাইনী', 'দেবতার ব্যাধি', 'নারী ও নাগিনী', 'বোবা কান্না', 'তিনশূন্য', 'তমসা', 'মতিলাল', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'পিঞ্জর', 'ইমারত', 'রাঙ্গাদিদি', 'নারী', 'প্রতীক্ষা', 'প্রসাদমালা' ইত্যাদি গল্প এই মৌলিক দ্বন্দ্বের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। দু একটি গল্পের একটু বিশ্লেষণ করলেই এই সত্য স্পষ্ট হবে। 'অগ্রদানী' গল্পের সাড়ে ছ-ফুট লম্বা পূর্ণ চক্রবর্তীকে দূর থেকে আসতে দেখে লোকে বলতো, মই আসছে। নিজেকেও সে মই মনে করতো। স্বর্গে যাবার মই। তাকে পেট ভরে খাইয়ে দিলেই সে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। খাবার ব্যাপারে তার লোভ ছিল বীভৎস। তার সন্তান-ভাগ্য ভালো ছিল বলে ধনী শ্যামদাস তাকে দশ বিঘে জমি আর আজীবন সিংহবাহিনীর প্রসাদ দেবার লোভ দেখালো তার নবজাত শিশুটিকে বাঁচাবার জন্যে। শ্যামদাসের আগের কোন শিশুই তো বাঁচে নি। কিন্তু এই সন্তানটি মুমূর্ষু হলে পূর্ণ চক্রবর্তী জমি আর প্রসাদের লোভে অন্ধকারে রাত্রে শিশুটিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সদ্যোজাত পুত্রটিকে রেখে গেল। তারপর শ্যামদাসের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে নিজের পুত্রের হাত থেকে চক্রবর্তী পিণ্ড গ্রহণ করলে। কিন্তু আরও বাকি ছিল। এই পুত্রটিও বড় হয়ে মারা গেলে তার শ্রাদ্ধে পূর্ণ চক্রবর্তীর ডাক পড়লো। নিজের ছেলের শ্রাদ্ধের পিণ্ড পাত্রটি চক্রবর্তীর হাতে উঠে এলো ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনার আড়ালে একটা মর্মান্তিক আত্মপীড়নের ছবি দিতে তারাশঙ্কর ভোলেন নি : 'এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বছর পরে সে একদিন শ্যামদাস বাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামদাস তাঁহার দুই বছরের পৌত্রকে কোলে নিয়ে শুষ্ক অশ্বত্থ তরুর মতো দাঁড়াইয়াছিলেন। চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।' জৈবিক লালসার বৈপরীত্যে এই মানবিক আর্তনাদটুকু না থাকলে গল্পটি নেহাতই একপেশে জৈবিক তাড়নার গল্প হতো। কিন্তু চক্রবর্তীর এই আর্তনাদও থেমে গেছে। শ্যামদাসের অনুনয়ে, পুত্রের ছেলেমানুষ বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে উদ্যোগী শুনে চক্রবর্তীর পক্ষে পিতৃত্ব প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। শুধু বীভৎস খাদ্য লোলুপতা নয়, এই অবদমিত পিতৃত্বই গল্পটির প্রাণ।

তেমনি ধরা যাক 'ডাইনী' গল্পটি। ডাইনীর জীবনে যে ইতিহাস অতীত বর্তমানের টানাপোড়েনে লেখক দক্ষতার সঙ্গে ডুবে গেছেন তার মধ্যে একটা মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব আছে। ছাতি-ফাটার মাঠের ধারে যে বৃদ্ধা ডাইনী নানা লৌকিক গল্পের কেন্দ্র হয়ে বসে বসে আয়নায় নিজের মুখ দেখে, তার স্মৃতি-রোমন্থনে

গল্পটি শুরু হয়েছে। দশ-এগারো বছর বয়সের প্রথম যে ঘটনায় সে ডাইনী বলে সচেতন হয় সে ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। একটি ছেলেকে নজর দিয়েছিল বলে ছেলেটি পেটের ব্যাথায় ছটফট করছে—এই অজুহাতে তাকে বামুনবাড়ির হারু চৌধুরী এসে পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারে। কেন এমন হয় সে বোঝেনি. কিন্তু অপমান বোধেই সে ভগবানকে ডেকেছে, ঠাকুর ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও। তারপর থেকে যে যে ঘটনা ঘটেছে সে কটিতে তার মধ্যে এক সামাজিক সত্তার যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে, তার দৃষ্টির সর্বনাশী তীক্ষ্মতা এবং তার লোলুপতার পাশাপাশি এক মর্মান্তিক আক্ষেপ তাকে স্মরণীয় মানবিক চরিত্র করে তুলেছে। ভিক্ষে করতে গিয়েও রান্নাঘরে খাবারের গন্ধে তার জিভে ঝরণার মতো জল আসে আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় 'হারামজাদী বেহায়া, উঁকি মারছে দেখ। সাপের মতো।' তখন মনে মনে যে আত্মধিক্কার জেগেছিল তা মনে করে এখনও এই বৃদ্ধ জীর্ণ শরীরে চাঞ্চল্য আসে ; 'বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল।' অন্যদিকে ডাইনীর সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস মানুষের ঘৃণায় এসে বেড়ে গেছে যে, মানুষ ও প্রকৃতির ওপরেও সে এই শক্তিকে সচেতনভাবে ফলাতে চেষ্টা করে। দূর থেকে ছাতি-ফাটার মাঠ ধরে শিশু-কোলে একটি মেয়েকে আসতে দেখে সে ভাবে : 'ফুঁদিয়া ধুলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া ?' তখনই নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে—'না-না-না।' কখনো মাঠে ঘূর্ণি কড় উঠলে ঝাঁটা দিয়ে আস্ফালন ক'রে বলে, 'বেরো, বেরো, বেরো।' কখনো ঘূর্ণির সঙ্গে-ই নাচে। তারপর সেই শিশুকোলে মেয়েটি এসে জল চাইলে বৃদ্ধা তাকে জল আর পাটালি দেয়। বৃদ্ধা তখন স্বাভাবিক। কিন্তু শিশুটিকে দেখেই তার ভেতরকার অনিরূপিত শক্তি জাগে 'কচি লাউ ডগার মতো নরম নরম' শিশুটিকে দেখে তার জিভে জল আসে। তখন নিজেই বলে ওঠে, 'ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।' এই ডাইনী ও মানবীর বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বেই সে তারাদেবীতলায় মানত ক'রে বলেছে, 'মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেবো।' এই মানবিক বোধেই তার দাওয়ার কাছে নির্জন মাঠে যখন একটি মেয়ে প্রণয়ের অভিমান আবেদন পর্বে ব্যস্ত, তখন বৃদ্ধা তার জীবনের প্রেমানুভূতির প্রথম অভিজ্ঞতা ও বিবাহিত জীবনের কথা ভেবেছে এবং ছেলেটিকে দয়া পরবশ হয়ে সাহায্য করতে গেছে। কিন্তু ছেলেটি ভয়ে

পালাতেই তার অলৌকিক সর্বনাশী সত্তা মুহূর্তে ফিরে এসেছে। পালাতে গিয়ে ছেলেটির পায়ে হাড়ের টুকরো ফুটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে এবং লৌকিক বিশ্বাস মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাইনীর বাণে নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত হাড়ের টুকরো। আবার বাণ ছাড়াতে গুণীনের আগমন। সেই গুণীনের প্রহারের শব্দ ডাইনীর কানে যেতেই শুরু হয়েছে তার ভয়, গুণীনের মন্ত্র প্রহারের ভয়। বুকে হাঁপ ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। দূরে গ্রামে যেন কান্নার রোল। সারা দুপুর বন্ধ ঘরে থেকে সন্ধ্যার মুখে ছোট পুঁটুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে পালাতে শুরু করেছে। তারপর ছাতি ফাটার মাঠে। ঘূর্ণি ঝড়ে তার মৃত্যুর আগে একটি মাত্র বাক্যই তার মুখে বসানো হয়েছে: 'অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত তার স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো তুমি ফিরে এসো গো।' একটি মাত্র বাক্যে তার ভেতরকার অনিয়ন্ত্রিত শক্তি সম্পর্কে ভয়, তার অসহায় নিঃসঙ্গতা এবং বহুকাল আগেই মরে যাওয়া সেই শক্তিমান পুরুষটির কাছে সঙ্গ ভিক্ষার জন্যে ব্যর্থ ব্যাকুল প্রার্থনা তাকে এক করুণ মানবী করে তুলেছে। ডাইনীর ছদ্মবেশে এ গল্প এক মৃত্যুভয় ভীত অসহায় করুণ মানবীরই গল্প।

বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেও বলা চলে, একই মানবিক গুণেই—অর্থাৎ পরম নির্ভরশীল ভালোবাসা আর অনিবার্য মৃত্যুর দ্বন্দ্বে 'তারিণী মাঝি' অবিস্মরণীয় গল্প। অস্তিত্বের নিছক জৈবিক টানে স্ত্রী সুখীর গলা টেপার আগেও তারিণী শেষ বাক্যটি বলেছে: 'ভয় কি তোর, আমি—।' 'দেবতার ব্যাধি'র ডাক্তার গড়গড়ি চিকিৎসকের দেবতুল্য মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন সাধারণের চোখের আড়ালে জৈবিক তাড়নায় প্রচণ্ড ভাবে বার বার নাড়া খেয়ে, গ্রাম থেকে হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ হিসেবে শেষ অভিজ্ঞতাটি জানিয়েছিলেন বহুকাল বাদে চিঠি লিখে। মৃত্যু শয্যায় স্বীকারোক্তিমূলক সেই চিঠি আসলে ক্ষুধার্ত 'দেবতা'র সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। ডাক্তারের ভাষায় 'অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।' এই যুদ্ধই দেবতার মধ্যে মানুষের মুখটি দেখিয়ে দিয়েছে। 'নারী ও নাগিনী'র মধ্যে কদাচারী খোঁড়া শেখ কিশোরী সর্পিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে জড়িয়ে আদর করে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে যে আসক্তি প্রকাশ করেছে তাতে স্ত্রী জোবেদা ঈর্ষান্বিত হয়ে সর্পিণীকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়েছে। তারপর সর্পিণীর কামড়ে স্ত্রী যখন প্রাণ হারিয়েছে সেই মুহূর্তে শেখ বলেছে, 'জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করবো আমি।' তার

কারণ সর্পিণীকে সে যতই ভালোবাসুক জোবেদা তার কাছে প্রাণের চেয়েও বেশি : 'তু হামার জানের চেয়ে বেশি ' তবু সাপটিকে সে মারে নি। বলেছিল শুধু, 'তোর দোষ কি। মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারতো না।' নিছক জৈব আসক্তির অস্বাভাবিকতা নয়, নারী ও নাগিনীর প্রতি এই দ্বিমুখী মানবিক মমতাই গল্পটির মূল আকর্ষণ।

তারাশঙ্করের আরও কিছু স্মরণীয় গল্পে আর এক ধরনের বৈপরীত্যের ছবি পাই। এই বৈপরীত্যে দ্বন্দ্ব যেমন আছে আবার চমৎকার সহাবস্থানও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে জন্তুর হিংস্রতা ও সারল্য যে একই সঙ্গে লুকিয়ে থাকে তা তারাশঙ্করের মতো নাটকীয়ভাবে দেখাতে খুব কম লেখকই পেরেছেন।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটির কথাই আগে ধরা যাক। গল্পটি কালী বাগদী নামে এক খুনে ডাকাতের মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্প। চার-পুরুষ ধরে ব্রিটিশ আমল থেকে ডাকাতির কাজ ধরেছে। কোম্পানীর আমলে থানা পুলিশের জবরদস্তিতে এই ডাকাতি আর মদের নেশায় তাদের জীবন কেটেছে। অন্ধকারে কুলীর ঘাঁটিতে সে ওত পেতে বসে থাকতো। পথিক দেখলেই লাঠির ঘায়ে তাকে মেরে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়াই ছিল তাদের জীবিকা। কালীর সঙ্গে তার ছেলে তারাচরণও এই ব্যবসাই করতো। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে কালী একদিন শ্বশুরবাড়ি-ফেরতা তারাচরণকেই অন্ধকারে খুন করে আখড়াইয়ের দীঘিতে পুঁতে দেয়। তারপর সরল স্বীকারোক্তির পর সে দ্বীপান্তরের আসামী হয়। খালাস হয়ে দীঘির ধারে অন্ধকারে যখন ছেলের খোঁজ করছে সেই সময় গুলির শব্দে সচকিত হয়ে লাফ দিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে দীঘির খাদে পড়ে ঘাড় ভেঙে মারা যায়। ভাগ্যের পরিহাসে ছেলের সমাধি-স্থানেই বিকটদর্শন কালী বাগ্‌দীর মৃত্যু হয়। কিন্তু দ্বীপান্তরে আসামী সাব্যস্ত হবার আগে আদালতে 'হুকুম পেলে আমি কবুল খাই' বলে পুত্রহত্যার যে বীভৎস অকপট বিবরণ সে দিয়েছে তাতেই তার পাপবোধের মর্মান্তিক সরল প্রকাশ ঘটেছে।—'তবে এ যে হবে আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল—আমাদের বংশ থাকবে না—'নির্বংশ' হতেই হবে।'

অবশ্য এই পাপ বোধের দ্বন্দ্ব তার আগে প্রকাশ পায়নি, পুত্রহন্তা হবার পরই

এই বোধটি তার মনে কাজ করতে শুরু করেছে। কিন্তু 'কান্না' কিংবা 'জটায়ু' গল্পে মানুষের ভেতরকার দুটি বিপরীত স্বভাবের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। একটি হিংস্র জান্তব বৃত্তি আর একটি শিল্পী। 'কান্না' গল্পের নায়ক জনির মধ্যে একই সঙ্গে শয়তান ও শিল্পী যে কীভাবে কাজ করতো তার প্রমাণ জনির আত্মকথা। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে যে অন্ধ জনি তারের যন্ত্রে অপূর্ব সুরের বাজনা বাজিয়ে বেড়ায় তাকে মানুষ করেছিল তার নানী। কিন্তু কু-সংসর্গে পড়ে সে নানীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে পালায়। জন্মগত গানের গলা নিয়ে জনি কবরখানায় এক ফাদারের সঙ্গে পরিচিত হয়। এবং ফাদারের যন্ত্রে একটি গান শুনে তার এক আশ্চর্য আত্মিক উপলব্ধি হয়। ইতিমধ্যে নানীর ভালোবাসার টানে আবার নানীর বাড়িতে গিয়ে শোনে তারই দুর্বৃত্ত বন্ধুরা নানীর মৃত্যুর জন্যে তাকেই দায়ী করছে। মনে পড়ে তার বন্ধু কসাইয়ের ছেলে হালিম নানীর টাকার লোভে নানীকে একবার মারতে চেয়েছিল। তারই এই কীর্তি। এখন জনি ফিরতেই তারই ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। ঘরে বন্দী করে তাকে সন্ধ্যার সময় ট্রেনে তুলে দেবার লোভ দেখিয়ে বন্ধুরা চলে গেল। জনি বোঝে বন্ধুরা তাকে ধরিয়ে দেবে। তাই সে ঘর ভেঙে পালিয়ে ফাদারের বাড়ি আশ্রয় নেয়। কিন্তু তিন বছর বাদে ফাদারের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে সে হালিমের সামনে পড়ে। বাইরে ফাদার ছুটে আসছেন। জনিকে বাঁচাতে গিয়ে ফাদার যখন হালিমকে ধরেছেন তখন তার ছুরির ঘায়ে ফাদার প্রাণ হারালেন। তারপর হালিমের হিংস্র নখের চাপে জনির চোখ দুটি দৃষ্টি হারালো। সেই থেকে অদৃশ্য ফাদারকে নির্ভর করে সে ফাদারেরই দেওয়া যন্ত্রটি নিয়ে মোহময় সুরটি তুলে উপার্জন করে বেড়ায়। এককালের শয়তানী প্রবৃত্তি কেটে যেন শিল্পী মুক্তি চায়, মুক্তির শেষ লক্ষ্য হয়ে থাকেন ফাদার। তেমনি 'জটায়ু' গল্পের জটে পাগলার মতো অভিনয় শিল্পীও যে হঠাৎ ঘটনাচক্রে গাঁজাখোর বদমাস কালা গোঁসাইয়ের হাত থেকে শিবনাথের স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে পৌরাণিক জটায়ুর ভূমিকা নিতে পারে তা গল্পের শেষে না পেঁছালে বুঝতে পারা যায় না। এইরকম বিপরীত স্বভাবের সহাবস্থান হয়েছে 'ব্যাধি' গল্পেও। এই গল্পের নায়ক হারান আচার্যের মধ্যে . শিল্পী আর নিষ্ঠুর এক স্বর্ণলোভী একই সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মৃত্যুর আগে বিদায় নেবার কষ্টে সে আশ্রয়দাতাকে নিজের নাম প্রকাশ করে বলেছিল 'আমি পাপী', বলেছিল 'উদ্ধার করুন বাবু, আমায় উদ্ধার করুন।' নিজের বোনের ছেলেকে কাছে টেনে বলেছিল 'কোথায় আমার টাকা

আছে তোকে বলে যাই।' কিন্তু এমনই লোভ যে আশ্রয়দাতাকে কোথায় ধন সম্পত্তি আছে তা ঠিক করে বলে নি, মিথ্যে বলেছিল। বোনের ছেলেকেও বলতে গিয়ে বলেছিল, কাল বলবো। কিন্তু কাল আর আসে নি। অথচ এই হারানই কিন্তু জমিদারের গানের মজলিসে ওস্তাদের সঙ্গে চমৎকার সঙ্গত ক'রে তার 'মিঠা হাতে'র তারিফ পেয়েছিল। কাশীতে গিয়ে মঠে শিবের স্তব করেছিল ধ্রুপদ-ধামারে। সাধু সন্ন্যাসীরা বলেছিল, 'বিশ্বনাথকো কৃপা আপ্‌কো পর হো গিয়া।'

৪

শুধু মানুষের ভেতরকার লোভী, নিষ্ঠুর, হিংস্র বা জান্তববৃত্তির কথা নয়। জন্তুর সঙ্গে মানুষের স্নেহ-মমতার সম্পর্ক নিয়ে বা দুটি জন্তুর মধ্যেকার অবুঝ জৈবিক সম্পর্ক নিয়ে তারাশঙ্কর বেশ কিছুসংখ্যক গল্প লিখেছেন। সঠিক হিসাব দেওয়া যাবে না, কিন্তু তারাশঙ্করের সমকালে বা তার আগেও জন্তু নিয়ে এত গল্প আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তারাশঙ্করের যে সব গল্পে জন্তু মুখ্য নয় সে সব গল্পেও প্রসঙ্গক্রমে জন্তুর ওপর অসাধারণ মানবিক মমতার স্মরণীয় ছবি আছে। কিন্তু জন্তুর প্রসঙ্গে 'কালাপাহাড়' গল্পটির কথাই আগে মনে পড়বে, কারণ গল্পটির মধ্যে একাধারে জন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং দুটি জন্তুর মধ্যেকার অবুঝ জৈবিক সম্পর্কের কাহিনী বলা হয়েছে। কিংবা বলা উচিত, এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় একজনের অবোধ বেদনা ও নিষ্ঠুর মৃত্যু-বরণের আশ্চর্য কাহিনীই হলো কালাপাহাড়। 'নারী ও নাগিনী'র গল্পে তো মানুষ ও জন্তুর মধ্যে অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক, কিন্তু এ গল্পে আছে মানুষ ও জন্তুর মধ্যে সুস্থ স্নেহ-মমতার গভীর টান। চাষী রংলালের দুটি বলিষ্ঠ মোষের মধ্যে একটি—কুম্ভকর্ণ প্রভুকে বাঁচাতে গিয়ে চিতাবাঘের হাতে প্রাণ হারালো। রংলাল তার শোকে কাঁদলো, কিন্তু আর একটি মোষ—কালাপাহাড়—বন্ধুর শোকে এমন বিপর্যস্ত হলো যে তাকে বিক্রি করে দিতে হলো পাইকারের কাছে। কিন্তু পাইকারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সে উদ্দাম বেগে প্রভুকে খুঁজতে গিয়ে শহরের রাস্তায় পড়লো এসে এক অপরিচিত 'জানোয়ার'—পুলিশের মোটরের সামনে। গুলিবিদ্ধ হয়ে তার প্রাণ গেল। কিন্তু শেষ ঘটনাটি বড় নিষ্ঠুর। সাহেব সঙ্গী কনস্টেবলকে বললেন, 'ডোমলোককে বোলাও।' যে উন্মাদনায় কালাপাহাড় স্নেহ-কাঙাল হয়ে ছুটে আসছিল প্রভুর কাছে নিয়তি তাকে নিয়ে গেল ডোমের কাছে প্রাণহীন অবস্থায়।

তীব্র মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত হয়েই লেখক যেন এক স্নেহ কাঙাল জন্তুর অবোধ উন্মাদনাকে মুহূর্তের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মৃত্যু পার করে পৌঁছে দিলেন ডোমের হাতে। জন্তুর প্রতি গভীর মমতাই যেন শিল্পীকে নির্মম নিষ্ঠুর নিরাশক্তিতে পৌঁছে দিয়েছে।

আবার জন্তুর প্রভুভক্তির আর একটি আশ্চর্য ছবি আছে কুকুরের গল্পে— 'ডগি অ্যালসেশিয়ান নয়।' মনিবের সব সন্দেহ দূর করে ডগি নীরবে চোর ধরে চোরটিকে সরবে চীৎকার করণে বাধ্য করেছে। তেমনি জন্তুর প্রতি মানুষের স্নেহশক্তির চমৎকার গল্প 'চিনুমণ্ডলের কালাচাঁদ।' যে অবাধ্য, গরুটিকে চিনুমণ্ডল ছোট শিশুর মতো যত্ন করে লাঙল বইতে শিখিয়েছেন আদর করে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন, চিনু মণ্ডলের অসুখে সেই কালাচাঁদকে তাঁর অজান্তে পাইকারদের হাতে বিক্রি করতে হয়েছিল। অসুখ থেকে উঠে চিনু কালাচাঁদকে না পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন। সেই কালাচাঁদকে চোদ্দ বছর বাদে কসাইখানা যাত্রী বুড়ো গোরুর পালের মধ্যে দেখতে পেয়ে ফের কিনে নিয়েছিলেন। তারপর গোরুর গলা ধরে কেঁদেছিলেন। শেষ পর্যন্ত চিনুর মৃত্যুর সাত দিন বাদে কালাচাঁদও খাওয়া বন্ধ করে মারা যায়। 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' গল্পে দেখি তারাশঙ্করের কাল কালান্তরের ছবি ফুটেছে যেন বুড়ো একটি ঘোড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবে। বুড়ো ঘোড়াটি শেষ বারের মতো মনিবের নতুন ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ঠিক যেমন 'পৌষ লক্ষ্মী' গল্পে বৃদ্ধ মুকুন্দ পাল যুবক শ্রীকৃষ্ণ পালের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও ধান ক্ষেতে পড়ে মরেছিল। কালাপাহাড় কিংবা ডগি যেমন প্রায় মানবিক স্বভাবেই জীবন্ত, তেমনি মানুষের বিকল্প হিসেবেই জন্তুকে দেখা হয়েছে 'আফজল খেলোয়াড়ি আর রমজান আলি' গল্পে। গল্পটিকে এমনিতে সার্কাসের খেলা আর শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প বলে মনে হলেও আসলে সার্কাস খেলোয়াড় আফজলের ফিরে-পাওয়া মৃত পুত্রই যেন রমজান বাঘ। 'খোদাতালার মর্জি হলে বাঘ যে-বাঘ' সেও হয় মানুষের বেটা— মানুষের মতোই তার দরদ তখন।' জন্তুর ওপর এই পুত্র স্নেহের কারুণ্যেই গল্পটি শেষ হয়েছে। বাঘের সামনে আফজল সেই পুত্র স্নেহবশেই এগিয়েছিল এবং বাঘের আক্রমণে আহত হয়ে সে আর সেরে ওঠে নি। 'উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' পৌরাণিক হনুমান-রাজত্বের নিয়ম কানুন দিয়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে একটি গ্রামে বানরের উৎপাতের সঙ্গে আশ্চর্য দক্ষতায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং

দু'দল হনুমানের লড়াইয়ে একটি পরাজ্ঞ বীর হনুমানের নিঃসঙ্গমৃত্যু এক বিশুদ্ধ মানবিক মহত্ত্বের স্বাদ এনেছে। মাঝখানে একটি স্বপ্নদৃশ্য যেন এই পরাজ্ঞ বীরের করুণ মৃত্যুরই ইঙ্গিত বয়ে এনেছে—পরাজ্ঞ শক্তিমান মানুষ যেমন দূরে কোন নিঃসঙ্গ অরণ্যে গিয়ে, মর্মান্তিক বেদনায় মৃত্যুকে ধীরে ধীরে মেনে নেয়। জীব-জন্তুর গল্পে প্রায় সর্বত্রই তারাশঙ্কর অদ্ভুত এক মানবিক স্বাদ আনতে পারতেন। সে স্বাদ কখনো জন্তুর স্বভাবে কখনো জন্তুতে জন্তুতে সম্পর্কে কখনো বা মানুষ ও জন্তুর সম্পর্কের মধ্যে এবং সর্বত্রই এক আত্মিক সম্পর্কের গূঢ় ইঙ্গিত থেকে গেছে এসব গল্পের মধ্যে।

কী অসাধারণ দক্ষতায় তারাশঙ্কর জন্তুকে মানুষের গল্পে মানুষের রূপান্তরের ভূমিকায় নিয়ে এসেছেন তা 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পেই প্রমাণিত হয়েছে। এ গল্পকে ঠিক পশুগল্প বলা যাবে কি না জানি না, কিন্তু গল্পের নায়কের রূপান্তরের নেপথ্য শক্তিকে যদি মূল নায়ক বলি তাহলে গল্পটি অবশ্যই পশুর গল্প। গল্পের নায়ক বলরাম গোঁয়ার বদরাগী বৈষ্ণব। তার দোকানের পাশে একটি হেনার ডাল পুঁতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত কঙ্কালসার বাছুর সতেজ ফুটন্ত গাছটি মুড়িয়ে খেতে শুরু করলে বলরাম এক লাঠির ঘায়ে বাছুরটিকে মাটিতে ফেলে দেয়। বাছুরটি উঠতে না পারায় আরও দুটি লাথি খায়। এর পরের বর্ণনাটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'নিরুপায়ে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতভাগা জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা কয়টি ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল—পাতার সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া গেল; শুধু কয়টি বিন্দু জল চোখের পাতার দীর্ঘ রোমে শিশির বিন্দুর মত চকচক করিতে থাকিল।....হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া বলরাম বিস্ফারিত নেত্রে পশু শিশুটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচভাবে—

মানুষের লালসার অত্যাচারে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত কঙ্কালসার জীব, উদরের জ্বালায় অতি প্রলোভনে এই সুশ্যাম সরস গাছটিতে মুখ বাড়াইয়াছিল, মুখের পাশ গড়াইয়া সবুজ রসমিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে, কয়টা পাতা এখনও গোটা রহিয়াছে।'

এই দৃশ্যে রাগান্ধ গোঁয়ার বলরামের রূপান্তর ঘটেছে এবং তারপর থেকে আমৃত্যু এই বাছুর এলোকেশী তার সঙ্গী। রোগের যন্ত্রণায় ও মানুষের ঘৃণায় বলরাম যখন আত্মহত্যা করেছে তখন দেখা গেছে ধারে কাছে কেউ নেই, শুধু

এলোকেশী 'পরম-স্নেহে তার দেহখানি চাটিতেছে।' বীভৎস ক্লেদাক্ত মৃতদেহের গায়ে জন্তুর এই স্নেহ লেহনের ছবি বাঙলা গল্পে খুবই দুর্লভ।

৪

পশু ও মানুষের আত্মিক সম্পর্ক রচনায়, জৈবিক ও মানবিক বৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানের অন্তর্নাটকে, নিষ্ঠুরতা ও দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে সারল্যের কিংবা শিল্পী সত্তার বিচিত্র মিশ্রণে তারাশঙ্কর যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ব্যবস্থায় জমিদারদের অত্যাচার ও ভোগবিলাসিতার সঙ্গে ঔদার্যের বিচিত্র মিশ্রণের স্মরণীয় ছবি তাঁর অনেক গল্পের শিল্প-মূল্য বাড়িয়েছে। বোধহয় বাঙলাগল্পে বৈষ্ণব সমাজ যেমন শরৎচন্দ্রের হাতেই তিক্ত-মাধুর্যে স্মরণীয় হয়েছিল তেমনি পড়ন্ত জমিদার সমাজ তারাশঙ্করের হাতেই প্রথম সার্থক ছোট গল্পের রূপে স্মরণীয় হয়েছিল। পৈতৃক সূত্রে অনেকেই তো জমি-জমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এমনভাবে জমিদারী যুগকে শেষ বারের মতো বিষণ্ণ মমতায় ফিরে-দেখার ক্ষমতা সমকালীন কোন শিল্পীর ছিল কি না সন্দেহ। 'রাজা, রাণী ও প্রজা' নামে একটি গল্পে জমিদারী ব্যবস্থায় জমিদারের অত্যাচার ও জমিদার গৃহিণীর প্রজাবাৎসল্য চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ গল্পে জমিদারের চরিত্র যেন জমিদারী ব্যবস্থার শিকার। যেন একটা বিরক্তিকর ব্যবস্থার মধ্যে নিজের খেয়াল-শখ ছেড়ে শাসকের দণ্ড হাতে নিতে হয়েছে জমিদারকে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রজাবৎসল গৃহিণীর কারসাজিতে সে দণ্ডের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটেনি। 'সমুদ্র মন্থন' নামে আর একটি গল্পে দুর্ভিক্ষের পরিবেশে জমিদার-দম্পতি মানসিক অস্বস্তির মাঝখানে একটি অভাবগ্রস্ত রুগ্ন স্বামী আর তার খোনা স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার বৈপরীত্য এনে জমিদার-গৃহিণীর মনের পরিবর্তন ঘটানোর মুহূর্তটিকে সূক্ষ্ম কমনীয়তা দিয়েছেন লেখক। কিন্তু 'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘর' এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি গল্প। রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তাঁর একটি লাটের মুসলমান, বাগ্দী ও হাড়ি প্রজারা গোমস্তাকে পুড়িয়ে মেরেছে বলে লাটশুদ্ধ পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। স্ত্রী তখন বলেছিলেন, 'লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় করো না।' এই উচ্চারণ যে ভাগ্যের পরিহাস তা কিছুদিন পরেই প্রমাণিত হয়েছে। ছোট বোনের বিয়েতে বাপের বাড়ি গিয়ে ফেরার পথে স্ত্রী ও বংশের একমাত্র সন্তান বজরা ডুবিতে মারা গেল।

রাবণেশ্বর যখন উদাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন, ঠিক সেই সময় গঙ্গার বানে ভেসে যাওয়া বিপন্ন প্রজারা আশ্রয়প্রার্থী হলো। রাবণেশ্বর তাঁর মহল খুলে দিলেন। তাঁর সাধের জলসাঘরটিও তিনি খুলে দিলেন যখন শুনলেন. বিপন্ন এক প্রজার মেয়ের বিয়ে পণ্ড হতে বসেছে। এদিকে রাবণেশ্বর যখন সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাবেন তখন দেখলেন জলসাঘর আলোয় ঝলসে উঠেছে। এই দুর্যোগের মুহূর্তে উদ্দীপ্ত বাতিগুলি রাবণেশ্বরের মনে এক অভাবিত মানসিক উদ্ভাস নিয়ে এলো। তিনি ফিরে এলেন। 'রায়বাড়ি'র এই রাবণেশ্বর নিষ্ঠুরতায় ও ঔদার্যের স্ববিরোধিতায় অত্যন্ত জীবন্ত, যদিও ঘটনাগুলি খুব দ্রুত নাটকীয়তায় সাজানো।

কিন্তু 'জলসাঘর' বিন্যাসে আরও স্বাভাবিক, সংহত ও প্রতীকধর্মী। রাবণেশ্বরের সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের আমলে আর একটি দুর্ঘটনায় বিশ্বম্ভরের স্ত্রী, দুটি ছেলে ও একমাত্র মেয়ে সবাই মারা গেছে। একা বিশ্বম্ভর তারপরেও জলসাঘরে বাতি জ্বালাতেন। বাইজি-নাচে রাত্রি মুখর হতো। এখন মহাজন মহিম গাঙ্গুলি গ্রাম দখল করার পর থেকে ঐশ্বর্যের সমস্ত প্রকাশই স্তব্ধ। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে রয়েছে শুধু হস্তিনী 'ছোট গিন্নি' আর বিশ্বম্ভরের বাহন 'তুফান' ঘোড়া।

দু বছর গৃহবন্দী থাকার পর বিশ্বম্ভরের টনক নড়েছে। উঠতি মহাজন মহিম গাঙ্গুলির ছেলের অন্নপ্রাশনে বিলিতি ব্যাণ্ড বাজছে। ছোট গিন্নি আরও চঞ্চল হয়েছে। রায়বংশেরই মহাজন মহিমের এই চাকচিক্যে আহত হয়ে বিশ্বম্ভর স্তব্ধ প্রাসাদের মধ্যে গুমরে উঠলেন। মহিমের উদ্দেশ্য, শূন্যগর্ভ বিশ্বম্ভরকে তিনি শেষ ঘা টি মারবেন। কিন্তু অন্নপ্রাশনে বিশ্বম্ভর গেলেন না, মোহর পাঠিয়ে দিলেন। মহিম তবু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি রায়বাড়িতে এসে বিশ্বম্ভর যাননি বলে দুঃখ করে বাইজি নাচের শেষে বাইজিকে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বম্ভরের কাছে। প্রথমটা একটু ক্রুদ্ধ হলেও বিশ্বম্ভর বাইজির রূপে মুগ্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে যৌবনদিনের বাইজি চন্দ্রাবাঈকে তাঁর মনে পড়ে গেল। উন্মুক্ত জলসাঘরের আলোয় কৃষ্ণা বাঈয়ের নাচের মদিরতায় স্থান-কাল ওলটপালট হয়ে গেল। মজলিস ভেঙে গেলেও নিজে এসরাজ হাতে সুরের ইন্দ্রজাল ছড়াতে লাগলেন। গানের পর গান গেয়ে শেষ রাত্রিতে কৃষ্ণাবাঈ ঘুমে এলিয়ে পড়লে যৌবনের উচ্ছল সাজে বিশ্বম্ভর তুফানের পিঠে উঠে ছুটলেন সুর আর সুরার নেশায়। ছুটতে ছুটতে তাঁরই হারানো লাট কীর্তি হাটের সামনে

দাঁড়াতেই হুঁশ হ'ল। তীব্র বেদনায় লাগাম টেনে ফিরে এলেন। জলসাঘরে তখনো আলো জ্বলছে। উঁকি মেরে মনে হল, বাইজি-শূন্য জলসাঘরে রায়বংশের সাত পুরুষের মোহ জমে আছে। আর্ত কণ্ঠে তিনি জলসাঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিতে বললেন। তীব্র আক্রোশে হাতের চাবুকটা জলসাঘরের দরজায় সশব্দে এসে পড়লো। নিজের বিবেকহীন উন্মাদনায় তীব্র আক্ষেপে আত্মনিগ্রহের সেই চাবুক গিয়ে পড়লো জলসাঘরের দরজায়। জমিদারী শূন্য আভিজাত্য-গর্বিত বিষণ্ণ বিশ্বম্ভরের নিঃসঙ্গতা, অভিমান, উত্তেজনা, উন্মত্ততা ও স্মৃতির আলোড়ন, মহলে মহলে অতীত ঐশ্বর্যের স্তব্ধ ম্লান অব্যবহার্যতা, নতুন ধন গর্বিতের ঠাণ্ডা কুট চাল এবং ধনহীন তীব্র ভয়ার্ত আক্ষেপের এমন শিল্পরূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। জমিদারী প্রথায় যৌবন ও পতনের এমন ট্র্যাজিক ছবি জলসাঘর-প্রতীকের এমন লোভনীয় হাতছানি বাঙলা গল্প সাহিত্যে তুলনাহীন বললেই চলে। 'বন্দিনী কমলা' গল্পে তারাশঙ্কর প্রায় অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন পড়ন্ত জমিদার মহলের আত্মবিস্মৃত বিলাসিতার বর্ণনায়। রায় বাড়ির রাবণেশ্বর যেমন নিষ্ঠুরতায় ঔদার্যে জীবন্ত, জলসাঘরের বিশ্বম্ভর ব্যবসাদারি কুট চালে পরাস্ত হয়ে আভিজাত্যের অভিমানে এবং কঠিন হৃতসর্বস্ব বাস্তব চেতনায় জীবন্ত। 'বন্দিনী কমলা' গল্পের শেষে লক্ষ্মীর ঘর ঠেলে খোলার মধ্যেও এই রকম কঠিন এক বাস্তব চেতনার প্রকাশ আছে। তারাশঙ্কর কঠিন মাটিতে পা দিয়েই অতীত ঐশ্বর্যের জলসাঘর খুলে দেখিয়েছেন। 'ঘর শূন্য অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে।' সেই আভিজাত্য-গর্বিত রূপটি তখন যেন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বুঝতে পেরেছে, 'মোহ'। 'কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।' জমিদার সমাজের গল্পে তারাশঙ্করের এই মোহ-সঞ্চার-ক্ষমতা, সামাজিক ইতিহাসের এক পর্বান্তের এই গোধূলি-লগ্ন পাঠকের মনে অবিস্মরণীয় কোন মত্ত স্মৃতির মতো হানা দিতে থাকে বার বার।

যাকে আমরা আধুনিক অর্থে ছোট গল্প বলি—নির্বাচিত ও সুবিন্যস্ত কিছু ঘটনার মধ্যদিয়ে দ্রুত লক্ষ্যভেদ করা—তারাশঙ্করের খুব কম গল্পেই সেই নির্বাচন, বিন্যাস ও লক্ষ্যভেদের কঠিন সংযম লক্ষ্য করা যায়। সেদিক থেকে খুব আটসাট তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী গল্প তারাশঙ্করের কমই আছে। যেমন সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ডের কথাই ধরা যাক। পরিশিষ্ট বাদে এই খণ্ডে যে একষট্টিটি গল্প আছে তার মধ্যে বাইশটি কি তেইশটি গল্প

দশ পাতা বা তার কমে, অর্থাৎ প্রায় চার হাজার শব্দে বা তার কমে লেখা। আর সবই বেশি। 'নারী ও নাগিনী', 'মুহূর্ত', 'খাজাঞ্চিবাবু'র মতো তীব্র অতি নির্বাচিত ও বক্তব্যমুখী সুবিন্যস্ত গল্প তারাশঙ্কর কমই লিখেছেন, কিংবা 'শেষ কথা'-র মতো স্নায়ুস্পন্দিত মেদহীন অবিস্মরণীয় গল্প।

কিন্তু একথা বলার অর্থ এই নয় যে, ছোট গল্পের শিল্পী হিসেবে তিনি ব্যর্থ। শিল্পী হিসেবে সকলেই যে মোপাসাঁ কি ও'হেনরি কিংবা সাকি-র মতো নিতান্তই ছোট পরিসরে গল্পের ফ্রেম তৈরী করবেন তা নয়। টলস্টয় কিংবা টুর্গেনিভের অনেক দীর্ঘ গল্প আছে যা আকারে ছোট উপন্যাসের মতো হলেও ছোট গল্পেরই তুলনাহীন শিল্প হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। আসলে তারাশঙ্করের মোট গল্প সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গল্পই একটু দীর্ঘ এবং তাঁর এই দীর্ঘ গল্পগুলির অনেকগুলিই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। 'জলসাঘর', 'তারিণী মাঝি', 'কালাপাহাড়', 'ডাইনী','না', 'পৌষলক্ষ্মী' কি 'দেবতার ব্যাধি'-র মতো অনেক গল্প সাধারণ গল্পের তুলনায় একটু দীর্ঘ হলেও গল্পগুলিতে শিল্পী তারাশঙ্করের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায়ের তুফানের ডাকে ভোর রাত্রে প্রথম চমক ভাঙা থেকে শুরু করে যে কাহিনী এগোতে লাগলো, তাতে বিশ্বম্ভরের স্মৃতি, অতীত গৌরব, স্মৃতির মত্ততা, নির্বাক পরিত্যক্ত মহলের পর মহলের বর্ণনা, জীব-জন্তুর ডাক ও ঘন্টার ধ্বনি জমিদারীপতনের তিক্ত স্মৃতি, উঠতি ধনী মহিম গাঙ্গুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীরব অভিমান ও সংকোচ, জলসাঘরের মত্ততা ও পূর্ব স্মৃতির মেশামেশি, উদ্দাম আবেগে বিশ্বম্ভরের ছুটে চলা ও ফিরে আসার তীব্র আক্ষেপ যে ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে তা অতিবিন্যস্ত বা অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন। এক বিশেষ যুগের শ্রেণী-চরিত্রের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বটিকেই তারাশঙ্কর প্রায় উপন্যাসের গ্রথ গতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন—যেন শেষ বারের মতো মরিয়া হয়ে ওঠা একটি অচল ব্যক্তিত্বের মর্মান্তিক বিস্ফোরণ। তেমনি 'ডাইনী' গল্পেও বর্তমান নিঃসঙ্গ স্মৃতি-সর্বস্ব ডাইনীর আশৈশব মানসিক লড়াই-এর ইতিহাসটুকু ফোটাতে গিয়ে লেখককে সময়ের বিভিন্ন স্তরে বার বারই যাতায়াত করতে হয়েছে। যদিও গল্পটি আসলে ডাইনীর জীবনের শেষ তিন দিনের দুটি ঘটনার উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অতীতের অনেকগুলি ঘটনার স্মৃতি নানা সময়ে ডাইনীর মনে ছায়া ফেলে তার অমানুষিক ক্রোধ এবং অতি আক্ষেপকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে। তাছাড়া ভূমিকায় ডাইনীর পরিবেশ ও

তার সম্বন্ধে যে লৌকিক বিশ্বাসকে গড়ে তোলা হয়েছে, তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সেই বিশ্বাসকেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাশপথে যে ডাইনী এসেছিল বলে লোকে বিশ্বাস করতো, সেই ডাইনী খৈরী গাছের ডালে আটকে গিয়ে মরে যাওয়াতে সেই লৌকিক বিশ্বাসটিকেই স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাইনীর সম্পর্কে লৌকিক ধারণা এবং ডাইনীর নিজস্ব কার্যকলাপ ও তার আত্মপীড়ন—দুটি বৃত্তের এই কাহিনীকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার এবং সেই জন্যেই ডাইনী একটু দীর্ঘ আকারের গল্প। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তো দৈর্ঘ্যকে প্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করা যায় না। 'পৌষ লক্ষ্মী' নামে বিখ্যাত গল্পটিতে এক বুড়ো চাষী মুকুন্দ পালের সঙ্গে জোয়ান চাষী শ্রীকৃষ্ণ পালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী বলা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে মুকুন্দ পালের যৌবনকালের সমর্থ শরীরের নানা কর্মকাণ্ডের স্মৃতি এনে বর্তমান বার্ধক্যের হতাশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কিন্তু তেরোশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পরিবেশে গ্রামের চাষবাসের বর্ণনা, মুকুন্দ পালের বার্ধক্যের অক্ষম শরীরের দীর্ঘ বর্ণনা, তার বিবাহিত জীবন, তার মেয়ে ও নাতনির কথা, তার বলদের কথা, মেয়ে ও নাতনির চোখে মুকুন্দের পরিবর্তন, দশাসই মুকুন্দ পালের যাত্রার অভিনয়ের পুরোনো গল্প এতো দীর্ঘ ও পুনরাবৃত্তিময় যে মনে হয়, তারাশঙ্কর তাঁর অন্যান্য গল্পের চেয়েও একটু সংক্ষিপ্ত আভাসে এ-সব কথাই বলে মুকুন্দ পালের ট্র্যাজিক মৃত্যুকে আরও সংহত করতে পারতেন। তেমনি অন্যদিকে 'শেষ কথা'র মতো আশ্চর্য গল্প, কথকতার ভঙ্গিতে তাৎপর্যের যে গুরুত্ব পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের লিপিকার-ই সংযত ও সুপরিচ্ছিন্ন কথিকাগুলির কথাই মনে করিয়ে দেয়। সমাপ্তিতে শেষ দুটি মাত্র শব্দের উচ্চারণও রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' কিংবা 'নষ্টনীড়'-এর শেষ সংক্ষিপ্ত উক্তিটির মতো অন্তর্লীন তাৎপর্যে মুখর হয়ে ওঠে। 'নারী ও নাগিনী' কিংবা 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পেও এই জাতীয় সংযম চোখে পড়ে। কিন্তু তারাশঙ্কর এই রকম পরিমিত আকারের গল্প খুব কমই লিখেছেন।

নাটকীয়তা তারাশঙ্করের গল্পের একটি অন্যতম প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ নাটকীয়তা বহু বিখ্যাত গল্পেই মানসিক দ্বন্দ্বের বহির্মুখী কোন সংঘর্ষ বা নাটকীয় উন্মত্ততায় প্রকাশ পেয়েছে। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় তাঁর মর্মান্তিক আত্মপীড়নের কশাঘাতে তুফান-ঘোড়াকে ছুটিয়েছেন, ফিরে এসে চাবুক কশিয়েছেন জলসাঘরের দরজায়। 'তিনশূন্যে'-র বীভৎস ভিখিরি কামনার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার লালসা মেটাতে, তারিণী মাঝিও

বন্যার প্রবল স্রোতে রুদ্ধশ্বাস হতে হতেই নিছক অস্তিত্বের তাড়নায় স্ত্রী সুখীর গলা টিপে ধরেছে। 'আখড়াইয়ের দীঘি'তেও পুত্রহন্তা কালীচরণ বাগ্‌দি ঘটনাচক্রে যে দীঘিতে নিজের ছেলেকে মেরে পুঁতে রেখেছিল সেই দীঘিতেই গুলি খেয়ে ঘাড় ভেঙে মরেছে। 'ডাইনী' গল্পেও মানসিক যন্ত্রণার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তীব্র ধুলোর ঝড়ে ছুটন্ত ডাইনী যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে কাঁটা গাছের ছুঁচোলো ডগায় আটকে গিয়ে মারা গেছে এবং রক্ত ক্ষরণের পর শরীরের নিচে মাটিতে কাদার ঢেলা বেঁধে গেছে। দূরে শকুনীর পাল নামতে শুরু করেছে তাতে মনে হয়েছে এক ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় অক্ষম একটি মানুষ যেন প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নাটকীয়ভাবে শেষ বারের মতো আত্মসমর্পণ করেছে। তেমনি আবার দৃশ্যত নাটকীয়তা না থাকলেও তারাশঙ্করের বেশ কিছু ভালো 'অন্তর্নাটক' আছে, হঠাৎ মানসিক কোনো উদ্ভাস আছে যাতে গল্পের মোড় ফিরে গেছে। বিশেষ করে বৈষ্ণব রসের গল্প এবং জীবজন্তুর 'গল্পে যেখানে মানুষের সঙ্গে জন্তুর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সেই সব গল্পের অনেক ক্ষেত্রেই এই মানসিক বোধের জাগরণ চোখে পড়ে। 'হারানো সুর' গল্পের গিরি তীর্থযাত্রার মুখে হঠাৎ স্বামীর মধ্যেই তার বৃন্দাবনকে খুঁজে পেয়েছে। 'প্রসঙ্গ মালা' গল্পে বিলাসিনী স্বামীত্যাগিনী ললিতাও শেষ পর্যন্ত কীর্তনীয়া গোপালকেই বরণ ক'রে নিয়েছে মানসিক আবেগে। 'রসকলি'-র মঞ্জরীও পুলিনকে ভালবেসেও হঠাৎ বৈরাগ্যের উদ্ভাসে চলে গেছে বৃন্দাবনের পথে। তেমনি জীবজন্তু কেন্দ্রিক গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর স্বাভাবিক ঈর্ষার কথা ভেবেই সাপিনীকে মারেনি, ছেড়ে দিয়েছে। 'আফজল খেলোয়াড়ি আর রমজান শের আলি'র গল্পে সার্কাসের খেলোয়াড় আফজল তার রমজান-বাঘের মধ্যে যেন ফিরে পাওয়া পুত্রকেই দেখে স্নেহের কারুণ্যে ভরে উঠেছে। অধ্যবসায়ী নটু মোক্তার যখন বড়লোক হলেন, বিবাদী পক্ষের বড়লোকের ঘরেই ছেলের বিয়ে দিলেন এবং যখন আর মামলার পরাজয় তিনি সহ্য করতে পারেন না সেই সময় মুনসেফবাবুর একটি চিঠি তাঁর বিবেকে খোঁচা দিল এবং এই আকস্মিক আত্মদর্শনে যে মুহূর্তে মর্মপীড়া অন্তর্নাটক ঘটেছে সেই মুহূর্তেই গল্পটি শেষ। 'খাজাঞ্চিবাবু' এবং 'ডাকহরকরা' গল্প দুটিতেও এই জাতীয় অন্তর্নাটক প্রাধান্য পেয়েছে। সমকালীন আর একজন বিখ্যাত শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পই এই জাতীয় মানসিক উদ্ভাসেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আরও কিছু কিছু কৌশল

চোখে পড়ে। যেমন 'উত্তর কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড'। একটি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর ফ্যানট্যাসিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা পৌরাণিক রূপকের আবরণে মোড়া নৈতিক তাৎপর্যের গল্প 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী।' রূপকথার আরেক নাম যদি রূপক হয় তাহলে সত্যপ্রিয়ের গল্প তাই। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপ্রতিনিধি-রূপে সত্যপ্রিয়ের আবির্ভাব। অনিবার্য ভাবেই সত্যপ্রিয়ের যে মুকুট প্রাপ্তি, প্রজার পায়ের নিচে সে মুকুট রাখাতেই তার প্রমাণ।

মূলত অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের লেখক চরিত্র তৈরি করেছে। বিচিত্র ও ব্যাপক, অথচ খুব বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। সামন্ত যুগ ও শিল্পায়নের সন্ধিতে যুদ্ধোত্তর বাঙলা দেশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর জীবনের যে দ্বান্দ্বিক চেহারাটিকে লক্ষ্য করেছেন, মনে হয় তারই প্রভাবে তাঁর গল্পে সময়-বদলের কৌশলটি স্বতস্ফূর্তভাবেই এসে পড়েছে। অতীত বর্তমানের বৈপরীত্যের ঘটনাপোড়েনে তাঁর বহু গল্প (এবং উপন্যাসও) এক বিদীর্ণ মানসিক সত্তাকে তুলে ধরেছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীর মমতা মিলেছিল বলেই জমিদারী ঐশ্বর্য, জমি-জমা সম্পত্তি ও তার মামলা-সংক্রান্ত জটিলতা। বীরভূম অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সংস্কার এমনকি লৌকিক ভাষা পর্যন্ত ছিল তারাশঙ্করের নখদর্পণে। শুধু বীরভূম অঞ্চল কেন অবাঙালী আফজল খেলোয়াড়ির ভাষা ও স্বরভঙ্গিও তারিফ করবার মতো। ভাষণই যে অনেক সময় চরিত্রের ভাব-ভঙ্গিকে গড়ে তুলে নিখুঁত করে চোখের সামনে ধরে দেয়, আফজল খেলোয়াড়ি, কমল মাঝি কিংবা 'শেষ কথা'-র বুড়াবুড়ি তার মোক্ষম প্রমাণ। যে শিল্পীর মনোযোগে এদের দেখেনি, এদের ভাষা শোনেনি, তার পক্ষে আফজল, কমল কিংবা বুড়া-বুড়ির সংলাপ রচনা করা অসম্ভব। চোখে দেখা অভিজ্ঞতা আর কানে-শোনা ভাষা দুটিকেই একমাত্র মনে ধরে রেখে তারাশঙ্কর সে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। একই নাটকীয় দক্ষতায় পশু, মানুষ আর মানুষের সম্ভাব্য দেবরূপের ভেতরকার টেনশনকে তুলে ধরেছেন। তাই নাগিনী হয়ে যায় সতীন, নিছক অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে প্রেমিক তারিণী হয়ে যায় স্ত্রীর হত্যাকারী, সেবাব্রতে আত্মত্যাগী ডাক্তার দেবতা ক্ষুধার্ত হয়ে নৈবেদ্যের বলি আদায় করতে করতে শেষ পর্যন্ত লালসার অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে আড়ালে সরে যান। বিবর্তনের এই তিন স্তরেই পারস্পরিক যে টানা-পোড়েন চলে—সেই টেনশনও তারাশঙ্করের গল্পের বাস্তবিকতার আর এক মাত্রা। গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলেই তাঁর পক্ষে কালাপাহাড় আর কালী বাগ্দী, মোষ আর মানুষের অঙ্গনটিকে স্মরণীয় করে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমজাগতির ধারা

অলোক রায়

তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশকালের ছবি যতটা স্পষ্ট ভাবে ফুটেছে, সম্ভবত আর কোন বাঙালি লেখকের রচনায় তেমনটা পাইনি। সেই প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত 'কীর্তিহাটের কড়চা' পর্যন্ত অধিকাংশ উপন্যাসে তিনি 'কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা' প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৮৯৮ সালে জন্ম থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে বাস করেছেন, বা জন্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। গ্রামবাঙলার সঙ্গে এমন নিবিড় সম্পর্ক একালে খুব কম লেখকের ছিল। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে গ্রাম বাঙলার সমাজ পটভূমি ব্যবহার করেন, কিন্তু স্থিরচিত্র হিসেবে নয়, দ্বন্দ্বমুখর কালান্তরের ইতিহাস হিসেবে। তিনি বার বার বলেন, "আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।" তারাশঙ্করের সমাজ ভাবনায় তাই সমাজ গতির ধারা আবিষ্কারের প্রয়াস প্রধান হয়ে ওঠে। পুরনো জমিদার পরিবারের সন্তান, যদিও জমিদারি থেকে আয় যৎসামান্য। ইতিমধ্যে বিত্তশালী নতুন ব্যবসায়ী বা পুরনো মহাজন জমির মালিক হতে শুরু করেছে। তারাশঙ্করের ভাষায় "এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"

তারাশঙ্কর যখন প্রথম উপন্যাস লিখছেন (১৯২৯-৩০) তার অনেক আগেই গৌরবময় সেকালের অবসান হয়েছে। কিন্তু সেকালের সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সে-কাল কবে এ-কালে পরিণত হয়েছে তার সাল-তারিখের বিচার আপাতত জরুরি নয়। এক হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই একালের সূচনা। রাজনারায়ণ বসু আরও একটু পিছিয়ে গেছেন, তবে তাঁর সেকাল-একাল অনেকটাই শহরের ইংরেজি-নবিশদের তুলনাসূত্রে এসেছে।

তারাশঙ্কর লাভপুর গ্রামে নবযুগের আগমনী প্রত্যক্ষ করেছেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়—"এল ঝড়। এল নূতন কাল। এল আমার কালের নূতন কাল।" অন্যত্র তিনি লেখেন "মহাকাল নূতন যুগে বেশ পরিবর্তন করলেন, রূপান্তর গ্রহণ করলেন। ১৯০৫ সাল নিয়ে এল নূতন দৃষ্টি। নূতন উপলব্ধি। নূতন ভাবধারা।" 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথের হাতে মায়ের রাখি পরিয়ে দেওয়া, তারাশঙ্করের নিজের কৈশোর স্মৃতিকে ভিত্তি করে বর্ণিত হয়েছে। তারাশঙ্কর শৈশবেই যেন প্রত্যক্ষ করেছেন সেকালের অবসান এবং একালের আবির্ভাব। তবে পল্লীজীবনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক ভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যথার্থ কালান্তরের সূচনা করেছে। বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন। পরিবর্তনের বাস্তবভিত্তি তিনি অস্বীকার করেন না।

কালান্তরকে নানা দিক থেকে তারাশঙ্কর দেখেছেন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে। বিশ শতকের সূচনা থেকেই জমির মালিকানা ক্রমশ ছোট ছোট জমিদারদের হাতে এসেছে। বীরভূমের জমিদারদের সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই জমিদার বলতে লাভপুর এবং তার কাছাকাছি গ্রামের জমিদারদের কথাই তিনি বেশি বলেন। অধিকাংশ জমিদারির আয়তন ক্ষুদ্র এবং আয়ও যৎসামান্য। দশ হাজার টাকা বছরে যাঁদের আয় তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। কিন্তু চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো বা এক হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদারের সংখ্যাই বেশি। 'কালিন্দী'র ইন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার থেকে দু হাজার হবে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের জমিদারির কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়বে —সাত আনায় তাদের আয় হাজার চারেক টাকা। অস্থাবর সেসের জন্য দিতে হবে মাত্র একশো বারো টাকা পাঁচ আনা তিন পাই। কিন্তু তাও এস্টেটে মজুত নেই। তখন "সাত-আনি বাড়ুজ্জেদের বাড়িখানার অবস্থা হইয়াছে নির্বাপিত শিখা প্রদীপের মত। প্রদীপের ধাতুময় অঙ্গের মত তাহার অঙ্গরাগের দীপ্তি এক বিন্দু কমে নাই, কিন্তু তাহাতে আলো জ্বলে না।" পুরনো প্রথারক্ষা তথা সেকালের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য মহাজনের কাছে জমিদার ধার করছে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করছে। আসলে বাইরে কেতা রক্ষা করতে হয়, তাই নায়েব গোমস্তা পাইক লাঠিয়াল। অতি ক্ষুদ্র জমিদার শিবনাথেরও "পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে; পালকি-বহনের বেহারা চাকরান জমি ভোগ করে, মহলে পাইকদের জমি দেওয়া আছে, সদরে কাজ করিবার জন্যও চারজন পাইকের

কায়েমী বন্দোবস্ত ; নাপিত, বৃত্তিভোগী পুরোহিত, দেবোত্তরের পূজক, এমন কি গয়া শ্রীক্ষেত্র কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থলের পাণ্ডারা পর্যন্ত জমি ভোগ করেন। গৃহদেবতার ফুল যোগাইবার ভারও একজনকে দেওয়া আছে, চাকরান ভোগী বাদ্যকরকে নিত্য সকাল সন্ধ্যায় 'টেকরা' বাজাইতে হয়, সেজন্য মালিককে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।" অথচ শিবনাথকে বিয়ের সময়ে ঋণ গ্রহণ করে রায়বেশে ঢুলীর বাজনা ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ নাচ তরজা আলো চতুর্দোলা শোভাযাত্রার আয়োজন করতেই হবে— বাপপিতামহের ধারা অক্ষুন্ন রাখার দায়ে। এরকম অবস্থায় জমিদারকে খাজনা আদায়ের জন্য নির্বিবেক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রজাশোষণের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনে জমিদার এবং তাঁদের নায়েব গোমস্তা সদা তৎপর। শিবনাথের পিসিমা নায়েবকে নির্দেশ দেন—"খাজনা আদায় করতেই হবে। ধরে এনে বসিয়ে রেখে খাজনা আদায় কর। ফসল থাকলে আটক কর ; খাজনা না দিলে ফসল তুলতে কি বেচতে দিও না।" অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকের দুরবস্থার কথা জেনেও খাজনা মাপ হয়নি, "বরং শাসনসূত্রে কঠোর আকর্ষণে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, স্পর্শমাত্রেই যেন টঙ্কার দিয়া উঠে।" পৌষ-কিস্তিতে যে টাকা কম আদায় হয়েছিল, চৈত্র-কিস্তিতে সে টাকা পূরণ হল।

নতুন কালের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হলেও জমিদারের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। শিবনাথ সমাজসেবার আদর্শ গ্রহণ করেছে, প্রুধো পড়ে জমিদারের শোষণের স্বরূপ জেনেছে (সেজন্য অবশ্য প্রুধো পড়বার দরকার ছিল না), কিন্তু প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট—জানিয়াও ক্রমশ সে বিচলিত হইয়া পড়িতেছে, সম্পত্তির মমতায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। প্রজাদের অনুরোধ, পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, এই দুইটা কথা মনে পড়িলে চোখে জল আসে।" একে যদি স্ববিরোধ বলতে চাই তাহলে তারাশঙ্করের সমাজ ভাবনার মধ্যে তার সন্ধান মিলবে। তিনি বারবার যে দ্বন্দ্বের কথা বলেন, শেষ পর্যন্ত তার অবসান ঘটে অন্য ভাবে।

আমরা আগেই দেখেছি, '১৯০৫ নয়, ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পল্লী বাঙলার সঙ্গে বাইরের জগতের সংযোগ সাধন করে—প্রথাবদ্ধ জীবন ধারায় এই প্রথম বড় রকমের সংকট দেখা গেল। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাঙালির ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের সময় থেকে একদিকে সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে সর্বক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিতি, পল্লীগ্রামেও সেকালের অবসান ঘটিয়েছে। এখানে

'সেকাল' বলতে তারাশঙ্করের মনে যে-ছবি জেগেছে তার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, "দেশেও তখন [সেকাল] প্রাচুর্য ছিল। ক্ষেত্র ছিল উর্বর, বর্ষাও তখন এখন থেকে প্রবল ছিল, মাঠে পুকুরগুলিও তখন এখনকার মত এমনভাবে মাঠের সমান হয়ে মজে যায়নি, ফসল যথেষ্ট হত। গোয়ালে ভালো ভালো গাই ছিল, দুধও হত প্রচুর, পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত, অভাব দেশে ছিল না; অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চলে যেত।" দেশে অভাব ছিল না, একথা সত্য হতে পারে না। তখনও অভাব ছিল, বা অভাবী মানুষ ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বা বিশ শতকের সূচনায় জিনিসপত্রের দাম ছিল তুলনামূলকভাবে কম, হয়তো ছোট জমিদারদের 'কেতা' রক্ষায় তখনও অসুবিধা হত না। তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, তাঁর যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স (অর্থাৎ ১৯১০-১২) তখন সপ্তাহে দুদিন হাটে তরকারির খরচা ছিল ছ'আনা হিসেবে বারো আনা। মহাযুদ্ধের পরে খরচটা বাড়ল—বারো আনা থেকে পাঁচ সিকেতে পৌঁছল। 'গণদেবতা' উপন্যাসে ১৯২২ সালে গ্রামের মানুষের দুরবস্থা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে হয়েছিল জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁওয়া—"দুঃখ দুর্দশা সবকালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত দুর্দশা আর কখন হয় নাই।" অবশ্য দ্বারকা চৌধুরীকে ঠিক সাধারণ মানুষ বলা যায় না—এক পুরুষ আগে জমিদার ছিলেন, এখন জমিদারি নেই—চাষবাস করেন বলে চাষীই বলতে হয়। একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দ্বারকা চৌধুরীর মতো আত্মপ্রসন্ন উদারমনা মানুষকেও বিচলিত করেছে—"একালের সঙ্গে যে কিছুতেই আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। রীতি-নীতি, মতি-গতি, আচার-ধর্ম সব পাল্টাইয়া গেল। তাহারই পুরানো পাকা বাড়িটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুর-ঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়িটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনি ভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে। লোক আর পরকাল মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, প্রবীনকে সমীহ করে না, রাজা-জমিদার-মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই; অভক্ষ্যভক্ষণেও দ্বিধা নাই। পুরোহিতের ছেলে সাহেবী ফ্যাসানে চুল ছাঁটিয়া টিকি কাটিয়া কি না করিতেছে? কঙ্কনার চাটুজ্যেদের ছেলে চামড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের কুমোর পলাইয়াছে, কামার ব্যবসা তুলিয়া দিল, বায়েন ঢাক বাজানো ছাড়িল; ডোমে আর তালপাতা-বাঁশ লইয়া ডোম-বৃত্তি দেয় না, নাপিত আর ধান লইয়া ক্ষৌরি

করে না, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে চর্বি, নুনের ভিতর মধ্যে মধ্যে হাড়ও বাহির হয়। সকলের চেয়ে খারাপ মানুষের সঙ্গে মানুষের অমিল।" (পঞ্চগ্রাম)। বর্ণ এবং বৃত্তিগত প্রাচীন স্থিতাবস্থা রক্ষা করা যাচ্ছে না, ফলে চারদিকে 'যায় যায়' রব উঠেছে।

লক্ষণীয় যে, শুধু প্রবীন দ্বারকা চৌধুরী নয়, তরুণ দেবু ঘোষও গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষপাতী—"সে প্রাণপনে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।" তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডীমণ্ডপে পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে শাস্তি দেবার জন্য জগনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ যখন অবলীলায় ভোগপূজার থালা তুলে নিয়ে চলে গেল, তখন গ্রামের লোক বলেছে—"এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি কর! তবে বুঝছ কি না—উ হবে না! কি সমাজ সমাজ করছ? সমাজ কই?" যে চণ্ডীমণ্ডপকে দেবু গ্রামের হৃৎপিণ্ড তথা সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল মনে করতো, তা আজ ভেঙে পড়ছে। অথচ সেখানে তখনও বিশ্বনাথের কথা মতো কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠেনি। যতীনের একবার মনে হয়েছে, "পল্লীর কিন্তু সেই একই রূপ! অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম। সমাজ-গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একই স্থানে অনন্ত পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে।" কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, "সে কি কোনদিন নড়িবে না? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন শুরু হইয়াছে। সর্বত্র নববিধানের সাড়া উঠিয়াছে। এদেশের পল্লীতে কি জীর্ণ ছবির পুরাতনের পরিবর্তন হইবে না?"

তারাশঙ্করও পরিবর্তন চেয়েছেন, পরিবর্তন অনিবার্য বিবেচনা করেছেন। তবে পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে সব সময় খুব গভীরে প্রবেশ করে না। অথচ লাভপুরের সেই দরিদ্র সন্তান, যিনি এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠিতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লাখনির মালিক হলেন এবং পরে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক সেই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্ষুদ্র জমিদারদের বিরোধ বাধলো, তারাশঙ্করের কাজে তা কখনও 'কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা' বলে মনে হয়। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জমিদার ও মহাজনের বিরোধ থাকলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেই জমিদার ও শিল্পপতির বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে। শিল্প বলতে

রাঢ় বাঙলায় প্রধান হল কয়লাখনি। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শুনতে পাই, যুদ্ধকালে "কয়লার বাজার নাকি হু হু করিয়া চড়িয়া যাইবে, প্রচুর ধন, অতুল ঐশ্বর্য বাড়িঘর ভরিয়া উঠিবে।" অবশ্য বঙ্গীয় শিল্পবিপ্লবের চিত্র সেভাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাধান্য পায় না। 'কালিন্দী'র "চরের উপর বয়লারের সিটি বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের আলোকে লাল সুরকির পথ, সুদীর্ঘ চিমনি, নূতন মিল হাউস, কুলিব্যারাকের বাড়ি ঘর লইয়া চরখানা একটি নগরের মত ঝলমল করিতেছে।" কিন্তু অনেক দূরে থেকে দেখা এই পরিবর্তনের চিত্র। কলের মালিক অন্যায় করেছে সত্য, তবু কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে দীন-দরিদ্রের মজুরির সুবিধা হয়েছে, চারদিকের পথঘাটের উন্নতি হয়েছে, আখের চাষের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিরোধ যা ঘটেছে তা জমিদারের সঙ্গে কলের মালিকের প্রতিপত্তি নিয়ে।

অহীন্দ্র কালিন্দীর চরের রূপান্তরে আহত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কলকার-খানার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছে, "চরের উপর কর্মকোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নাই। শেডটার লৌহকঙ্কাল তৈয়ারী ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার উপরে করোগেটেড শীট পিটানো হইতেছে। বোল্টগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে। আকাশমুখী সুদীর্ঘ চিমনিটার আকার এইবার সরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ আবার নূতন মাচান বাঁধা হইতেছে।....একটা লরির এঞ্জিন কোথায় দুর্দান্ত ভাবে গর্জন করিতেছে, বোধহয় কোন দুরন্ত বাধা ঠেলিয়া চলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ স্টীমে বয়লারটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ সমস্তকে একটি ক্ষীণ আচ্ছাদনের মত আবরণে আবৃত করিয়া মানুষের কোলাহল কলরবের উচ্চ গুঞ্জনরোল অবিরাম গুঞ্জিত হইয়া চলিয়াছে। অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়ানো এই অর্ধনির্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।" বাঙলার পল্লীজীবনে অবশ্য কলকারখানার প্রবেশ খুব দ্রুত গতিতে বা ব্যাপকভাবে ঘটেনি। কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজে অস্থিতি দেখা দিয়েছে। জমিদার নিজেই অনেক সময় কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছেন। সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সময়ে পুরনো জমিদার পরিবার ইচ্ছা থাকলেও অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেন না—অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই নতুন কালকে স্বীকার করে নেন। এই ভাবে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সমঝোতা

গড়ে ওঠে—একাল ও সেকালের দ্বন্দ্বের সমাধান নিশ্চয় নয়, কিন্তু একালের দাবি হয় প্রবলতর। 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় সুরেশ্বরের মনে প্রশ্ন জাগে, "মানুষ কাল তৈরি করে, না কাল মানুষ তৈরি করে? হয়তো বা দুটোই সত্য। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে বীরেশ্বর রত্নেশ্বর দেবেশ্বর রায়দের মত জমিদার অনেক ছিল। এঁদের থেকে উন্নত আর বেশি কেউ ছিল না। থাকবার মধ্যে এক আধটা ঠাকুরবাড়ির মত বাড়ি—মানুষের মধ্যে মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষ ছিলেন জমিদারদের মধ্যে।" বীরেশ্বর-রত্নেশ্বর যে ভাবে জমিদারি চালিয়েছেন, দেবেশ্বরের আমলে অর্থাৎ বিশ শতকের সূচনায় তার পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় জমিদার সভা অর্থাৎ ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন খুবই শক্তিশালী ছিল. পরে জমিদারদের সঙ্গে রাজনীতিক ও সংবাদপত্রসেবীরা হাত মিলিয়েছেন, জন্ম নিয়েছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এর পরে তার স্থান নিয়েছে দেশি চেম্বার্স অফ কমার্সগুলি। শুধু ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের উত্থান হয়নি, সেই সঙ্গে উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার ডাক্তার জার্নালিস্ট প্রোফেসরের কাল শুরু হয়েছে। জমিদার পরিবারেও সকলে না হলেও কেউ কেউ লেখাপড়া শিখেছেন, কলকাতায় নতুন জীবিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের কয়লাখনি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল ("১৯১৯ সালে কয়লা-ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের আওতায় কয়লার ব্যবসায় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।") তাই তাঁর উপন্যাসে নতুন মূল্যবোধ, যাকে তিনি মন থেকে অনেক সময় মেনে নিতে পারেননি, তার কথা বলতে গিয়ে কয়লাখনির মালিকের কথা বলেন। প্রথম যুগে কয়লাখনি স্থাপনের মধ্যে কিছুটা ফাটকাবাজি কাজ করেছে—হঠাৎ যেন গুপ্তধনের সন্ধানলাভ। 'কীর্তিহাটের কড়চা'য় দেবেশ্বর রায় একসময় কয়লাখনির জন্যে জমি কেনেন—"সেই কয়লাখনির জন্য কেনা জায়গাগুলি পড়েই ছিল, অধিকাংশই যার অযোগ্য মনে হয়েছিল, তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল উৎকৃষ্ট কয়লার জমি। জায়গাটা বরাকরে। জমিদার কাশিমবাজারের রাজএস্টেট। তখনও রাণী স্বর্ণময়ীর আমল। দেবেশ্বর রায় আরও জায়গা সেখানে বন্দোবস্ত নিয়ে দস্তুরমত ক্লাইভ স্ট্রীটে আপিস খুলে বসলেন।....দেখতে দেখতে বছর তিনেকের মধ্যে রয় এ্যান্ড চক্রবর্তী কোম্পানী কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।" দেবেশ্বর রায় কয়লাখনির ব্যবসা করলেও নীলরক্ত তখনও লাল হয়ে যায়নি, ফলে সেতার এসরাজ নিয়ে গান গাওয়া, সংবাদপত্র প্রকাশ ও সমকালের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—সব কিছুর মধ্যে

একধরণের স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মেলে। কিন্তু দেবেশ্বরের ছেলে যজ্ঞেশ্বর যখন কয়লার ব্যবসা করেছে, তখন তার মধ্যে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে—সে মস্ত বড় খনি মালিক, কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটার,—কোনো আদর্শবাদের ধার ধারে না।

আগেরকার দিনের জমিদারেরাও সকলে আদর্শবাদী ছিলেন না, প্রজার উপর অত্যাচার শোষণ তাঁরা করেছেন, তবু সমাজের সঙ্গে তাঁদের একটা যোগ ছিল। সেই সঙ্গে ছিল একধরণের উদারতা, তা কখনও মহত্ত্বের পরিচয়বাহী। তারাশঙ্করের উপন্যাসধারায় শ্রেষ্ঠ জমিদার রক্ষেশ্বর রায়—"পনের বছর অন্তর বৃদ্ধি পাবার হকদার ছিল জমিদারেরা। তার কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ফসলের দাম বাড়লেই জমিদার তাঁর অংশ বাবদ খাজনা বাড়াতেন। সারাটা জীবনভর এ কর্তব্যকর্ম ভোলেননি। এবং কোন সময়েই আপসে করেননি, আদালতে গিয়ে নালিশ করে লড়ে পাওনা আদায় করেছেন অথবা প্রজার সঙ্গে আদালত সাক্ষী রেখে সোলেনামা করেছেন। এছাড়া পতিত পুকুর কাটিয়েছেন। নদীর ধারের গ্রামে বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ তৈরি করিয়েছেন। সুতরাং জমির উন্নতি করেছেন বলেও খাজনা বৃদ্ধিতে তাঁর একটা দাবী ছিল। তিনটে এনট্রান্স স্কুল, দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী করেছিলেন, মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলও করে গেছেন দুটো। মাইনর স্কুল করেছেন আরও কয়েকটা। নিঃসন্দেহে কীর্তিমান পুরুষ। কীর্তিহাট থেকে তমলুক পর্যন্ত কাঁচা পথটা পাকা করেছিলেন; বহু দরিদ্রকে দান করেছেন; বহু বুদ্ধিমান ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে বৃত্তি দিতেন। এই জানবাজারের বাড়িতে এই ওপাশের একতলা ঘরগুলোতে তারা থাকত; তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা ছিল, তারা খেয়ে কলেজ যেত।"

সব জমিদার অবশ্য রক্ষেশ্বর রায় ছিলেন না, সব কোলিয়ারি মালিকও যজ্ঞেশ্বর রায় নন। তবু তারাশঙ্করের চোখে "রায়বাহাদুর রক্ষেশ্বর রায় কীর্তিতে কীর্তিমান, আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় কীর্তিভ্রষ্ট। রায়বাহাদুর সম্পত্তি বাড়িয়ে গেছেন, বাপের আমলের আয়কে চারগুণ করেছেন—আর নাতি যজ্ঞেশ্বর রায় দশের বাঁদিকের একটাকেই মুছে দিয়েছেন। অবশেষে স্ত্রীর পিতৃদত্ত বরানগরের এই পুরনো বাড়িটায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন।" কিন্তু জমিদারি প্রথাই যেকালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তখন যজ্ঞেশ্বর কি ভাবে ব্যতিক্রম হবেন। রক্ষেশ্বরের প্রতি তারাশঙ্করের পক্ষপাত গোপন থাকেনি, তবে যজ্ঞেশ্বরের প্রতিও তিনি

অবিচার করতে চাননি।—"বিচিত্র যজ্ঞেশ্বর রায়। মহিমান্বিত রায়বংশের কফিনে পোরা মমি বরানগরেরর গঙ্গার ধারে একখানা বড় ফাটল ধরা বাড়িতে থাকতেন তখন। বাড়িখানা সত্যিই কফিনের মত, আর জ্যাঠামশাই রায়বংশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মমি। ইনসলভেন্ট, প্যারালিটিক, দিলদরিয়া লোক, জেদী, উদার, বদমেজাজী, অতিভদ্র, পরস্বাপহারী, দাতা—এক সঙ্গে সব। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা মানুষটা খাটজুড়ে পড়েছিলেন।" যজ্ঞেশ্বরের উত্থান-পতনের সঙ্গে যেন রায়বাড়ির উত্থান-পতন জড়িয়ে আছে—"গড়েছেন, ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন, আবার ভেঙেছেন।" কিন্তু কালের গতিকে রোধ করার সামর্থ্য তাঁর নেই। জমিদারিপ্রথার অবলুপ্তি যেমন ঘটেছে কালের নিয়মে, তেমনি "নতুন কালের মানুষেরা স্পষ্ট বলছে—পুরনো কিছু চলবে না।" তারাশঙ্কর নতুন কালকে স্বীকার করে নিয়েছেন—ভারতবর্ষের কালান্তরের ইতিহাস লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর উপন্যাসের গঠন বা শিল্পরূপ নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে, এমন কি তাঁর জীবনদর্শন তথা সমাজ দর্শনও সকলের মনঃপূত না হতে পারে, কিন্তু তিনি একালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক সে কথা মানতে বাধা নেই—সমাজগতির ধারা অনুধাবনের সচেতন প্রয়াসের জন্যই তিনি শ্রদ্ধেয় এবং স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। □

সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লেখক তারাশঙ্কর

সরোজমোহন মিত্র

তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যের এবং পশ্চিমবঙ্গের এক অসাধারণ কৃতী পুরুষ। তিনি ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। তার পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে কানপুরে এবং আসামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৬ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে চীনে গমন করেন। ১৯৫৭ সালে তাসখন্দে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আফ্রো এশিয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন, এই বছরেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করেন, ১৯৬২ সালে তিনি প্রথমে পদ্মশ্রী এবং পরে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন, ১৯৬৭ সালে নাগপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এবছর তাঁর জীবনের একটি সফলতম বছর। এ বছরে তিনি জ্ঞানপিঠ পুরস্কার লাভ করেন, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। যাদবপুর, কলিকাতা ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ১৯৭০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তারাশঙ্করের পূর্বে এবং পরে এত সম্মানে আর কেউ সম্মানিত হতে পারেন নি।

এবছর সেই কীর্তিমান মহাপুরুষের জন্মশতবৎসর। তাঁর জন্ম হয়েছিল বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। এই দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি ৬৮ উপন্যাস, ৩৭ গল্পগ্রন্থ,

৪ আত্মজীবন, ও প্রবন্ধ সংকলন, এবং একটি করে কাব্যগ্রন্থ, ভ্রমণ এবং নাটক রচনা করেছেন। এই বিপুল সৃষ্টিও বাঙলা সাহিত্যের এক ঈর্ষণীয় গৌরব। তবু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাহিত্য জগতে তারাশঙ্করের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। তাঁর যখন ২৮ বছর বয়স তখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ৩৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়। যদি অন্যদের ন্যায় তাঁর আরও কম বয়সে সাহিত্য জীবন শুরু হোত তাহলে আমরা তাঁর কাছ থেকে হয়তো আরও বেশী সৃষ্টি লাভ করতাম।

সাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রবেশ শরৎচন্দ্রের পথ ধরে। তিনি তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, "শরৎচন্দ্রকে অক্ষম ভাবে অনুকরণ করেছিলাম।" শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্করের লিখন রীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই শরৎচন্দ্রের প্রতি তারাশঙ্করের প্রবণতা স্পষ্ট হবে। আমাদের আলোচনা স্বতন্ত্র। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের অনেক মিল আছে। শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে গল্প-রসের প্রাধান্য দিতেন, তারাশঙ্করও এই গল্পের উপরই জোর দিয়েছেন। "মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প।" দ্বিতীয়ত শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন আমার গল্পের নব্বই ভাগ সত্য বাকী দশ ভাগ নিয়েছি কল্পনা করে। তারাশঙ্করও অনেক ক্ষেত্রেই বলতে পারতেন, তার গল্প উপন্যাসের ঘটনার 'পনেরো আনা সত্য।' তৃতীয়ত, শরৎচন্দ্রের মতই তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যে এসেছিলেন পুঁথিগত বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরে। গ্রাম বাঙলার মানুষের সম্পর্কে এমন নিবিড় এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্করের মত আর কারুর ছিল না বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পথের পাঁচালি, আরণ্যক এবং অজস্র গল্প লিখেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে তার অভিজ্ঞতাকে অমর করে তুলেছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কর যেমন আজীবন গ্রামীন জনজীবনের সঙ্গে আষ্টিষ্ট ছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। সেজন্য সজনীকান্ত দাস যখন তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলেন, "এই লোকটি বাঙলা সাহিত্যে অনেক কথা—এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা—বলতে এসেছে। এর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।" তখন মনে হয় সবচেয়ে খাঁটি কথা।

তারাশঙ্করের জীবনের দিকে তাকালে আমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। এক ছোটো জমিদার বংশে তার জন্ম। সেই জমিদারিরও তখন

ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। অন্যদিকে তখন আবির্ভাব ঘটছে ধনতন্ত্রের। জমিদাররাই তখনো গ্রাম্য সমাজে উচ্চতর আসনে। এরা ব্রাহ্মণ। রথীপদবাচ্য। "কিছু জমিদার, কিছু জমি, পুকুর, বাগানের মালিক সকলেই, সকলেই মহামানী দুর্যোধনের মতো মানী। সকলেরই পণ—বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" এদের বড় পুঁজি প্রাচীন কালের শিক্ষা ও আভিজাত্য। অন্যদিকে ছিল এমন পরিবার সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায় যাদের প্রচুর অর্থ। এছাড়াও ছিল উকিল চাকুরে। সকলেই প্রতিষ্ঠার জন্য যুধ্যমান। এই প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব জর্জর লাভপুরকে তারাশঙ্কর নির্মম অভিজ্ঞতায় ভালোভাবেই জানতেন।

এই গ্রাম সম্পর্কে তিনি-পরেও লিখেছেন, "আমাদের গ্রামটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম—ধনসম্পদের, ভূসম্পত্তির অহংকারে অহংকৃত ছিল আমাদের গ্রাম। হাল ফ্যাসানের চতুরঙ্গবাহিনীর অভিযান দিকে দিকে। আগেকার কালের ব্রাহ্মণ্য দৃপ্ততা, নবাবি আমলের সামন্ততান্ত্রিক বনেদিয়ানার কালের সীমানা, কুইকমার্চের পদক্ষেপে অতিক্রম করে ইংরেজি আমলের অ্যারিস্টোক্রেসির গাম্ভীর্যে থমথম করছে, আবার কয়লাকুঠির মালিকানির ও কয়লা-ব্যবসার মধ্যস্বত্বাধিকারীর অর্থাৎ middle man-এর সাফল্যে কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত; অর্থাৎ আভিজাত্য গৌরব বংশগত এবং ব্যক্তিগত জীবনসাধনার সিদ্ধি লক্ষ্মীর কৃপাসাপেক্ষ; এবং লক্ষ্মীর ঘরের চাবি কয়লার ব্যবসাজগতে বিশেষ স্থান হেতু তাঁদের করতলগত।" (পৃ ২৪৪) "মাত্র আট বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তারপর থেকে তাঁকে সাংসারিক দায় দায়িত্বের সঙ্গে, চাষ-বাস, প্রজার সঙ্গে লেনদেন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

তার মধ্যেও গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারাশঙ্করের মধ্যে কবি-চেতনা, নাটক-থিয়েটারেরও প্রবণতা গড়ে ওঠে। তারাশঙ্করের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের ঢেউ তারাশঙ্করের গ্রামেও এসে লেগেছিল। তিনি লিখেছেন," "সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এসে সবাই উপনীত হল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে, 'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ করে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন। সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, অন্তরকে করব শুভ্র, করব নির্মল, সুপরিচ্ছন্ন, সুপবিত্র।" (আমার কালের কথা)। তারাশঙ্করের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর মা। শৈশবেই দীক্ষিত

হলেন দেশাত্মবোধের মন্ত্রে। ১৯১১ সালে অর্থাৎ তারাশঙ্করের বয়স যখন তের বছর তখন বঙ্গ ভঙ্গ রোধে তার সমাপ্তি ঘটে। তারপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারও পরে অসহযোগ আন্দোলনেই প্রথম তারাশঙ্করের সক্রিয়তা দেখা যায়। তিনি লিখেছেন "১৯২১ সালে মহাত্মাজির অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে।" (আমার সাহিত্য জীবন, পৃ ২৬)। অবশ্য মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদ কি সেটা তিনি বিস্তারিত করেন নি। তারও আগে তারাশঙ্করের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলের বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী তাঁর জীবনক্ষেত্রে দেশপ্রেমের বহ্নিকণা জাগিয়েছিলেন। সে বহ্নি পরম পবিত্র হলেও তিনি ঐ দলের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসার সুযোগ পাননি। দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশাও তাঁর জীবনে বড়ো ছিল না। ১৯১৫-১৬ সালে দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম। তবু তারাশঙ্করকেও কিছুদিন ধরে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কাটাতে হল। তখন তার বোনের বিবাহ উপলক্ষে নিজেরও বিবাহ হয়ে গেল। তারাশঙ্করের শ্বশুরকুল ছিলেন কয়লা ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তারাশঙ্করকে তাতে জড়িত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তারাশঙ্কর সেদিকে বেশি আকর্ষণ বোধ করেন নি।

তারপরে এল উনিশশো একুশ। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো তাঁর জীবনক্ষেত্রেও যুগান্তর ঘটল। তার আগে তিনি সাহিত্যসাধনা নিয়ে খুব চেষ্টা করছিলেন। তাতে একের পর এক ব্যর্থতায় এক সময় ঠিক করলেন, সাহিত্য সাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে শান্ত গৃহস্থের মতো ধানচালের হিসেব করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন এবং কংগ্রেসের কাজের মধ্যদিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেবেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নানা গঠনমূলক কাজে। "সকালে বাইসিকলে নিয়ে বের হই—গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ-ঘাট-নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই, আঁকা বাঁকা নালাকে সোজা করে কাটাই, ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি।" ১৯২৪/২৫ সালে তাঁদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারির আক্রমণ হয়েছিল তাতে সেবার কাজে একাদিক্রমে ছ-মাস ৩০/৪০ গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রাম্য ভদ্রজনের সমাজে, চাষির গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায় দেশের মানুষকে তিনি নিবিড়ভাবে জেনেছেন।

সেই জানা কেবল বৈষয়িক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে নয়। দেনা-পাওনা বা মামলা মোকদ্দমার মধ্যদিয়ে নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় হিসেবেও তিনি তাদের জেনেছেন। আত্মার আত্মীয় হিসেবেই জেনেছেন।

গ্রামের অবস্থা বিচিত্ররূপে তিনি দেখেছেন। জেনেছেন প্রজার উপর জমিদারের নিপীড়ন, প্রজার কাছে খাজনা আদায়, সুদ, নেওয়া, খাজনা বৃদ্ধি করা, কাছারিতে মহাজন বসিয়ে রেখে তার কাছ থেকে প্রজাকে ঋণ নিতে বাধ্য করা, সুদ দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। সেখানে তাঁর হয়েছে নির্মম অভিজ্ঞতা—"দেখেছি এক ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল, অবীরা বিধবাটির হিতার্থী সেজে তার হাতে একশো টাকা দিয়ে হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি লিখে নিলেন। কথা থাকল সম্পত্তি দখল পেলে তাকে আরও টাকা দেবেন, কিছু জমিও দেবেন।....দখল হল। বিধবা এল। রিক্ত হস্তে ফিরে গেল।" এর সঙ্গে ছিল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ার অভিজ্ঞতা, "রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু —শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মতো সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারী ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে। চিতা জ্বালাতে হবে। শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি। একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসঙ্গে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।" আমরা দেখলাম তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল, শিক্ষাও ছিল, ভবিষ্যতের সংকল্পও ছিল।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি অন্তরীণ হন আর ১৯৩০ সালে জেলে যান। তার আগে শৈশবেই ১৯১১/১২ সালেই বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র আর কিশোর ক্ষুদিরামের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও ১৯৩১ সালের প্রথমেই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ থেকে মুক্তি নিলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁর তিক্ত। "যৌবনের কিছু আগেই জীবনের সব কামনা একত্রীভূত হয়ে পরাধীনতার

অবসান করে দেশকে স্বাধীন করবার যে জীবনযজ্ঞ তাতেই আহুতি দিয়াছিলাম, সে যজ্ঞের আগুন নিয়ে নিজের বুকে জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম। আবার জীবনের সব উপাদান সমিধ হয়ে ওই হোমবহ্নিকেই প্রজ্বলিত রেখেছিল আমার মধ্যে। ১৯১৭ সনে অন্তরীণ হওয়া থেকে ১৯৩০ সনে জেলে যাওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে ও ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতাকামী আত্মত্যাগী সৈনিকের মধ্যে দলগত বিরোধে যে মর্মান্তিক সংঘাত দেখেছিলাম, তাতে বেদনা হয়েছিল যেমন মর্মান্তিক, রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও হয়েছিল তেমনি বা ততোধিক।" (আমার কালের কথা)। স্থির করেছিলেন "আমি সাহিত্যের পথে এই যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।"

১৯৩১ থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে তাঁর এই মনোভাবকেই প্রকাশ করেছেন। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন : সেখানে জমিদারের অত্যাচার, শোষণের কথা আছে। কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতির কথা আছে। শ্রেণী শোষণের কথা আছে, বিপ্লবের কথাও আছে। জমিদারের অত্যাচারে গোষ্ঠ গ্রাম ত্যাগ করেছে। যাবার আগে সে বলেছে "কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল, পেট দুটো যেখানে খাটাবো সেইখানেই ভাত, এখানেও খাটা, বাইরেও খাটা। ঘর! গাছতলা তো আছে।" সে বলে, "ভগবান নেই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমায় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?" এই উপন্যাসে শ্রমিকের কথা আছে, ট্রেড ইউনিয়নের কথা আছে, বিপ্লবের কথা আছে। তবে বিপ্লবের নেতৃত্ব নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে। উপন্যাসের শেষ হল ব্যর্থ বিপ্লবে। কলের শ্রমিক ধর্মঘট। পুলিশের গুলিতে গোষ্ঠ নিহত। এই বইখানি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বাঙলার যৌবনশক্তির প্রতীক, নবযুগের অগ্রদূত সুভাষচন্দ্রের নামে।

ধাত্রীদেবতা তারাশঙ্করের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ জমিদারপুত্র হয়েও মায়ের প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে এবং সেবা ধর্ম পালনের মধ্যদিয়ে দেশপ্রীতির পরিচয় দেয়। জনগণের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়, মমতার সম্পর্ক। দেশকে সে ভালবাসে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে চায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের পথকে সে সমর্থন করে না। তাকে তার মনে হয় 'নিরন্ধ্র অন্ধকার পথ' এবং 'স্বাধীনতার

লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত পথ।' শিবনাথ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করে। জনগণের সঙ্গে মিশে শিবনাথের ধারণা হয়েছে 'স্বাধীনতা তাহাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য শব্দ।' সেজন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা সাহায্য করবার উপযুক্ত প্রেরণা লাভ করেনি। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে শিবনাথের যোগ ছিল। সেও বিশ্বাস করত "ইংরেজ তাড়ানোর নামই স্বাধীনতা নয়।··· দেশের সত্যকার স্বাধীনতা ও থেকে পৃথক।" স্বাধীনতা বলতে সেও বিশ্বাস করত "এস্টাবলিশমেণ্ট অব এ গবর্ণমেণ্ট অব দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপল, নট ফর দি সেক অব দি পিপ্‌লে। অনুগ্রহ নয়, তেত্রিশ কোটির দাবির বস্তু গ্রহণ করতে ছেষট্টি কোটি হাত এগিয়ে আসা চাই।" শিবনাথ বিশ্বাস করত কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণেই স্বাধীনতা নয়, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। তাই সে গ্রামে চরকা কাটা ও তাঁতের প্রচলনে আগ্রহী হয়েছে। চাষীদের সংঘবদ্ধ অহিংস গণআন্দোলন সে প্রত্যাশা করেছে।

১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব এবং সাইক্লোনের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন তার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'গণদেবতা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিশ্বগ্রাসী তাণ্ডবের মধ্যে যে বিশ্বব্যাপী গণ-চেতনা গড়ে উঠেছিল তাকেই বোধ হয় লক্ষ্য করে তিনি উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'গণদেবতা'। কারণ উপন্যাসের মধ্যে এই নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। এককালের "ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, জেলখাটা রাজনীতিবিদ রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য করতে এসেও তাঁর রাজনীতিবোধ বিস্মৃত হন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশ শো ষোল সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আর দেরী হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম, সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে।" (আমার সাহিত্য জীবন, পৃ ৬৯) অবশ্য এই উপলব্ধি তিনি মার্কসের ক্যাপিট্যাল বা তাঁর লেখা কোন বই পড়ে নয়, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি। মার্কসবাদের বস্তুবাদ সর্বস্বতাকেই তিনি মানতে পারেন নি।

সেজন্য তারাশঙ্কর গ্রামের এক সঠিক চিত্র নিয়ে উপন্যাসটা আরম্ভ করলেও তাঁকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর 'পাষাণপুরী'

উপন্যাসের অন্যতম নায়ক চোখে দেখা কালী কর্মকারের আদলে এই উপন্যাসে অনিরুদ্ধ কর্মকারকে সৃষ্টি করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তার সংগ্রামী চেতনা বড় হয়ে ওঠে নি। 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাস লেখার সময়েই তার স্নেহের মেয়ে বুলু মারা যাওয়ার পরে তিনি প্রায়ই শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন। সেই আদলেই এই উপন্যাসে দেবু চরিত্রকেই প্রধান করে তুলেছেন। একদিকে শোষণ, শাসন, অনাচার, অত্যাচার অন্যদিকে প্রতিবাদের সোচ্চার ঘোষণা, দেশগঠনের আদর্শ এই সংঘাতকে কেন্দ্র করে 'গণদেবতা' গণমানুষের বিক্ষোভ বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের শেষে দেবু শুনতে পেল মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার ঢাকের শব্দ। ঠাকুর রথে চড়েছে। রথ হয়তো চলতে শুরু করেছে। এই কটি লাইনের মধ্যেই তারাশঙ্কর ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। কঠোর বাস্তবতা ভাবালুতার ফানুসে বিলীন হয়ে গেল।

তারাশঙ্করের গোটা জীবিতকালটা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সঙ্কটের কাল। তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য হল তিনি সব সময়েই এই সব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন। বিশ এবং তিরিশের দশকে তিনি যেমন অসহযোগ এবং গান্ধীবাদী রাজনীতির আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে যখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে উঠেছিল তখন তিনি তার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলনে তিনি সভাপতি হিসেবে উদ্দীপক ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, "আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েকমাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকামট্যাক্স দিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সংঘ।" ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সংঘের তৃতীয় সম্মেলনেও তিনি ছিলেন সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার

পরেও প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছেন 'গণদেবতা' এবং 'মন্বন্তর'। 'গণদেবতা' উপন্যাসে বিশ্বনাথ ছিল সাম্যবাদে বিশ্বাসী। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে নায়ক কানাই সাম্যবাদী, নায়িকা নীলা ও তার ভাই নেপী সাম্যবাদী। মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের সেবাকর্মকে তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাস ছাড়াও এই সময়কার গল্পেও 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে তিনি যে সমাজ চেতনার কথা বলেছিলেন তা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। যদিও সেখানেও বাস্তববাদের চেয়ে ভাবাদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে। গান্ধীবাদের আদর্শের ফলেই হয়ত তাঁর মধ্যে অবতারবাদ, ব্যক্তিত্ববাদ এবং ভাববাদ দৃঢ় মূল লাভ করেছিল।

১৯৪৭ সালেই তারাশঙ্করের সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন তথা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ এবং তার ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক অবস্থানেরও অনিবার্য ভাবে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। একদিকে নতুন পরিস্থিতি, নতুন সুযোগ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার নতুন নতুন সম্ভাবনা বামপন্থী বহু মানুষকেও আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে স্বাধীনতার পরে পরেই কমিউনিস্ট পার্টির উগ্র বামপন্থা, কমিউনিস্ট পার্টির উপর স্বাধীন ভারতের নতুন কংগ্রেসী সরকারের প্রচণ্ড দমন পীড়ন, নিষেধাজ্ঞা, আক্রমণ প্রভৃতি বামপন্থীদের সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত করেছিল। যাই হোক, পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বামপন্থীদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই ছিল এক পক্ষীয়। অন্যপক্ষে তার বিরূপ আলোচনাও হয়েছিল। সে সবই এখন ইতিহাস।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, "আমার যৌবনে আমি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হই—তবে তখন আমার চেতনা রোমান্টিক ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—আমি সোভিয়েট ইউনিয়নকে মানবতার দুর্গ ও দুনিয়ার আশা ভরসাস্থল হিসাবে গণ্য করি।" ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ঐ ভাষণেই বলেছিলেন, "ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানিকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি,

কুটনীতি, ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে—তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।···ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না।··· একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক আছে, তারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড বোকামির ফাঁক রয়েছে, সেটা তারা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় নাচে কি আশ্বস্ত হয় কোন আনন্দে কোন আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না।"

তারাশঙ্কর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ছাড়াও Friends of the Soviet Union এর উপর্যুপরি তিন বছর সভাপতিত্ব ও People's Relief Committee-র দীর্ঘকালের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'আমার সাহিত্য জীবনে' লেখেন যে, প্রগতিশীল সংস্থাগুলির পশ্চাতে কমিউনিস্ট প্রভাব আছে একথা না জেনেই তিনি এই দলগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন! অবশ্য তিনি অত্যন্ত পরিণত বয়সেই প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই তারাশঙ্কর সোভিয়েট রাশিয়া, সাম্যবাদ, প্রগতি সাহিত্য এবং ভারতীয় সাম্যবাদীদের উপর বীতরাগ হন। তারপর থেকে তিনি বশিষ্ঠ, পুনর্জন্ম, আত্মা, আত্মদহন প্রভৃতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়ে চীন এবং রাশিয়া ভ্রমণ করলেও তাঁর মনোভাবের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫২ সাল থেকেই নানা পুরস্কারে এবং নানা সম্মানে ভূষিত হন। প্রবন্ধের প্রথমেই তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। "শুধু তাই নয়, নিজের জন্য, নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের জন্য কংগ্রেস সরকারের হাত থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছিলেন। নারায়ণ চৌধুরী ১৯৯০ সালে 'পল্লীগ্রাম' পত্রিকায় লিখেছিলেন. "তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য গ্রথিত করার ফলে কংগ্রেস সরকারের হাত থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আহরণ করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি নিজে এম. এল.এ,এম পি হয়েছিলেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের হজ্জেপেও বদান্যতায় রবীন্দ্র

পুরস্কার পেয়েছিলেন, চীন ও সোভিয়েত সরকারি সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের নেতৃত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন, কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদে ভূষিত হয়েছিলেন, আরও কত কী। শুধু তাই নয়, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা এঁদের সরকারি চাকরিতে বসাবার ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন।"

তারাশঙ্কর আবাল্য খুব কর্মঠ এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করেছেন তখন তার পরিচিতি ছিল কমিউনিস্ট বিরোধী হিসেবে। সেই সময় মার্কিনদের সঙ্গেও তাঁর ভাল যোগাযোগ ঘটেছিল। "মার্কিন মদতে পুষ্ট 'এশিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কমিউনিস্টদের অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, ওই সংস্থা থেকে প্রকাশিত কোয়েস্টলারের বিতর্কিত পুস্তক God that Failed-এর বাংলা তর্জমার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, দিল্লী থেকে আগত সি. আই. এ-র চর গোয়েল নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বৈঠক করেছিলেন, কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ সম্পাদিত জনসেবক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকীয় লেখকরূপে কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইত্যাদি।" এখানে উল্লেখযোগ্য, নারায়ণ চৌধুরী তারাশঙ্করের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ডঃ বিধান রায়ের পরিকল্পিত বঙ্গ-বিহার একত্রিকরণের বড় সমর্থক ছিলেন।

তারাশঙ্করের জন্ম শতবর্ষে এই সব উল্লেখ তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নয়। শতবর্ষ পরে একজন মানুষের মূল্যায়নে স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক ইতিহাস স্মরণে আসে। তার থেকে ব্যক্তি মানুষের প্রবণতাটা বুঝতে সাহায্য হয়। ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, তারাশঙ্করের গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল নিবিড় এবং সমৃদ্ধ। ঠিক শরৎচন্দ্রের মত। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ, শরৎচন্দ্রের মত তার সাহিত্যের সেভাবে উত্তরণ ঘটল না। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ', 'দেনা-পাওনা' কিংবা 'শেষপ্রশ্ন'র মত সৃষ্টি তিনি উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে পারলেন না। অথচ সেই উপাদান তিনি পেয়েছিলেন, 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী', 'মন্বন্তর', প্রভৃতি উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। সেদিক থেকে তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর অভিজ্ঞতা, আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে থাকবে। □

তারাশঙ্কর ঃ সৃষ্টি, মনন এবং প্রগতিশীলতা

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সময় ও প্রেক্ষাপটটি প্রথমে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। যে কোন স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপট একাত্মভাবে জড়িয়ে থাকে। সমাজের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবতা স্রষ্টার জানা না জানার অপেক্ষা না করেই তাঁর ভাবমানসে প্রত্যক্ষ প্রভাব গড়ে তোলে। এই ভাবেই লেখকের নাড়ীনিক শ্বাস প্রশ্বাস ও চিন্তাচেতনার মধ্যে সময়ের বার্তা ধ্বনিত হতে থাকে। এই বার্তা ও প্রভাব লেখকের 'কমিটমেণ্ট' গড়ার অন্যতম উপাদানও হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে যুক্তির দিক থেকে তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের জন্ম ১৮৯৮-র জুলাই মাসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ভারতবর্ষের বুকে তার সাম্রাজ্য খানিকটা সাজিয়ে বসেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং সেই সূত্রে জাতীয় আন্দোলন তখনো সেই পরিমানে পরিণত হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে যা বোঝায় তার স্পষ্ট ছবি তখনো দেখা যায়নি। মোটামুটি ভাবে তা একটা চেতনার স্তরে ছিল বলা যায়। এর পর ১৯০৫ সালে। বছরটা ঐতিহাসিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এরপর ১৯২০ সাল। জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মাগান্ধীর আবির্ভাব। রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান উপাদানই তখন পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতের মুক্তি। পাশাপাশি সশস্ত্র আন্দোলনের একটা ধারা, যার নেতৃত্বে ছিল যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির মত সংগঠন। রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক চিত্রপটটিও উল্লেখ করা দরকার। আমরা সাধারণভাবে জানি ইংরেজ শাসনের আগ পর্যন্ত আমাদের দেশের মূল কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিই সেখানে কাজ করত। জমি, কৃষি, জমিদার, কৃষক এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক চিত্রগুলি ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সার্বিক-ভাবে সমাজের শাসনভার ছিল দেশীয় রাজা, জমিদারদের হাতে। এই চিত্র-

বজায় ছিল অনেক বছর পর্যন্ত। বিশেষত ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। পুঁজির আমদানি হল এবং সেই সঙ্গে এল শিল্প (Industry)। শিল্পসৃষ্টির অনুষঙ্গ হিসেবে এল পরিকাঠামোগত নানা পরিবর্তন। গোটা ভারতবর্ষের কাঁচামাল যোগান ও পরিবহনের বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠল রাজধানী শহর কলকাতা। এছাড়া রেলপথ ও টেলিযোগের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটল। এইভাবে ব্রিটিশ শাসন তার বিরাট পরিকাঠামো, পুঁজি এবং পুঁজিকে কেন্দ্র করে শিল্প সবকিছুই দেশীয় শিল্পের কাঁচা বনিয়াদকে ভেঙ্গে দিল। এর ফলে দেশীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার দেশে নিয়ে যেতে লাগল ভারতের মাটিতে বাণিজ্য করা মুনাফা। এই ভাবেই দেশের ব্যাপক জনসাধারণের উপর শোষণের জোয়াল চাপিয়ে দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যখন দেখা দিল কেবল নেই-এর সাম্রাজ্য। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, নেই চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা। চারদিকে শুধু ভাঙ্গনের মহাচিত্র। এরকম একটা সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। স্বাভাবিকভাবে তাঁর চিন্তা, কর্ম, মনন এবং সৃষ্টির মূল্যায়নে এই প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা প্রয়োজন।

যেকোন সাহিত্যিক / স্রষ্টার সৃষ্টিকে বোঝা বা মূল্যায়ণ করার আগে তাঁর জীবন ও জীবনের বাস্তবতাকে অনুধাবন করা দরকার। কেননা জীবনকে নৈর্ব্যক্তিক ও বাস্তব-নির্ভর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে না পারলে সাহিত্য বা সৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের জীবন বীরভূম জেলার লাভপুরে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে লালিত। বাড়িতে স্বদেশীয়ানার একটা ঘরানা ছিল। কংগ্রেস ও স্বাধীনতা এই রকম একটা মানসিকতা তাঁর ছিল। এর মধ্যে অবশ্য ছিল লেখারও ঝোঁক। রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ বোঝা যায় তাই স্বীকারোক্তির মধ্যে—"নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল।...তার আগে আমার তখনকার জীবন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে জেলখানার সংকল্প মনে রেখে বৈষয়িক জীবন থেকে মুক্তি নেবার জন্য ছোট ভাইকে সব ভার অর্পণ করে একটি ছাপাখানা করলাম। মনে মনে আকাঙ্খা ছিল একখানা

কাগজ বের করব।" আবার অন্যত্র তিনি বলছেন "হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। উনিশশো ষোলো সতের সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মনুষ্যদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে সেদিন আসতে আর দেরী হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নেই।···তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব।···· ···সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি।····কিন্তু তার বস্তুবাদসর্বস্বতাকে মানতে পারিনি।" উদ্ধৃত অংশটুকু থেকে তারাশংকরের অন্তরঙ্গ মানসিকতার পরিচয় আমরা পাই। তারাশংকর অর্থনৈতিক সাম্য সম্পর্কে কোনো দ্বিমত করেননি। তবে এর মধ্যেই তৃপ্ত থাকেননি। তার মতে অর্থনৈতিক সাম্যই সব নয়। এর পরে আছে পরম কাম্য। অন্তরের পরিচ্ছন্নতা পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। হিংসাবিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্য কাজের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থার উত্তরণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন "মনুষ্যত্ব কোন মেডইজি উপায়ে পাবার নয়।" এসব কথা থেকে দুরকম মানে করা যেতে পারে। প্রথমত তারাশংকর হেগেলীয় ভাববাদের মত অর্থনৈতিক নির্ধারণ-বাদকে অস্বীকার করেছেন। জীবন ও সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর অনিবার্য প্রভাব বাদে অন্যান্য দিকের গুরুত্ব আছে। মনুষ্যত্ব, মানবতার সঙ্গে ভাববাদী ব্যাখ্যার সম্পর্ককে বিশ্বাস করতেন। আরেকটা ব্যাখ্যার কথাও বলা যেতে পারে। যেমন মার্কসবাদীরাও মাঝেমধ্যে মার্কসের থেকে বেশী মার্কসবাদী হয়ে ওঠেন। অর্থনীতির বাইরেও মানুষের অনেক দিক আছে যা কেবল অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। উগ্র বস্তুবাদীতার রোগ থেকে এদিকটার জন্ম হয়। সেক্ষেত্রে অর্থনীতির সঙ্গে অন্য চিন্তনের সমন্বয় সাধন করতে হবে। মার্কস এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না এমন নয়। তবে তারাশংকরের ঝোঁক কোন্ দিকে তা তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ণে বুঝে নেওয়াই শ্রেয়।

৩

তারাশঙ্করের প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত হলেও তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প আছে। ছোটগল্পের মধ্যে চিন্তা চেতনা সমাজ-ভাবনার পরিসর-

টুকু ছোট থাকে। গল্পের বিস্তার, বক্তব্য ও শেষ মোচড়ে লেখকের চিন্তাদৃষ্টি কোথায় যেতে চায় বা তার মধ্যদিয়ে মূলত তিনি কী বলতে চান তার ছাপটা মোটামুটি স্পষ্ট থাকে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ছোট গল্পকার হিসেবে তারাশঙ্করের নাম সহজেই উঠে আসে বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কারো মতে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য দুই বন্দ্যোপাধ্যায়-কেও তিনি ছাপিয়ে গেছেন। আমরা লক্ষ্য করি তাঁর ছোটগল্পে তথাকথিত নীচু, দরিদ্র, অসহায় শ্রেণীর চরিত্র বারে বারে ফুটে উঠেছে। তাদের পেশা, জীবন, বাঁচার সংগ্রাম, সুখ-দুঃখের বারমাস্যা, হতাশা, যন্ত্রণা, সব কিছুই গল্পের মধ্যে ভাষাচিত্র হয়ে সৃষ্টির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছে। কোথাও ধরাবাধা ছকের বাইরে পড়েনি। এই চিন্তাদৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তাঁর মানবতাবোধ। মানবপ্রীতি। মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালবাসার অকৃত্রিম প্রজ্ঞা। তাই চরিত্র-হিসেবে এসে যায় সাপুড়ে, বাজিকর, বেদে, কামার, কবিয়াল, রাজমিস্ত্রি। এছাড়া আছে উত্তরপ্রদেশের দেহাতি আদমি, ছাদের কাজের যোগানদার প্রভৃতি। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রের বহুমুখীতা। জীবনকে বিরাট ক্যানভাসে দেখার ক্ষমতা থেকে এই বৈশিষ্ট্যর জন্ম। নিজে জমিদার বাড়ির ছেলে এবং সেই সূত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লিখলেন 'রায়বাড়ি' এবং 'জলসাঘর'। এখানে তারাশঙ্কর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্ব, হতাশা, বেদনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত 'জলসাঘর' গল্পে জমিদারি ঘরানা ভেঙে পড়া এবং অস্তমিত হওয়ার সময়েও জমিদারি ঘরানা, সত্তার নিষ্ফল অহংকার এক চমৎকার দ্বন্দ্বে ফুটে উঠেছে। 'অগ্রদানী' গল্পের লোভী চক্রবর্তীর ট্রাজেডি করুণরসের ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। কিন্তু পাশাপাশি জমিদারি ব্যবস্থার দাপট এবং অন্যায় বলপ্রয়োগও লক্ষ্য করার মত। এ বাদে বিচিত্র উপাদান নিয়ে গল্প 'ডাইনী' ও 'ডাইনীর বাঁশি' রাঢ় বঙ্গের মানুষ তার আঞ্চলিক বিশ্বাস বা কুসংস্কার এবং বাৎসল্যের এক সুষম মিশ্রণে নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'বেদেনী' গল্পটির পরিকল্পনা উল্লেখ করার মত। বেদের মেয়ে রাধিকা প্রথম পুরুষ শিবপদকে ছেড়ে শুদ্ধ বাজিকরকে আঁকড়ে ধরে। নিজের উপচে পড়া যৌবনকে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সেখানেও থেমে থাকেনা। পরে সঙ্গী করে নেয় নতুন বাজিকর কিষ্টোকে। এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ পরিক্রমায়। প্রেম, বিবাহ সম্পর্কে গতানু-গতিক রীতিশাসিত ধারণাকে উল্টে দিয়ে নিজস্ব উল্লাসের তরীতে ভেসে বেড়ায়।

'বেদেনী' গল্পে একদিকে যেমন রয়েছে বেদে সমাজের একটা বাস্তবচিত্র তেমনি আরো বড় করে ধরা দেয় একটা জীবনসত্য। এই সত্য স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা পেরিয়ে একটি সর্বজনীনতায় রূপ নেয়। আরেকটি রীতিভাঙ্গা গল্প হল 'আখড়াইয়ের দীঘি'। কালী বাগদীর পেশা ছিল অদ্ভুত নৃশংসতা মেশানো। পথিককে বিশেষ কায়দায় মেরে এবং সর্বশান্ত করে নিজেদের রুটি রোজগার। তারাশঙ্করের বক্তব্য এই পেশা বর্বরোচিত হলেও বংশগতির টানে তা এখনো চলছে। লেখক এখানে অনেকটাই জেনেটিক্স এর সীমাবদ্ধ চিন্তার শিকার হয়েছেন। জীবনকে আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের চোখে দেখলে এই সীমাবদ্ধতাকে তিনি কাটাতে পারতেন। সমাজদ্বন্দ্বের বাস্তবতায় জীবনকে দেখা বিশ্লেষণ করা এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা এই চিন্তা শিক্ষণ তাঁর ছিল না। এ গুণ না থাকলেও সাহিত্যিক দৃষ্টির প্রসারতা তাঁর ছিল। যার সাহায্যে তিনি সমাজকে অনেক বিস্তৃত ক্যানভাসে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'মা' গল্পটি। গল্পে জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের ছেলে ধীরেন উগ্র, অত্যাচারী ও বাস্তিক। বিক্ষুব্ধ প্রজাদের সে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে। কিন্তু আজন্তরী জমিদারি-মানস বুঝতে পারেনা সময় বদলেছে। ইতিহাসের গতিপথ ঘুরছে। মহাবিষ্ণু সরকার ভাবে তার হাতে কুষ্ঠ হয়েছে। কুষ্ঠ হওয়াকে আসলে তারাশঙ্কর এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় নিয়ে গেছেন। আমরা গল্পের শেষে দেখলাম —"জানালাটা খুলিয়া দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রইলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে।—চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহসা আপনার হাত দুইটি সেই আলোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন—সাদা হয়ে গেছে। অস্থি চর্মসার রক্তহীন বিবর্ণ হাত—এখানে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। লেখক বলতে চাইছেন জমিদারি প্রভুত্ববাদ ও শোষণ প্রক্রিয়া সমাজ ধারার এক স্তরে এসে ক্ষীণ হয়ে যায় এবং নতুন যুগের সূচনা করে। তারাশঙ্কর ঘোষিতভাবে মার্কসীয় পথে বিশ্বাসী না হয়েও জীবনবোধ এবং বাস্তব বীক্ষণে প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছেন। তারাশঙ্করের ছোটগল্প প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মোহিতলাল ১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে লেখেন —"তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—বস্তুর বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করিয়া তাহার

রসরূপ আবিষ্কার করার যে কবি মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গি তাহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।...তাহার কবিশক্তির আর একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ এই যে জীবনের যে রঙ্গভূমিতে এই সকল নটনটী অভিনয় করিতেছে তাহার দৃশ্যপট কোথাও অবান্তর নহে।—বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একই সুরে বাঁধা।"

৪

উপন্যাস সাহিত্য গল্পের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। লেখকের কাহিনী ও উপকাহিনী ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব ও সুযোগও বেশি। ক্যানভাসটাও স্বভাবত অনেক প্রসারিত। এর মধ্য দিয়ে লেখকের চিন্তা-ভাবনা ভাবাদর্শ মতবাদ মনন বিশ্বাস যাই বলিনা কেন তা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগও অনেক। উপন্যাসের এই বিশাল ব্যাপারটাকে বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মূল্যায়ন যুক্তি-নির্ভর হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের সামগ্রিক বিষয়বস্তু, প্লট, থট সবকিছুই তার গল্পের মত বহুমুখী। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩০), যার ভিত্তিভূমি ছিল জেলখানা। এখানে লেখক গোষ্ঠর মধ্যে একটা বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে অত্যাচারে হতাশায় জর্জরিত হয়ে জমিদারের খোট্টা চাপরাসিকে হত্যা করে গ্রামত্যাগ করে। কার্যত তারাশঙ্করের উপন্যাসে ময়ূরাক্ষীর ধারে গড়ে ওঠা গ্রাম্যজীবন এবং অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতা এই দুই এর সংঘাত ও ভাঙ্গাগড়ার ঘাত-প্রতিঘাত মূর্ত হয়েছে। এই দিক থেকে অবশ্যই বলতে হয় তারাশঙ্কর কতটা মার্কসবাদী পথের অনুসারী তার থেকেও স্পষ্ট ব্যাপার হল তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত সমাজনিষ্ঠ ও জীবন সম্পৃক্ত। এর মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক চেতনাকে সবচেয়ে আগে রাখতে হয়। জীবনের শুরুতে ১৯২০-২১ সাল থেকেই তিনি কংগ্রেস তথা গান্ধীর আকর্ষণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করেন। এই প্রেক্ষাপটটি তাঁর উপন্যাস চেতনা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। 'গণদেবতা', 'ধাত্রীদেবতা' 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'কে সমাজ রাজনীতি চরিত্রের বলা যায়। আবার 'জঙ্গলগড়', 'অরণ্যবহ্নি'র প্রতিপাদ্য অন্য। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাস অরণ্যবহ্নিতে সিধু কানুর নেতৃত্বের কথা বিবৃত হয়েছে। খুটকাট্টি জঙ্গলের দখল নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল বিদ্রোহ, সামাজিক-অর্থনৈতিক দুরবস্থা কিংবা শোষণের

সমাজমুখী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে এগোননি। সেখানে বিদ্রোহের কারণ হিসেবে পারিবারিক কারণগুলিই প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। পারিবারিক বিবাদ বিষয়টি উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু তার বাইরেও যে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকার সুযোগ থাকে সেই দিকটি তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠেনি। আরেকটি দিকও উপন্যাসের ব্যঞ্জনা বাড়াতে পারত। তাহল এই আদিবাসী জীবন ও সমাজ এবং মূল স্রোতের জীবন ও সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কোথায় কীভাবে এর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তার বিশ্লেষণ সেখানে অনুপস্থিত। তবে তিনি এর মধ্যেও বলেছেন বিপ্লব চলবে। এর পরে আসা যাক 'গণদেবতা' প্রসঙ্গে। একথা মানতে কোন সঙ্কোচ নেই যে এই উপন্যাসে তার সাহিত্যিক নৈপুণ্য প্রকাশিত। সময়টা ছিল ফ্যাসিবাদ ও তার বিরোধীশক্তির দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে দীপ্ত। একদিকে জার্মানি জাপান ইটালি অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম রূপকার সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ার প্রভাবে সাধারণ মানুষ ভাবতে শিখল শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষকে সংগঠিত করে দেশে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক অঙ্গন ছেড়ে জাতীয়স্তরে তখন কংগ্রেসের মধ্যেও দ্বন্দ্ব। জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র তথা ডান-বামের দ্বন্দ্ব। এরকম একটা প্রস্তুত পটভূমিকে সামনে রেখে তিনি শুরু করছেন 'গণদেবতা'। একদিকে অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ ও অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক মানসিকতা। উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখি শিবকালিপুরের অনিরুদ্ধ কর্মকার এবং গিরিশ সূত্রধর বাজার শহরে গিয়ে দোকান ফিরেছে। আগে গ্রামে হাল লাগাত, কাস্তে গড়ার কাজ করত। এর বিনিময়ে পেত হালপিছু পাচ মালি আর সূত্রধর হালপিছু চার পাই করে ধান। পরে তিনি দেখালেন জংশনে নতুন বাজার বসেছে। গ্রামের লোক সেখান থেকেই নগদে ও সস্তায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনছে। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিনিময় রীতির পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক নগদ আর্থিক বিনিময় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের চেতনারও পরিবর্তন এসেছে। অনিরুদ্ধ ও গিরিশের মধ্যে প্রতিবাদ চেতনা প্রবল। আবার অন্যদিকে গ্রামের দেবনাথ ঘোষও কায়েমী স্বার্থের পক্ষে। গ্রামে সে তাই মজলিশ বসায়। এই মজলিশের বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ প্রতিবাদ করে। এইভাবে গ্রামের সম্পদশালী শ্রীহরি-অনিরুদ্ধর দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'তে তিনি

রাজনৈতিক চেতনার আধারে মানুষের মুক্তির গান গেয়েছিলেন। তারাশঙ্করের আরেকটি ধ্রুপদী উপন্যাস সম্পূর্ণভাবেই আঞ্চলিক উপন্যাস। অনেকের মতে পৃথিবীর কয়েকটি উপন্যাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়াতে পারে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'। এক অর্থে কোপাই নদীর তীরে কাহারদের জীবন ও সমাজের একটি অনবদ্য ডিটেলস্ আমরা এখানে পাই। সেখানে হীরু, করালি গ্রামীন সমাজের সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষণের জাঁতাকল থেকে নিজেদের বাঁচাবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যস্ত। যে কাহার সমাজ বাবুদের পাল্কী বয়, উৎসবে বেগার খাটে, আবার কখনো চরকের উৎসবে খেলা দেখায়, বনোয়ারী তাদের নেতা। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রচলিত অর্থে উপন্যাসে কোন খলচরিত্র নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোষণ অত্যাচারের বীভৎস রূপটি প্রকট করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। এখানেই উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্কর মার্কসবাদী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও শ্রেণী শোষণের চিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছেন। একইরকম ভাবে দেখলাম 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ খরাক্লিষ্ট মাঠে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত মাটির হাহাকার শুনতে পায়। সংবেদনশীল তারাশঙ্কর প্রাকৃতিক খরার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক রিক্ততার রূপকচিত্র। তারাশঙ্করের আরেকটি নায়ককেন্দ্রিক উপন্যাস 'কবি' (১৯৪২), যেখানে জাত-পাতকে ডিঙিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল গুণকে বড় করে দেখিয়েছেন। জীবনের রূঢ় বাস্তবে প্রেমের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কবির নায়ক নিতাই ডোমসমাজভুক্ত। নিতাই এর মামা গৌর হাড়ি। পেশায় ডোমদের মত। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে সতীশ ডোমের উৎপত্তি সম্পর্কেও বলেছেন। সতীশ নিজে অনেক কষ্টের মধ্যেও নিজের জাত-সংস্কৃতির অঙ্গন ছেড়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে কবিগানের আসরে হাজির হত। দোহারদের সঙ্গে মিশে সুরে সুর মিলিয়ে দোহারকি করত। এইভাবে জীবন থেকে নেওয়া চরিত্র তাঁর কল্পনার রঙে মিশে অনির্বচনীয় সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। উপন্যাসে রূপান্তরিত কবি ও তার কবিত্ব বিকাশ আদতে জীবন পরিক্রমার কাহিনী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষত কুমুরওয়ালি বসনের কাহিনী যুক্ত হয়ে এক গভীর জীবনবোধের পরিধি পেয়েছে 'কবি' উপন্যাসটি। সাহিত্য জীবনের দর্পণ এই মূল মন্ত্রকে তারাশঙ্কর তাঁর চরিত্রচিত্রণের মধ্যে প্রমাণ করেছেন। তাই গ্রামের জমিদার, মহাজন, মোড়ল এই

সুবিধাভোগী শ্রেণীর শয়তানী চাল সবকিছুকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে সমাজবন্ধুর মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে এমন নয়। কিন্তু তাতে শোষণের ভয়াল চিত্ররূপটি আবছা হয়ে যায়নি। আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষতাকে লঘু করা যায় না। কেননা তাঁর লেখার সার্বিক গুণ এবং উপন্যাসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মুন্সিয়ানা তাঁকে দেশকালের বাইরে নিয়ে গেছে। তাঁর উপন্যাসের আবেদন কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের বিষয় হয়ে থাকেনি। এ প্রসঙ্গে জরাসন্ধর মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। "প্রত্যেক লেখকের রচনাই তাঁর দৃষ্ট এবং পরিচিত দেশ ও সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লেখক মাত্রই আঞ্চলিক। কিন্তু যে মানুষের কথা তিনি বলেন তাদের চেহারা, বেশভূষা, ভাষা, রাজনীতি একটি বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের হলেও, তারা যখন আমার আপনার ও অন্য দশজনের অন্তর স্পর্শ করে, তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই যা সর্বদেশের, সর্বকালের।" এছাড়া তারাশঙ্করের বেশ কিছু উপন্যাসও উপন্যাসধর্মী লেখা আছে যা গভীর আলোচনা দাবী করেনা। তবে 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। মূলতঃ জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিক চেতনা ও ভারতীয় ঐতিহ্যকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল এ লেখাগুলির মূল উপাদান। 'রাইকমল,' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র মধ্যদিয়ে শিল্পের ধ্রুপদী গুণাবলি ফুটে উঠেছে। উপন্যাস কীভাবে একটি সোসাল ডকুমেন্ট হয়ে উঠতে পারে তা 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায়।

তারাশঙ্করের সৃষ্টি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত। সেই সব সৃষ্টি থেকে একথা অবশ্যই বলা যায় তারাশঙ্করের চিন্তা চেতনা জীবনকেন্দ্রিক। নিজের চেনা জানা থেকে শুরু করে অজানা-অপরিচিত জনসমাজের বিশ্বস্ত চিত্র তাঁর লেখায় জীবন্ত। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে জীবন ও সমাজের দ্বন্দ্ব শ্রেণী ভিত্তিক সমাজের বিভাজন এবং যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কাঠামো সে সম্পর্কে লেখক কতটা সচেতন ও বিশ্বাসী ছিলেন? তারাশঙ্কর যখন রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমি এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন তখনো এই প্রশ্ন সরব ছিল। এর অন্যতম কারণ হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দুটো শ্রেণীর অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘাতের চিত্ররূপ কোথায় গিয়ে পৌঁছয় বা

পৌঁছতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর চেতনা নির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলিত ছিল না। একটা আবছা ধারণা ছিল কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তা স্থিরীকৃত ছিল না। মূলত এক কথায় বলা যায় তারাশঙ্কর মার্কসীয় শিক্ষার শ্রেণী সংঘর্ষে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নিজেই তার প্রমাণ রেখেছেন। তিনি চীন-এর প্রশংসা করেছেন এবং পরেই স্ব-বিরোধী মন্তব্য করেছেন। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন—"আমি আমার ভারত ধর্মে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি মানুষের যাত্রা কল্যাণপথে"। এখানেই তিনি বুঝতে ভুল করেছেন যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী দমনের আড়ালে সাধারণ মানুষের নিদারুণ দুরবস্থা ও চূড়ান্ত অবমাননার বাস্তবতাকে। বস্তুত তারাশঙ্করের মধ্যে যে ব্যাপারটা ছিল তা হল অহিংস কংগ্রেসী রাজনীতিতে আস্থা প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ ঈশ্বর বিশ্বাস। কিন্তু তিনি বুদ্ধ ও পঞ্চশীলের কথাও বলেছেন। কিন্তু ভুলে যান যে বুদ্ধের বিশ্বাস মূলত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। অহিংস নীতির টানে তিনি সহিংস রাজনীতির ভূমিকাকে অনেকাংশে অস্বীকার করেছেন। আবার তিনিই এক সময় 'আধুনিক কাল ও সাহিত্য' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন "সাহিত্য মানুষের, অন্যায়ের সঙ্গে মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত সংগ্রামী মানুষের, সংগ্রাম অন্যায়ধর্মী সকলতন্ত্র বা মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে তার বিরুদ্ধেও, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এমন কি দারিদ্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে।" তবুও বলা যায় তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে প্রাচীন মূল্যবোধ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতি একটা স্পষ্ট দুর্বলতা ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল গ্রাম্য সমাজ ও জমিদার-তন্ত্রের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান থাকলেও এই ব্যবস্থা তুলনামূলক ভাবে শ্রেয়। সেই কারণেই আমরা দেখলাম 'গণ-দেবতায়' তিনি নিজস্ব সমাধানের পথ নিয়ে উপস্থিত। তিনি মনে করেছিলেন দেবু পণ্ডিতরা পরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে বেশি কিছু করতে পারবে না। কার্যত এর কারণ হল আদতে তারাশঙ্করের মধ্যে জমিদার তন্ত্রের বিরুদ্ধে বা বলা যায় জমিদার তন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য তীব্র জেহাদ ছিল না। অন্য ভাবে বলা যায় তারাশঙ্করের রচনা পড়ে সাধারণ মানুষের মনে জমিদারতন্ত্র সম্পর্কে একটা জাত ঘৃণা জন্মায় না। উপরন্তু মানবিকতার দোহাই ধরে সেই শ্রেণীর মধ্যেও সহমর্মিতা ও শ্রেণী সহায়তার লক্ষণ দেখান হয়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে অন্য একটি বাস্তব প্রেক্ষাপটের কথাও বলতে হয়। বিংশ শতাব্দীর একদম প্রথম দিকে মার্কসীয় পথে সাম্যবাদী চেতনা কাঙ্খিত পরিমানে পরিণত ও সংগঠিত

ছিল না। শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীশাসন একটা তত্ত্ব হিসেবে কেবল কিছুটা পরিচিত হচ্ছে। কাজেই সেই দিক থেকে বলা যায় তারাশঙ্করের মধ্যে যে বুর্জোয়া জাতীয়তা বা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চেতনা ও মনন ছিল তার মধ্য থেকেই তিনি যথাসম্ভব সামন্ততন্ত্র, জমিদারি ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলি তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেই দিক থেকে 'হাঁসুলি বাঁকের উপ কথা' 'গণদেবতা', 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসগুলি অবশ্যই উল্লেখ করার মত। অন্যান্য উপন্যাস ও ছোট গল্পেও একটা সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা করে ছিলেন।

কিন্তু তারাশঙ্করকে এই ধরনের কেতাবী মার্কসীয় বিচারে মূল্যায়ন করা সঠিক কিনা সে সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিচারে দলীয় কমিটমেন্টের শৃংখলা চলে না। সাহিত্য ও শিল্পের বিচারে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র অনেক উদার ও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উগ্রতা ও চাপিয়ে দেবার ব্যাপারটি প্রগতি শিবিরের কাছেই খুব ক্ষতিকারক। তবে আমাদের দেশের প্রগতিশিবিরে এই রোগটি বেশ পুরানো। আমরা মেনেও ভুলে যাই লেনিন পুশকিন কিংবা গোর্কীকে কী ভাবে দেখেছেন বা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তবে একথা মানতে কোন বাধা নেই যে তারাশঙ্করের চেতনায় দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। কলেজ জীবন থেকেই তিনি ভাবাদর্শের রাজনীতি তথা কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। গান্ধীবাদ ছিল উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস। নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন, একসময় তিনি গুরু খুঁজছেন যার কাছে তিনি দীক্ষা নিতে পারেন। মোহিতলালকে লেখা তাঁর চিঠি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি নিজেই বলেছেন—তিনি ফ্রয়েডের তত্ত্ব বা মার্কসীয় দর্শনের উপাসক নন। উপরন্তু কোন এক সময় তিনি অলৌকিক বিশ্বাস ও কুলগুরুর উপর আস্থা রেখেছিলেন। আদতে ভাববাদী চিন্তা-ভাবনার দিকগুলি তাকে নাড়া দিত। নিজের ব্যক্তি সত্তা ও লেখক সত্তা এই দুই-এর মধ্যে একধরণের বিরোধও ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি নিজে মনে করতেন "সাম্যকে অন্যায়ের পথে, ক্রোধের পথে, হিংসার পথে প্রতিষ্ঠার কোনো মানে হয় না। এর ফলে সত্যের বদলে শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অসৎ পথে সৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অসৎ নিজের দাবীতে সত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে।"

এখানেও আমরা তাঁর মধ্যে গান্ধীবাদী নৈতিকতার প্রভাব লক্ষ্য করি। এই কারণেই আমরা দেখলাম 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সে কার্যত ধনতন্ত্রের কাছে দরিদ্র অসহায় গ্রামবাসীদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। আবার 'মন্বন্তর' উপন্যাসেও মন্বন্তর-এর কারণ হিসেবে আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। বরং সমাধান হিসেবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করতেন যেদিন সমস্ত রকম মতবাদের কচকচানিকে চাপা দিয়ে মহাপুরুষের মোহমুক্ত কল্যাণ দৃষ্টি বর্ষিত হবে সেদিনই অমৃতময় মানব সমাজ গড়ে উঠবে। তিনি তো নিজেই একসময় কবুল করেছেন— "আমাদের কুলধর্ম তান্ত্রিক। আমি কিন্তু মনে মনে বৈষ্ণব হতে চেয়েছি। বিরোধ ঘটেছে বৈকি ফিরেছি আবার শক্তি মন্ত্রে" [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত অভিভাষণ]। এর সহজ প্রতিফলন আমরা তাঁর সাহিত্যে পেলাম। জীবন মুক্তির সাধনায় তিনি সন্ত্রাসবাদকে অস্বীকার করে অহিংস আন্দোলনের পথ অনুসন্ধান করেছেন স্থির বিশ্বাসে।

এ কথা আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় তারাশঙ্করের মধ্যে যেমন একধরণের ভাববাদী চেতনা ছিল, শ্রেণী চেতনার অভাব ছিল, সেই সঙ্গে প্রগতিশীলতার মনন ও কর্মোদ্যোগও ছিল। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটা ভূমিকা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট ছিল। তিনি নিজে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে যে সভা হয় সেই সভার তিনি ছিলেন সভাপতি। তাঁর অভিভাষণে এই কথা দৃপ্তভাবে ছিল—"আমি এই সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের মুখের দিকে চেয়ে আছি। আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব—ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে-এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি সংগ্রাম নয়। সমস্ত বিশ্বের মুক্তিসংগ্রাম।" এছাড়া ১৯৪৪ সালে ১৫-১৭ জানুয়ারি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে তারাশঙ্কর ছিলেন সভাপতি। ভারত সভা হলে দেওয়া তাঁর ভাষণ 'জনযুদ্ধ'র জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি সেখানে বলেছিলেন "আমরা মানবজাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার চেষ্টায় উদ্যত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তার বিরুদ্ধে।" এরপর ১৯৪৫ সালের ৩-৮ মার্চ এই সংঘ যখন প্রগতি লেখক সংঘে

পরিণত হয় সেই সম্মেলনে তারাশঙ্কর ছিলেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টির সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্কর এমন একজন নান্দনিক ব্যক্তিত্ব যে তাঁর মধ্যে একদিকে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটের মত ভালমানুষী মন ও ব্যক্তিত্ব ছিল এবং মানুষের প্রতি দরদ ও মানবিকতার তাগিদে জমিদারি ঘরাণার লোক হয়েও সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু উন্মুক্ত মন নিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন নি। আবার প্রগতিশিবির ও তাঁর প্রাসঙ্গিক কাজকর্মের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। তারাশঙ্করের এই সামগ্রিক সত্তার অবস্থান থেকে এই সত্যটাই বেরিয়ে আসে যে আজকের এই রাজনৈতিক সামাজিক সংকট তথা যুগসন্ধিক্ষণে লেখকের মূল্যায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে সমাজ তান্ত্রিক ব্যবস্থার আপাত পতনের পর যখন মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে এবং মার্কসীয় সংকীর্ণতা / কঠোরতার অসারতা সম্পর্কে চেতনা বাড়ছে। সাহিত্য ও সৃষ্টি সুলভ নান্দনিক চর্চায় চূড়ান্ত (Absolute) বলে কিছু ধরে নিলে ক্ষতি হয় প্রগতি শিবিরেরই।

প্রগতি শিবিরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা আমরা বুঝতে পারব। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বামবুদ্ধিজীবী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন—"পাবলো নেরুদাকে ধরে রাখার জন্য স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি যতটা তৎপর ছিল, সমরেশকে ধরে রাখার জন্য এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যতদিন না সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে পারবে ততদিন সমরেশের মত লেখককে কেবলই হারাতে হবে। এই মন্তব্যটি সম্ভবত তারাশঙ্করের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।" সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় তারাশঙ্কর একজন কবির দৃষ্টিতে সমাজের বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি কিন্তু শ্রেণী রাজনীতির বিশ্বাস নিয়ে তা বিশ্লেষণ করেননি। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তবুও বলব যে কোন স্রষ্টারই একটা জায়গায় অসম্পূর্ণতা থাকে। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এই সীমাবদ্ধতাকে মানিয়ে নিয়েই সার্বিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাহলে স্রষ্টা / সাহিত্যিকের সমস্ত ইতিবাচক দিক আমাদের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা ও কর্মে যথাসম্ভব সহায়ক হবে। একেই বোধহয় আমরা প্রগতিশীলতার যথার্থ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বলতে পারি। □

সেই নারী, নামে 'সারী'

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

রাঢ়ের মাটি ও মানুষ তারাশঙ্করের লেখনী মুখে অধৃষ্য, অনুপম রূপ লাভ করেছিল। বিশেষতঃ পল্লী সমাজের প্রান্তসীমায় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস তাদের প্রতি তারাশঙ্করের ছিল মমতাময় তন্নিষ্ঠ আকর্ষণ। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি জানাচ্ছেন—"মাঠে-মাঠে ঘুরি, এমনি করেই ঘুরতাম চিরকাল। রেলের লাইন ধরে নদীর ধার। সেখান থেকে সাঁওতাল পাড়া।" এই সাঁওতালেরা ইংরেজ আমলে পূর্বভারতের উন্নতিশীল কর্মঠ, সরল ও বলিষ্ঠ একটি আদিবাসী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' এই গোষ্ঠীর দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ, সাহস এবং বীরত্বকে প্রমানিত করেছে। 'অরণ্যবহ্নি', 'কালিন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের এই অরণ্য মানুষদের জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, চারিত্র্যলক্ষণ, আচার ব্যবহার, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসের উপনায়িকা হিসাবে তিনি বেছেছিলেন একটি সাঁওতাল তরুণীকে। তার নাম সারী। সারী 'কালিন্দী' উপন্যাসের ঘনায়মান ট্রাজেডির অন্যতম আলম্বনবিভাব। সারী চরিত্রটি সম্পর্কে বলা যায়, সে ঔপন্যাসিকের মানসকন্যা। আর পাঁচটি সাঁওতাল মেয়ের থেকে সে আলাদা। তারাশঙ্করের ভাষায়—'সাঁওতাল মেয়েরা কষ্টি পাথরে খোদাই করা সুঠাম গঠন নারীমূর্তি'। ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথায় ঘন চুল, কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটে না····· খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাঁটাফুল' ('অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে)। সারী এদের থেকে দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্য আরও নিটোল, সে আরও ব্যক্তিত্বময়ী। তার সাজসজ্জা, অলঙ্কার-প্রসাধন অন্য সাঁওতাল তরুণীদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ভাবে নতুন।

'কালিন্দী'র নায়ক জমিদার রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র অহীন্দ্র। ব্রাহ্মণী তথা কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা কালিন্দীর চর দেখতে গিয়ে হিংস্র সরীসৃপ ও কীট পতঙ্গে ভরা বেনাঘাসের জঙ্গলে ঢাকা ঐ চরে আট-দশটি হাস্যমুখী সপ্রতিভ

সাঁওতাল তরুণীর মধ্যে অহীন্দ্র কমলমাঝির নাতনী সারীকে প্রথম আবিষ্কার করে। সারী অন্যদের তুলনায় সাহসিকা, সুন্দরী এবং কিছুটা বাক্‌পটু। সারীর খোঁপায় বনফুলের মঞ্জরী, তার তীক্ষ্ণ গন্ধ তরুণ অহীন্দ্রের মনে একটা রোমান্সের নেশা ধরায়। এরপর সাঁওতালদের গ্রামে গেলে কমলমাঝি সাঁওতাল বিদ্রোহের এক সময়ের নায়ক রাঙা ঠাকুরের নাতি অহীন্দ্রকে তার নাতনী সারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। একটি সাহসী যুবক বেনা ঘাসের বনে নিজের জীবন তুচ্ছ করে অজগর সাপ মেরেছে, তার সঙ্গে সারীর বিয়ে হবে। ঐ কথা শুনেও অহীন্দ্রের সামনে সারী লজ্জা পায় না। কুণ্ঠাহীন চোখে অবাক বিস্ময়ে সে অহীন্দ্রের মধ্যে যেন রাঙা ঠাকুরের প্রতিবিম্ব খোঁজে। এরপর সাঁওতাল রমণীরা সারীকে নিয়ে সারারাত নাচে ও গান করে। সেই নাচ-গান দেখতে দেখতে অহীন্দ্রের মধ্যে একটা রহস্যময় মোহ আকর্ষণ জন্ম নেয়। সারীর মনে বাড়ে শ্রদ্ধা, অহীন্দ্রের প্রতি। তারাশঙ্কর অহীন্দ্র ও সারীর মধ্যে একটা বিচিত্র প্রেটোনিক ভালবাসার সম্পর্ক আভাসে-সংকেতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এরপরে অহীন্দ্র নদীর ধারে সারীকে দেখে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। মাতা-কন্যার ঝগড়ার কারণ ভারী বিচিত্র। কালিন্দীর নতুন জেগে ওঠা চরে চাষের জমি বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু যারা বয়স্ক নর-নারী শুধু তারাই জমি পেয়েছে, সারী জমি পায়নি। অথচ অনাগত সন্তানকে মানুষ করার জন্য সারীর জমি চাই। তাই নিয়ে বিবাদ। একটি কুমারী মেয়ের অভিনব 'গৃহিনীপনা' দেখে অহীন্দ্র অবাক হয়। সে তখন তার বা জমিদারের অংশ থেকে সারীকে জমি দেওয়ার আশ্বাস দেয়। কৃতজ্ঞতায় সারীর মন ভরে ওঠে। এই সারী স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। রাঙাবাবু অহীন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ ঠিক প্রেম নয়—তার সঙ্গে শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভক্তি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সারীর আদিম সারল্য ও সাহস পাঠককে মুগ্ধ করে। সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে বন্য খরগোশ শিকার করে, সেই শিকার করা খরগোশ অহীন্দ্রকে দিতে চায়। অহীন্দ্র ঐ নারীদের দেখে অমলকে বলে, ওরা হচ্ছে তার 'পূজারিণীর দল'। অহীন্দ্রের সঙ্গে তার পিতামহ রাঙা ঠাকুরের চেহারা, মেজাজ ও চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকায় ওরা তাকে রাঙাবাবু বলে ডাকে। সারী শুধু বলে 'রাঙা ঠাকুর।' কালিন্দীর চর তাদের মুখে-মুখে 'রাঙা ঠাকুরের চর' হয়ে ওঠে। আর এই চর ভূখণ্ডই 'কালিন্দী' উপন্যাসের আসল নায়িকা। সারী তার প্রতিনিধি। সারী ঠিকাদারের চোখ রাঙানী, সাঁওতাল সমাজপতির শাসন

কোন কিছুর পরোয়া করে না। তার দাঁড়ানোর বঙ্কিম ভঙ্গি দেখে অমলও মুগ্ধ হয়। কিন্তু সাঁওতাল পরবের দিন যে মুহূর্তে চরে নবাগত ধূর্ত শিল্পপতি বিমল মুখার্জীর সঙ্গে নব-বিবাহিতা সারীর প্রথম চোখো-চোখি হয় সেই দিনই সারীর জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসে। সারীর উদ্ধত যৌবন বিমল মুখার্জীর মনে প্রবৃত্তির আগুন জেবলে দেয়। মুখার্জী সারীকে মোটা বেতনের চাকরী এবং নানা প্রসাধনের লোভ দেখিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। বনের হরিণ ধরা পড়ে লোভের খাঁচায়। বাঙলায় প্রবাদ আছে—'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। নিজের রূপ-যৌবন সারীর বিপদ ডেকে আনল। দুর্বল মুহূর্তে সারী বিমলের কাছে তার সতীত্ব হারায়। সাঁওতাল সমাজে কুৎসা রটে। তার স্বামী ঘৃণা ভরে তাকে ত্যাগ করে। এদিকে বিমল মুখার্জীর কাছেও বহু ব্যবহৃতা সারী ক্রমেই অসার ও বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। পঞ্চায়েতের সভায় সারী তার স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়ে দেয়। এক রাতে দেখা যায় ত্রস্তা হরিণীর মতো সারী ছুটছে, আর তার পিছনে চাবুক হাতে ছুটছে বিমল মুখার্জী। অপমানে, লজ্জায় কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে কমলমাঝি সাঁওতাল পল্লী ত্যাগ করে।

এত দুর্গতির মধ্যেও সারী কিন্তু তার প্রাণের দেবতা রাঙা ঠাকুরকে ভুলতে পারেনি। তাই উমার সঙ্গে অহীন্দ্রের বিয়ে হলে সারী গোপনে উমার সঙ্গে দেখা করে। উমাকে সারী 'রাঙা ঠাকরুণ' নামে ডাকে। সেই কথা জানতে পেরে এবং বিমল মুখার্জীর কবলে পড়ে সারীর দুর্দশার কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রোধে অহীন্দ্রের মন জ্বলতে থাকে। কালিন্দীর চরে যে জায়গায় সারীর স্বামী অজগর সাপটিকে হত্যা করেছিল সেখানে পৌঁছে অহীন্দ্রের হঠাৎ মনে হয় বিমল মুখার্জীও এমনি এক ভয়ানক অজগর সাপ। প্রকৃতির দুলালী সারীকে সে তিলে-তিলে গ্রাস করছে। সারীকে শেষ দেখা যায় কালিন্দী নদীর নির্জন তীরে। তার দেহ শীর্ণ, মুখে না আছে দীপ্তি, না আছে হাসি। রাঙা বনফুলের অর্ঘ অহীন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বেনা ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে সারী হারিয়ে যায়। বিমলবাবু সারীকে দেখে প্রথমে বলেছিলেন—"মেয়েটির দেহখানি চমৎকার।" সারীর সেই দেহ প্রবৃত্তির দহনে দগ্ধ হয়ে অগ্নি শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার হৃদয় আকুতি অহীন্দ্র এবং পাঠকের মনে করুণ বিপ্রলম্ভের রাগিনী বাজিয়ে চলতে থাকে। তারাশঙ্কর বলছেন—"এরা প্রকৃতির জাতি, মাটির মত, উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনো কখনো ভিতর হইতে প্রলয় অগ্নিশিখা

বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।" সারীর মধ্যে সেই প্রলয় অগ্নিশিখার প্রচণ্ড দীপ্তি বা বিস্ফোরণ আমরা লক্ষ্য করি না। তবে সারীর উপর বিমল মুখার্জীর অত্যাচার অহীন্দ্রের মনে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের আগুন জেবলে দেয়। সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য অহীন্দ্র নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সারীর ওপর বনিক তন্ত্রের শোষণ অত্যাচার অহীন্দ্রকে নতুন জীবনবোধে জাগ্রত করে তোলে।

কালিন্দী ট্রাজেডি ; সে ট্রাজেডি কার ? এবিষয়ে নানা জনের নানা মত। কারো বিবেচনায় এই ট্রাজেডি ইন্দ্র রায়ের, কারণ ইন্দ্র রায়ের সব স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত গোলমাল হয়ে গেছে। কারো মতে সে ট্রাজেডি অহীন্দ্রের, কারণ ক্ষণিকের ভুলে বিবাহিতা স্ত্রী ও জননীর সঙ্গে দেখা করতে এসে কমরেড অহীন্দ্র পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে। আসলে এই ট্রাজেডি উপকাহিনীর নায়িকা সারীর। তার হৃদয়-বীণায় সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে রহস্যময় রূপে ঐ ট্রাজেডি বেজে উঠেছে। আগেই বলেছি, ব্রাহ্মণী নদী এবং কালিন্দীর চর 'কালিন্দী' উপন্যাসের কেন্দ্রগত চরিত্র। সেই আদিম অথচ সুন্দর চর ভূখণ্ডের জীবন্ত প্রতীক সারী। চরের দখল নিয়ে বিবাদে-ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল ইন্দ্র রায়, রঙলাল, মহীন্দ্র, রামেশ্বর, সুনীতি, বিমল মুখার্জী থেকে শুরু করে গ্রামের চাষী এবং ছোট জমিদারেরাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চর কারো ভোগে লাগেনি। অন্ধ নিয়তির মত ঐ চর সবাইকে দুঃখ দিয়েছে ; সবাই হতাশায় ভুগেছে। সারীও না পেয়েছে নিজে সুখ, না দিতে পেরেছে অন্যকে সুখ। সারী চরিত্রটির ক্রমবিবর্তন পাঠক মাত্রকেই অভিভূত করে। সার্থক শিল্পীর লক্ষ্য অল্প কথায় দু-একটি ইঙ্গিতে মানবজীবনের অপরিমেয় রহস্যকে ফুটিয়ে তোলা। জীবনের এমন চিত্র অঙ্কন করা, যা একই সঙ্গে একটি স্থান কাল ও মূল্যবোধের গণ্ডিতে আবদ্ধ, আবার অন্য দিকে চিরকালের। সারী চরিত্রটি তেমনি তুলির দু'একটি টানে আঁকা এক মোহিনী অথচ চিরন্তনী রমণী মূর্তি। সারী সম্পর্কে তারাশঙ্কর অল্প কথা বলেছেন। কিন্তু পাঠক অনুমানের সাহায্যে জিজ্ঞাসার স্থান পূর্ণ করে নিতে পারেন। 'কালিন্দী' উপন্যাসে অহীন্দ্রের মাধ্যমে তারাশঙ্কর যে বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার প্রধান প্রেরণা এসেছে সর্বহারা সারী চরিত্রটির কাছ থেকেই। তাই বলা যায় সারী এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। □

তারাশঙ্করের গান

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে সঙ্গীত বা গীত কোন শব্দটিই সুরকে বাদ দিয়ে গ্রহণীয় নয়। কথা বাদ দিয়ে বরঞ্চ 'গীত' শব্দ দাঁড়ায়, কিন্তু সুর বাদ দিলে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায়। সুতরাং যে সব রচয়িতা শুধু গীতের অবয়ব রচনা করেন, তাঁদের গীতিকার না বলে গীতিকবি বলাই বোধহয় সঙ্গত।

বাঙলার সঙ্গীত জগতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত যে অর্থে গীতিকার আধুনিক বেশিরভাগ গীতিকার কিন্তু সেই অর্থে গীতিকার নন। এঁদের গীতিকবি বা বাণীকার বলাই সমীচীন। 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এও [প্রবন্ধাধ্যায়, অনুঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ, পৃঃ ১৩৪] বলা হয়েছে মনোরঞ্জনকারী স্বরই গীত। তাই যাঁর সঙ্গে স্বরের ব্যাপারই নেই, তাঁকে গীতিকার বলা যায় না।

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নাম। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিষ্ঠা বিতর্কের অতীত। কিন্তু সঙ্গীত জগতে তাঁকে হঠাৎ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিয়েও সকলে নিঃসন্দেহ নন। যেহেতু তিনি তাঁর স্বরচিত কোন বাণীতে সুরারোপ করেন নি, তাই তাঁকে গীতিকবি বলতে পারা যাবে না। অথচ গীতিকবি বলে চিহ্নিত করলেও কবিতার ক্ষেত্রে যে বিচার লাগে, তা তাঁর ছিল কিনা— এ নিয়েও সংশয়কে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। এই জন্য এইসব ক্ষেত্রে সব থেকে উপযুক্ত হল বাণীকার। আমরা অনেক সময় গানের ক্ষেত্রে বলি কথা ও সুর অমুক এবং অমুক কিন্তু সেই অর্থেই কথাকার শব্দটি প্রয়োগ করি না কারণ কথাকার শব্দটি অর্থের দিক থেকে আমাদের অন্য ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

আমরা জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল কবিতার। নাম 'ত্রিপত্র' (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ)। এর মধ্যে যাকে বলে গীতিকবিতা তার সংখ্যা নিতান্তই কম। আখ্যান ভিত্তিক কবিতাই সেখানে বেশি। মাত্র দু' একটি কবিতায় গীতিভাবের প্রকাশ আছে। এগুলির সঙ্গে নজরুলের আধুনিক গানগুলির কথার কিছুটা আদলও খুঁজে পাওয়া যায়। এমনই একটি কবিতা 'অভিমান'।

নীল গগনের পরপারে ওই প্রেমাকুল আঁখি দুটি কার
নীরব ভাষায় কি বলে আমায় নারে প্রাণ বুঝিতে আমার
তবু কেন মোর চিত্ত বিভোর কতনা আদর পেয়েছে সে,
কিশোরী বধূর কত না মধুর ঘোমটার আড়ে চাহনি এ।

পরবর্তীকালে আমরা যে তারাশঙ্কর পাই, তিনি গদ্যকার। পাথুরে রুক্ষ তাঁর ভাষা। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির শক্ত ভিত্তি। কিন্তু সেই রুক্ষ জমিনেও ওয়েসিসের মত মাঝে মাঝে মরূদ্যান দেখা দিয়েছে। কাঁটা ঝোপের থেকে আশ্চর্য ফুলের কুঁড়ি রঙীন পাপড়ি মেলে ধরেছে। এই রকম ঘটনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'কবি'। এই উপন্যাসটির ভাষাতেও প্রথম থেকেই কবিতা সৃষ্টির আয়োজন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার সময় কিছু কিছু গান সংযোজিত হয়েছে। 'কালিন্দী' উপন্যাসখানি যখন নাটকে রূপান্তরিত হল, শুরুই গান দিয়ে। অবশ্য উপন্যাসের শুরুতেও গান ছিল।

লতায় পাতায় পলাশ বনে ফুল ফুটিল রে,
ফুল কে ফোটালে।

শোনা যায় লাভপুরে যখন প্রথম 'কালিন্দী' অভিনীত হয়, এই গানটিতে তখন নজরুল সুরারোপ করেছিলেন। সে সুর আজ বিস্মৃতির অতলে। হয়ত কোন সমসাময়িক মানুষের মনে অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের কারো কারো কণ্ঠে অর্ধবিস্মৃত জনশ্রুতির মত আজ তা থেকে গেছে।

অনেক সময় উপন্যাসের চিত্ররূপায়ণ ঘটার সময়েও গান সংযোজিত হয়েছে। যেমন, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'ডাকহরকরা' ইত্যাদি। উপন্যাস অবস্থাতেও গান ছিল। কিন্তু সেগুলি পূর্ণাঙ্গিক নয়। তারাশঙ্করের স্বরচিত এই সমস্ত গানে যে সুরারোপ হয়েছিল, সৌভাগ্যের বিষয় তার শ্রুতিসুখকরতা কিন্তু সংশয়াতীত।

'কবি' কথাচিত্রে তারাশঙ্করের রচিত গানগুলি সুরে বেঁধেছিলেন প্রখ্যাত সুরকার অনিল বাগচী। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কথাচিত্রের গানে এবং 'ডাক হরকরা' কথাচিত্রের গানে সুর দিয়েছিলেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্ত।

সাধারণত কথা ও সুর একই ব্যক্তির না হলে গানের দুই অংশের রাসায়নিক মিলন সম্ভব হয় না। অর্থাৎ একই উৎস থেকে জাত না হলে কথা ও সুর পরমাণুতে পরমাণুতে মিলিত হয়ে অভিনব এক শিল্পান্তর জন্ম দিতে সক্ষম

হয় না। যে শিল্পানু কথা ও সুরের সম্পূর্ণ তৃতীয় এক মিলিত রূপ। রবীন্দ্রনাথের গানে এই অভিনব তৃতীয়ের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল। কাছাকাছি গেছেন নজরুল। কখনো কখনো অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলাল।

'কবি'র প্রায় সব গানগুলি, 'ডাক হরকরা'র 'কাঁচের চুড়ির ছটা' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র 'গোপনে মনের কথা' গান দুটি যথোপযুক্ত সুরারোপের দ্বারা সার্থকতার সেই কেন্দ্রে না হলেও সার্থকতার বৃত্তের পরিধির ভেতর যে পা রাখতে পেরেছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়।

এই সব গান ছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথকভাবে কিছু কিছু গান রচনা করে গেছেন। 'তারাশঙ্কর রচনাবলী'তে যার একটা অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের খুচরো গানের ভিতর দু'একটি বেশ জনপ্রিয় এবং জনসাধারণের মনোরঞ্জনের ভেতর দিয়ে আজও প্রতিনিয়ত সঞ্জীবিত। একটি হল—

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে
কোন মহাজন পারে বলিতে।

এর পরে যেটির কথা মনে পড়ছে, সেটি হল—

প্রাণের রাধার কোন ঠিকানা
কোন ভবনে কোন ভুবনে,
বলতে পারে কোন সজনী, কোন সজনে।

অবশ্য এই গানগুলির জনপ্রিয়তার অর্ধেক অন্তত সুরকারদের প্রাপ্য।

অপরপক্ষে সুরারোপের বিভ্রাটের ফলে অনেক ভালো বাণীও যে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে তার অনন্ত দৃষ্টান্ত আছে বাঙলা গানের জগতে। জীবনানন্দ দাশের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা এই ধরনের অপচেষ্টার গান হিসেবে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তারাশঙ্করের 'কবি'র একটি গানের দুই সুরের ভেতর একটি হয়েছে যথার্থ সুর, অন্যটি নিঃসন্দেহে অসুর। অনিল বাগচী সুরারোপিত 'কবি'র সেই একই গান যখন অন্য কোন সুরকারের সুর সংযোজনায় শুনি, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি না। এই বাহুল্যের কি প্রয়োজন ছিল বোঝা যায় না। তাছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে 'অধিকারিভেদ'— শাস্ত্রীয় বাণী সব সময়েই মনে রাখা ভালো।

তারাশঙ্করের 'তমসা' গল্পে 'কালা তোর কদমতলা'য় বলে একটি গানের উল্লেখ আছে। 'তমসা' নাটক অভিনয়ের সময় এটিকে তারাশঙ্করের লেখা গান

বলেই উল্লেখ করা হয়। গানটি খুব সম্ভব তারাশঙ্করের লেখা নয়। 'তমসা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৫-৪৬ সালে। আঙ্গুরবালা দেবীর গলায় গাওয়া এই গানটিরই রেকর্ড (GCI) বেরিয়েছিল ইংরেজি ১৯২০ সালে। 'গ্রামোফোন কম্পানী অব ইণ্ডিয়া' থেকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত এই আধুনিক গানটিকে গল্পে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের নামেই গানটি চলতে থাকে।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের লেখা গানগুলি আর এক দিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গানগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ আধুনিক বাঙলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই ব্যাপারে তারাশঙ্করই রয়েছেন প্রথমে।

ইদানীংকালে বীরভূমের কথ্যভাষায় বা আধা-সাঁওতালি ভাষায় গান রচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এগুলিতে চমক দেবার প্রচেষ্টা যতটা রয়েছে শিল্পবোধের প্রকল্প ততটা নেই।

গানের সুরে আঞ্চলিকতা প্রথম শিল্পোত্তীর্ণ হয় নজরুলের গানে। তাঁর আগে আর কারও গানে এই সচেতন প্রচেষ্টা ব্যক্ত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে বাউল সুর ব্যবহার করলেও এটিকে আঞ্চলিক সুর না বলে সাধনসঙ্গীতের সুর বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং গানের বাণীতে পশ্চিমবাঙলার কোন বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত—তারাশঙ্করেই আমরা প্রথম পাই। যেমন—

ক) কাঁচের চুড়ির ছটা ছেঁয়াবাজীর ছলনা।
খ) আমার প্রাণের ব্যায়লা বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে।
গ) পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে
সে জন পাতা নিলে না।
ঘ) শোন পাখিরা গাছের ডালে জোটন বেঁধে
ঝোটন নেড়ে কলকলায়।
ঙ) কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে।

শেষের এই প্রবাদপ্রতিম দৃষ্টান্তটি তারাশঙ্করের গানেরই 'একটি পঙ্‌ক্তি একথা মনে রাখলে বাঙলা গানের জগতে তারাশঙ্করকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আশা করি কেউই কুণ্ঠিত হবেন না। □

নাট্যকার তারাশঙ্কর

পরিমল ঘোষ

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙলা কথা-সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন যশস্বী শিল্পী। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর রচনারাজি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থান লাভ করেছে। তাঁর সাহিত্যে বাঙলাদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় নিহিত রয়েছে। সমকালীন নানা সমস্যা ও তার কালাতিক্রমী ভাবনাও সেখানে ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

গল্প-উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রকাশ পেলেও নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভার অন্য দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কিশোরকাল থেকেই তিনি বাঙলা নাটকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এ সময় (১৯০৫) বীরভূমের লাভপুরে 'বন্দে মাতরম' থিয়েটার স্থাপিত হয় নাট্যরসিক নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। এখানে বেশ ক'টি নাটকের অভিনয় দেখে তারাশঙ্কর পুলকিত হয়ে ওঠেন। তরুণ বয়সে ক'টি নাটকে অভিনয় করেও তিনি বেশ আনন্দলাভ করেন। আত্যন্তিক প্রেরণায় তিনি পানিপথের যুদ্ধ অবলম্বন করে 'মারাঠা তর্পণ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি স্বগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। তারাশঙ্কর মনে মনে রঙীন স্বপ্ন এঁকেছিলেন: "অনেক স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম। রঙ্গমঞ্চের রহস্যপুরীতে প্রবেশাধিকার।" এরপর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এ নাটকের পাণ্ডুলিপি আর্ট থিয়েটার-এর অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অভিনয় করানোর ইচ্ছা নিয়ে দেখান। অপরেশবাবু সে নাটক না পড়েই ফেরত পাঠান। এতে তারাশঙ্কর বিশেষ মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের পথ থেকে।" এরপর দীর্ঘকাল (১৯৪০ পর্যন্ত) তিনি আর কোন নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেননি।

তারাশঙ্কর নাট্যরচনা থেকে দূরে থাকলেও নাটকের জন্য আকর্ষণবোধ ফল্গুধারার মতো তাঁর অন্তরদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তখন নাট্য

নিকেতন-এর স্বত্বাধিকারী প্রবোধকুমার গুহ তারাশঙ্করকে এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং তিনি সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। এ নাটকটি দর্শকগণ কর্তৃক সমাদৃত হলে তিনি একের পর এক নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা হলো দশ এবং একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা দুই। এছাড়াও তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জন্য তিনটি ছোট নাটক ('উমানন্দের মন্দির', 'ডাইনীর মাথা' ও 'অভিশপ্ত') রচনা করেন। এগুলি আকাশবাণীতে প্রচারিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তিনি শিশিকুমারের জীবনী অবলম্বনেও একটি নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি।

তারাশঙ্করের নাটকগুলিকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত নাটক—'কালিন্দী' (১৯৪১), 'কবি' (১৯৫৭), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৬৭) প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, গল্প থেকে রূপান্তরিত নাটক—'দুই পুরুষ' (১৯৪২), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৩), 'চকমকি' (১৯৪৫), 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৬০), 'সংঘাত' (১৯৬২) প্রভৃতি। তৃতীয়ত, মৌলিক নাটক—'পথের ডাক' (১৯৪২), 'বিংশ শতাব্দী' (১৯৪৪), 'যুগবিপ্লব' (১৯৫১), 'কালরাত্রি' (১৯৫৭) প্রভৃতি।

তারাশঙ্কর প্রধানত ঔপন্যাসিক। উপন্যাস-রচনায় পরম সাফল্য তিনি লাভ করেছেন। কিন্তু সেইখানে নাট্যরচনার কিছু ত্রুটিও নিহিত ছিল। ঔপন্যাসিক প্রতিভার সঙ্গে নাট্যপ্রতিভার কিছু স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে। উপন্যাসের বিবৃতিধর্মিতা কাহিনী ও চরিত্রগঠনে সহায়তা দান করে, প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক নিজেই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু নাট্যকার সে সুযোগ পান না। নাটকে সংলাপই প্রাণ। দ্বন্দ্ব ও গতি কাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। নাট্যকারকে নেপথ্যে থেকে কাহিনীগঠনে ও চরিত্রায়ণে যত্নবান হতে হয়। ঔপন্যাসিক বা গল্পকার তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের রূপান্তরিত নাটক বিষয়ে আলোচনার আগে একথাগুলি তাই মনে রাখা প্রয়োজন।

তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত নাটকগুলির মধ্যে প্রথম আলোচ্য 'কালিন্দী'। এ নাটকে উপন্যাসের মূল কাহিনীকে গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি জমিদার-বংশের বিরোধ ও মিলনকে অবলম্বন করে এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই সঙ্গে সাঁওতালদের জীবনের কিছু ঘটনা ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক

ভাবনা এখানে স্থান পেয়েছে। সাঁওতাল-কন্যা সারীর মৃত্যু নাটকে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে যথেষ্ট গতি সঞ্চার করেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন : "কালিন্দী সে সময়ের একটি মঞ্চসফল নাটক যে নাটকের কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্বের স্বাদ আছে।" 'কবি' এই নামের উপন্যাসেরই নাট্যরূপ। এক অন্ত্যজ সন্তানের কবি হওয়ার দুরন্ত প্রয়াস এখানে ফুটে উঠেছে। প্রেম-প্রণয়ের বিচিত্র ভাব ও রূপ এখানে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। নাটকে হাসি-কান্নার অবারিত প্রকাশ দর্শককে আপ্লুত করে রাখার ক্ষমতা রাখে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ নাটক সম্পর্কে বলেছেন : "নাটকটি আমার কাছে একটি করুণ কবিতার মতো উপাদেয়। বার বার উপভোগ করেও আশা মেটে না।" 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে উপন্যাসের কাহিনী কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রদ্যোৎ নাটকে জীবনমহাশয়ের পৌত্র হয়েছে। জীবন-মহাশয়ের বংশের রোগ প্রদ্যোতের মধ্যে সঞ্চারিত করে ঘটনাকে সমস্যা সংকুল ও দ্বন্দ্বমুখর করে তোলা হয়েছে। মৃত্যু-ভয় জয়ের আশ্বাস এ নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্রচিত্রণে নাটকটি বিশেষ সার্থক হয়েছে। তারাশঙ্করের এই নাটকগুলি বিশেষ মঞ্চসফলতা লাভ করেছিল এবং দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তারাশঙ্কর তাঁর গল্প অবলম্বনে বেশ কতকগুলি নাটক রচনা করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে এখানে গল্পের ঘটনাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়াতে হয়েছে, নতুন ভাব-ভাবনার সংযোজনও ঘটাতে হয়েছে। 'দুই পুরুষ' নাটকটি গড়ে উঠেছে 'নটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প অবলম্বনে। প্রাচীনপন্থী জমিদার পিতা ও আধুনিক ভাবধারার পোষক পুত্রের বিরোধ এ নাটকে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। নাটকটি একদা বিশেষ জনসমাদর লাভ করেছিল। 'দ্বীপান্তর' নাটকটি 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্প অনুসরণে রচিত হয়েছে। এ নাটকে জেল-পলাতক নরহত্যাকারী এক লাঠিয়াল কালীচরণের পারিবারিক জীবন-যন্ত্রণার কথা বিবৃত হয়েছে। 'চকমকি' নাটকটি রচিত হয়েছে 'বিষ পাথর' গল্প অনুসরণে। এটি প্রহসনধর্মী রচনা। এক বিপত্নীক বৃদ্ধের অর্থলোলুপতা ও পুনর্বিবাহের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা ও অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই কৌতুকের সঙ্গে এখানে পরিবেশিত হয়েছে। 'সংঘাত' নাটকটি 'পিতাপুত্র' গল্প অনুপ্রাণিত। প্রাচীনপন্থী পিতা ও সংস্কারমুক্ত পুত্রের মধ্যে বিরোধকে অবলম্বন করে এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং পরিণামে

সংস্কারমুক্ত উদার মানবিকতার জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' একাঙ্ক নাটকটি ঐ নামের গল্পের অনুসরণে রচিত। গৃহ দেবতার বিগ্রহ রক্ষার জন্য বৈষ্ণবী রুক্ষভামিনীর অপরিসীম আত্মত্যাগ এ নাটকে অবলম্বিত হয়েছে। তারাশঙ্করের এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে 'দুই পুরুষ' ছাড়া অন্যগুলি তেমন দর্শক-আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি।

তারাশঙ্কর কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা করেছেন। 'পথের ডাক' নাটকটিতে নতুনত্ব কিছু নেই, 'ধাত্রীদেবতা'র একটা ছায়া এখানে লক্ষ্য করা যায়। আদর্শবাদী তরুণ নিখিলেশের সমাজসেবামূলক কাজকর্ম ও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভে নেতৃত্বদান অবলম্বনে ঘটনাবৃত্ত রচিত। 'বিংশ শতাব্দী'-তে জনৈক বিজ্ঞানসাধকের সাধনা, সমস্যা ও পরিণাম রূপায়িত হয়েছে। 'যুগবিপ্লব' নাটকে মারাঠা-শক্তির সংগ্রাম ও বীরত্বপূর্ণ পরাজয় দেখানো হয়েছে। 'কালরাত্রি' একাঙ্ক নাটক। এ নাটকে অলৌকিকতার প্রতি নায়কের অগাধ বিশ্বাস ও প্রেমাতুরা এক নারীর জীবনযন্ত্রনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থাকলেও গভীরতর কোন ভাব বৈশিষ্ট্য ও রীতি প্রকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সবশেষে বলতে হয়, তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন' এই তিনটি নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছে। তাঁর নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে আছে। সংলাপ-সৃজনে তাঁর পারদর্শিতার প্রকাশ ঘটেছে, তবে কোথাও কোথাও সংলাপের আধিক্য নাটকের গতি মন্থর করে তুলেছে। নাটকগুলিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। তাঁর নাটকগুলি সাহিত্যগুণসম্পন্ন বলে তার পাঠযোগ্যতাও স্বীকার করতে হয়। কখনো কখনো উচ্চ ও মহনীয় ভাবের প্রকাশ বিশিষ্টতা মণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু সব নাটক সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না। ট্রাডিশন্যাল থিয়েটারে তাঁর নাটকগুলি এক সময় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল এবং দর্শকরুচিকে বিশেষ ভাবে তৃপ্ত করেছিল। বাঙলা নাট্য জগতে তার অবদান তাই অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। □

আঞ্চলিকতার প্রশ্নে ধাত্রী দেবতা

সাগর বিশ্বাস

বাঙলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে। একদিকে যুদ্ধোত্তর ইওরোপের সার্বিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীন মানসিকতার প্রভাব, অন্যদিকে সোভিয়েত বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের দুর্জয় স্বপ্ন। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার প্রশ্নে সশস্ত্র বিপ্লব ও নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের বিপরীতধর্মী কম্পন। ধ্বংসের সাথে সৃষ্টির, সংগ্রামের সাথে সমন্বয়ের, পুরানোর সাথে নতুনের সেই দ্বন্দ্বমুখর যুগাবর্তের মধ্যে গ্রাম্য জমিদার পরিবারের ছেলে তারাশঙ্কর রাজনীতি ছেড়ে কলম হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ লেখকেরা কেউই সেই যুগান্তরের আর্থ-সামাজিক সংকটের স্বরূপ উন্মোচন করতে পল্লী-বাঙলার বিশিষ্ট পটভূমিকে আশ্রয় করেননি। রবীন্দ্রনাথের গল্প এবং কবিতার মধ্যে বঙ্গ প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ধরা পড়লেও উপন্যাস-গুলি আশ্চর্যজনকভাবে সুজলা সুফলা মাটির রস থেকে বঞ্চিত। রবীন্দ্র উপন্যাসের নগরকেন্দ্রিকতা শরৎচন্দ্রেও আছে, তবু বঙ্গ প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত নয়। যদিও বাঙলার দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ, তার জীবনযাত্রা, সমস্যা ও যন্ত্রণা শরৎচন্দ্রকে যতটা আলোড়িত করেছে, প্রকৃতি ততটা করেনি। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে বাঙলা উপন্যাস পাঠককে সর্বপ্রথম যিনি গ্রাম বাঙলার সবুজ সমারোহের মধ্যে টেনে নিয়ে এলেন, তিনি বিভূতি-ভূষণ। পরে তারাশঙ্কর। কিন্তু বিভূতিভূষণের রোমান্টিক চেতনা বাঙলার শ্যামল সৌন্দর্য ছাপিয়ে পশ্চিমের অমসৃণ প্রকৃতির মধ্যেও যে ব্যাপ্তি লাভ করে, তারাশঙ্করের প্রকৃতি-দর্শন সেই বিশালতার উপলব্ধি দেয়না। তাঁর জন্মস্থান বীরভূম এবং সন্নিহিত বাঁকুড়া পুরুলিয়া এককথায় বাঙলাদেশের রাঢ় অঞ্চলই তাঁর রচনায় মুখ্য স্থানলাভ করেছে। যে কারণে বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র তারাশঙ্করকেই সার্থক আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক বলে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন টমাস হার্ডি। Dorestshire এর Wessex অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, সেখানকার মানুষজনের বিচিত্র আচার আচরণ যেমন একদিকে হার্ডির উপন্যাসের পটভূমি তৈরী করেছে অন্যদিকে মানুষের সেই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য-

গুলিই হয়েছে তাঁর উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য। তাই হার্ডি আঞ্চলিক। আর আমরা ইওরোপীয় সাহিত্য সমালোচকদের অনুকরণে তারাশঙ্করকেও সেই আঞ্চলিকতার 'মুকুট' পরিয়ে দিয়েছি। ভাবিনি যে সাহিত্যে বিশেষ কোন অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবন প্রতিফলিত হলে তাকে আঞ্চলিক বা রিজিওনাল বলতে হবে কেন? ইংল্যাণ্ডে লেক পোয়েটদের (ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রমুখ) লেখায় তো উত্তরাঞ্চলের হ্রদ, তার আশপাশের মানুষজনদের জীবনযাত্রার গভীর ও বিশ্বস্ত প্রতিফলন আছে। তবে কি তাঁদেরও আঞ্চলিক কবি বলতে হবে? তাহলে তো এই বিশ্বের সমস্ত লেখকদেরই কমবেশি আঞ্চলিকতার ছাপ মেরে দেওয়া যায়। কারণ, লেখক তাঁর নিজস্ব পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ করবেন, সেই পরিচিত পরিমণ্ডলের বাস্তব চিত্র সাহিত্যে প্রতিফলিত করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। আর সে চিত্র অঙ্কনে যিনি যত দক্ষ তিনি ততটাই সার্থক রূপকার। একসময় ঋত্বিক ঘটককে 'বাঙালি পরিচালক' হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা ছিল। কেন না, তাঁর ছবিতে বাঙলাদেশ, বাঙালি জনজীবনের মর্মবাণী বিধৃত আছে। কী আশ্চর্য! পদ্মাপারের খাঁটি বাঙাল, দেশবিভাগের রক্তাক্ত শিকার, স্বদেশী আধিপত্যবাদীদের কুটিলতায় বিরক্ত মানুষটি কি যাবেন তুন্দ্রা অঞ্চলের ছবি করতে, যে স্থান ও অধিবাসী মানুষজন তাঁর পরিচিত গণ্ডির বাইরে? হ্যাঁ, একজন বড় শিল্পী তাও পারেন। পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে অপরিচয়ের সীমানা লঙ্ঘন তো শিল্পী সাহিত্যিকেরই কাজ। হার্ডি যদি 'নানুক অব দ্য নর্থ' করতে পারেন, রেনোয়া 'দ্য রিভার', তো ঋত্বিকও পারেন। পারা উচিত। কিন্তু কথাটা সেখানে নয়। কথাটা হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যস্রষ্টা কি তাঁর একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে আহরিত অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করতে পারেন? কেউ হয়তো অভিরুচির কথা বলবেন। কিন্তু উপেক্ষার অভিরুচি অভিপ্রেত হতে পারে না।

আমাদের বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকেরা অনেকেই নানান তাত্ত্বিক কুটকচালি করে তারাশঙ্করকে আঞ্চলিকতার 'অলঙ্কারে' ভূষিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের নির্যাস, তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের পটভূমি হলো বাঙলার বিস্তীর্ণ রাঢ়ভূমি। সেখানকার মানুষের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সংযোগ। সমাজের সেই বাস্তবচিত্র তারাশঙ্করের লেখায় গভীর বিশ্বস্ততায়

প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই রূপচিত্র সমস্ত মানুষের হৃদয় দুয়ারে আঘাত করতে পেরেছে। সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচক শ্রীকুমার সেন লিখেছেন, "অঞ্চলের ছাপ থাকিলেই যে সাহিত্য আঞ্চলিক পদবাচ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। যেখানে মানবমনের মূল সুরটিই এই বহিরাবেষ্টনের প্রভাবে অনন্য রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইবে কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সংজ্ঞাটি দেওয়া চলিবে।" কিন্তু 'মানবমনের মূল সুরটি' যদি 'অনন্য রাগিণীতে ঝঙ্কৃত' হতে পারে তবে তা আর আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে কেন এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে আঞ্চলিকতা ও সর্বজনীনতার বিশ্লেষণ সামান্য পরিসরে করা কঠিন। আঞ্চলিকতার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'কে সামনে রেখে আমরা বিষয়টি কমবেশি বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

নগর সভ্যতার বাইরে বীরভূম জেলার এক অতি সাধারণ গ্রাম লাভপুরে তারাশঙ্করের বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে। পরবর্তিকালে কলকাতার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সারাজীবন প্রাণের টান ছিল সেই গ্রামের প্রতি, গ্রাম্য মানুষ ও সমাজের প্রতি। রাঢ়ের সেই গ্রাম্য সমাজে তিনি যে শুধু জন্মেছিলেন তা নয়, তার মানসিক গঠন ও বিকাশ হয়েছিল সেই সমাজেরই অন্তর্প্রবাহে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তাঁর সহজাত বলিষ্ঠ জীবনবোধকে গভীরতর করে তুলেছিল যার সঙ্গে রাঢ়ের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির আন্তরিক যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছেন "তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য প্রেরণার গঙ্গোত্রীর সন্ধান পেয়েছেন রাঢ়ের গণজীবনে ও গ্রাম্য প্রতিবেশে"। তাঁর জীবনবোধের যে বলিষ্ঠতা, নিঃসন্দেহে তা রাঢ়ীয় সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠতা, ডোম কাহার বাউরি সাঁওতালদের অমার্জিত সাহসী বলিষ্ঠতা।

রাঢ়ের সেই জনজীবন ও জনসমাজের প্রকৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে একদিকে সেখানকার জমিদারগোষ্ঠী যারা অর্থবলে না হলেও বাহুবলে প্রতাপশালী, যারা মনে করে 'বিষয় বাপের নয়, দাপের,' অন্যদিকে রয়েছে গ্রামের আদিবাসী মানুষের সমাজ, যে সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে আদিম কৌম ঐতিহ্যের নানান উপাদান স্তরিত শিলার মতো বিচিত্র বিন্যাসে গ্রথিত হয়ে আছে। হাড়ি বাগদি ডোম বাউরি কাহার সাঁওতাল অধ্যুষিত এই সমাজের উপর তথাকথিত জমিদারেরা অতি সহজেই রাজকীয় প্রতাপ বিস্তার করতে পারে কারণ, এদের

আনুগত্য ক্লীতদাসের মতো অন্ধ, ধর্মবিশ্বাস অটল, আত্মবলিদানের সাহস অপরিসীম। এরই সঙ্গে রয়েছে আউল বাউল বৈষ্ণব আর তন্ত্রসাধকদের আশ্রম। সহজিয়া তন্ত্রসাধনার অন্যতম পীঠস্থান বলে ভৈরবী বৈষ্ণবীরও অভাব নেই। পাশাপাশি আছে মুসলমান ফকিরেরা— তারাও বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাঢ়ীয় জনসমাজের এই বিন্যাস ও সামগ্রিক চেহারার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তারাশঙ্করের সাহিত্য তথা গ্রাম্য সমাজের শিল্প রূপায়ন উপলব্ধি করা সহজতর হয়। কোন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারাশঙ্কর বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হননি। স্বভাবতই চরিত্র চিত্রণে কোথাও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেননি। গ্রাম্যসমাজের মধ্যে যাদের দেখেছেন, প্রকৃত শিল্পীর অন্তর্ভেদী মন নিয়ে তাদের প্রাত্যহিকতাকে অনুভব করেছেন। 'রসকলি'র কমলিনী বৈষ্ণবী, 'কবি'র নিতাই কবিয়াল কিংবা বসন ঝুমুরওয়ালি, 'ডাক হরকরা'র দীনু ডোম, 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'-এর ইন্দ্র রায়, দ্বারিক চৌধুরী, শ্রীহরি পাল, দেবু পণ্ডিত, মিঃ মুখার্জী, শিবশেখর ন্যায়রত্ন, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনোয়ারী, করালী, পরম—কেউই কল্পনার চরিত্র নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। আর 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ তো তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি।

উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে রাঢ়ীয় সমাজ তথা সাধারণ মানুষের রুক্ষ অমার্জিত সাহসী বলিষ্ঠতা বোধ করি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তেই সর্বাধিক বিশ্বস্ততায় পরিস্ফুটিত। এই উপন্যাসে কোপাই নদীর বাঁকে ঝুঁকে পড়া নিচুতলার মানুষ অধ্যুষিত গ্রাম্যসমাজ, তার হাজার রকম সংস্কারের অচলায়তন, যুগ যুগ ধরে আচরিত জীবনমর্ম, নেতৃত্বের দায়বোধ ও ব্যক্তিসত্তার দৃঢ়তার মধ্যেও তার প্রাকৃত যৌনাকাঙ্খা ও হৃদয়াবেগের অনিবার্য প্রকাশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার নিটোল ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে। তার বাঁশবাদির বাঁশ কেবল লাঠিই তৈরী করে না, সুমধুর বাঁশিও বানায়। কঠোরে কোমলে সে কাহিনী অন্ত্যজ মানুষজন ও সমাজের অতি বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে। এই বিশ্বস্ততা আমরা 'ধাত্রীদেবতা'তেও দেখতে পাবো। সেখানে জমিদারবাবুদের জীবনে আধুনিকতার প্রভাবের কথাই কেবল নয়, উপন্যাসের নায়ক যে ধরিত্রীকে ধাত্রী বলে ভাবতে শিখলো সেই ধাত্রী ও তার বক্ষোলগ্ন অমার্জিত সন্তান-সন্ততির জীবনপ্রবাহ পরম সার্থকতায় রূপায়িত। এলাকার ভৌগোলিক ভূমিই শুধু নয়, সে ভূমিতে নির্ভরশীল সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ এবং দুর্ভিক্ষ মহামারী অনাবৃষ্টির সাথে যুদ্ধরত তাদের রিক্ত জীবন, পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর কোঁচার

পত্তন ও তার অসারতা উপন্যাসটিকে এপিকধর্মী করে তুলেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মাটি আর মাটির কাছাকাছি মানুষের যে কলধ্বনি, 'ধাত্রীদেবতা'য় তারই একধরণের প্রকাশ। সেখানে মানুষের চলমান জীবন সমুদ্রের অন্তরালে অবস্থিত নিখিল বসুন্ধরার বিশিষ্ট পটভূমি উপন্যাসটিকে আঞ্চলিকতার সীমারেখায় আবদ্ধ থাকতে দেয় না।

'ধাত্রীদেবতা' নামের মধ্যেই মাটির প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ। মাটির মধ্যেই জীবনের উৎসমূল খুঁজেছেন লেখক যদিও তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন, 'আমার ধাত্রীদেবতায় পিসিমাই আমার ধাত্রীদেবতা', তথাপি এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে ধাত্রীদেবতা বলতে তিনি পিসিমা কিংবা শিবনাথের গর্ভধারিণী জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বোঝাতে চাননি। অন্তত আমরা তা বুঝিনি। জীবনাদর্শের দিক থেকে শিবনাথের উপর এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। পিসিমার চারিত্রিক দৃঢ়তা শিবনাথকে এতটাই প্রভাবিত করে যে শেষ পর্যন্ত তার চোখে পিসিমা ও দেশমাতৃকা একাকার হয়ে যায়। ধাত্রী তথা ধরিত্রীর সেবায় উদ্বুদ্ধ শিবনাথ জেলের দরজায় পিসিমা ও গৌরীর সামনে মনে মনে অনুধাবন করেছে, "সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতী তুমি····আশীর্বাদ কর ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।" পিসিমা তাঁর চোখে বাস্তুর প্রতিমূর্তি। এখানে এই প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকুও মনে রাখা দরকার যে, উপন্যাসটি প্রথমে 'জমিদারের মেয়ে' নামে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ছাপা শুরু হয়েছিল। এবং পিসিমার প্রভাব শুধু তার উপরেই নয়, গোটা পরিবারের উপরেই ছিল অপরিসীম।

কিশোর বয়সে শিবনাথকে প্রভাবিত করেছিল 'আনন্দমঠ'। সে মঠের মধ্যে আনন্দমঠের মায়ের রূপ দেখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার জননী তাকে বুঝিয়েছেন, আনন্দমঠের মাতৃস্বরূপ খুঁজতে হবে মানুষের মধ্যে, লোকালয়ে, উন্মুক্ত প্রান্তরে নয়। তাই শিবনাথ নতুন করে রুগ্ন মানুষের সেবার মাধ্যমে ধাত্রীদেবতার পুজোর নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করে। মায়ের মৃত্যুতে সে রাত্রির ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে অনুভব করে মাটির বুকে লক্ষ কোটি পোকা মাকড়ের মিলিত কণ্ঠ যেন ধরিত্রীরই মর্মসঙ্গীত : "ইহারই মধ্যে শিবনাথ যেন সমগ্র সৃষ্টির জীবন স্পন্দন অনুভব করিল, তাহার চোখের সম্মুখের জ্যোৎস্নালোক প্রতিফলিত অচঞ্চল খণ্ড প্রকৃতি অসীম বিস্তার হইয়া ধরা দিল, ইহারই মধ্যে সমগ্র ধরিত্রীকে সে যেন দেখিতে পাইল। জন্ম-মৃত্যু সমুদ্রমন্থনে উঠিয়া

রহস্যময়ী ধরিত্রী এমনই মনোরমা মূর্তিতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।" অনাবৃষ্টির দুঃসহ আঘাতে সমস্ত সবুজ যখন বিলুপ্ত হতে থাকে, প্রখর উত্তাপে ধরিত্রীর রক্তিম বুক ফেটে চৌচির হতে চায়, তখনও তার সেবায় শিবনাথ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কারণ ধরিত্রীই ধাত্রী, তিনিই দেবতা। জ্ঞানোন্মেষের পর থেকেই শিবনাথ এই ধরিত্রীর সেবা করে এসেছে। তার জীবনকে এই দেবতার পায়ে নিবেদন করেছে। উপন্যাসের বা কিছু সত্য তা এই ধরিত্রীরই সত্য। সে সত্য কি কেবলমাত্র রাঢ় বঙ্গের সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে?

শেষ পর্যন্ত ধরিত্রী, শিবনাথের মনোরম মূর্তিমতী ধরিত্রী 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের মধ্যে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ধরিত্রীর স্বরূপোপলব্ধি কেবল স্বদেশ চেতনায় শেষ হতে পারে? ভাবাবেগে মৃত্তিকাকে দেশমাতৃকা বলে গ্রহণ করা গেলেও জাগতিক চৈতন্য সেই মহাজাগতিক চৈতন্যে উপস্থিত হয় না। তারাশঙ্করও তা চাননি। তিনি ধাত্রীদেবতাকে বন্দে মাতরম মন্ত্রে বন্দনা করেই নিশ্চিন্তি লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা দরকার যে তারাশঙ্কর আদর্শ ও স্বদেশপ্রেমের জন্য বহু আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরিশেষে রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৩১ সালে জেল থেকে বেরোনোর পর বিদায় সভায় বলেছিলেন, "এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয়, আমি সাহিত্যের পথে এই যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।" এবং তারাশঙ্কর তা করেছেন। তাঁর নিজের কথায়, "১৯৩২ সন থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে চৈতালীঘূর্ণী থেকে ধাত্রীদেবতা কালিন্দী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ ও মহিমাকেই প্রকাশ করেছি। তারই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আমার জীবন যুদ্ধের জয়কামনার স্বরূপ।"

স্থানকাল ও পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সমালোচকই মনে করেন যে ধাত্রীদেবতায় লেখকের সেই আদর্শ প্রবণতা যথেষ্টই চরিতার্থ হয়েছে। মা, পিসিমা, রামরতন মাষ্টার মশায়, গান্ধীবাদ ও বিপ্লববাদ, জমিদারিপ্রথা ও সাম্যবাদ এবং সর্বোপরি স্ত্রীর সঙ্গে আদর্শের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শিবনাথের যে উত্তরণ তা চূড়ান্ত আদর্শবাদীতার অম্লান স্বাক্ষর। প্রসঙ্গত এই তথ্যও মনে রাখা দরকার যে 'ধাত্রী দেবতা' রাঢ়ের মাটিতে বসে তারাশঙ্কর লেখেননি। ১৯৩৮ সালে কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে 'শান্তিভবন'

নামক মেস বাড়িতে এর জন্ম যাকে তারাশঙ্কর বলেছেন, "বেশ জায়গা ; একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া। কাহারও উপর কাহারও আগ্রহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের সন্দেহ আছে। এক মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও দরজায় তালা পড়ে। পরিচয়ও বড় কাহারও সহিত কাহারও নাই, যে যাহার আপন আপন ঘরের মধ্যেই থাকে। দেখাশুনা এক হয় সিঁড়িতে, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার বলিয়া এক জায়গায় থাকিয়াও কথা না বলার জন্য চক্ষুলজ্জাও ঘটিতে পায় না। আর দেখাশুনা হয় খাবার ঘরে, কিন্তু সেখানেও হাত এবং মুখ দুই ব্যস্ত থাকে, কাজেই কথা বলাও চলে না—করমর্দন করাও হয় না।" পরে আবার বলেছেন, "শান্তিভবনের কথা এত করে বলছি এই কারণে যে আমার সাহিত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে এইখানে। জীবনের পটপরিবর্তনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই শান্তিভবনে থাকতেই। এখানে প্রায় দেড়বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই 'ধাত্রীদেবতা' রচনা আরম্ভ এবং শেষ 'কালিন্দী' এখানেই আরম্ভ করি।"

'কালিন্দী' আরম্ভ থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যে একটি অন্যধারাও পরিপুষ্ট হয়েছিল। আগেই বলেছি তারাশঙ্কর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যে কংগ্রেস দলকে একদা মনে প্রানে দেশ ও দেশবাসীর মুক্তির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, একটা সময়ে এসে সেই দলের প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিস্ত-বিরোধি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান করে কমিউনিষ্টদের সংস্পর্শে আসেন। পরে এইসংস্রবও পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাজনীতিতে বামপন্থার প্রতি একটা দুর্বলতা তাঁর বরাবরই ছিল (যেমন কংগ্রেসে থাকতে সুভাষচন্দ্রের প্রতি ছিল)। তাঁর 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে সর্বপ্রথম এই মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এবং বলা যায়, 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে যা সূচনামাত্র ছিল 'কালিন্দী'তে এসে তা একটি পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করলো। ইতিমধ্যে নগর-সভ্যতার স্বরূপ তিনি অনেকটাই উপলব্ধি করেছেন। এই কারণেই 'কালিন্দী' থেকে তারাশঙ্কর একটি পরিণত নতুন ধারায় তাঁর সাহিত্য চিন্তা পরিচালিত করেছেন বলা যায়। এখানে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থান, শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই দুটি উপন্যাসের মাঝখানে রচিত বলে 'ধাত্রীদেবতা'ও তাঁর এই বিশিষ্ট মনোভাবের ছোঁয়া থেকে মুক্ত থাকেনি ঃ 'দ্রুততম গতিতে পৃথিবীর সকল দেশে

বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে, এশিয়ায় স্বৈরাচারতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল গণবিপ্লবের কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাতাড়নায়, তুর্কীতে বিপ্লবের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে, সারা ইউরোপে সামাজিক জীবনে একটা বিপ্লব চলিতেছে।' কলকাতার নাগরিক জীবন যাপনের মধ্যে রচিত এ উপন্যাসে নগর সভ্যতার ছায়াপাত তেমন করে না ঘটলেও তাঁর অনুভবে এই বিরাট শহরটা হল একটা শোষণযন্ত্র। এইভাবে শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গ্রাম-গঠন ও দেশ-মুক্তির তীব্র আদর্শবাদের সঙ্গে গণবিপ্লবের বাণীও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়েছে। সেদিক থেকে 'ধাত্রীদেবতা'কে রাঢ়ীয় আঞ্চলিকতার সীমায় চিহ্নিত করলে উপন্যাসের কাহিনী ও ভাবগত বিশালতাকেই খর্ব করা হয়।

তথাপি শিবনাথের মধ্যে যে আদর্শবাদ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কেউ অবাস্তবতার ছোঁয়া অনুভব করতে পারেন। পুরণো সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতি তারাশঙ্করের দুর্বলতাও আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু তিরিশের দশকে এ দেশের হাজার হাজার যুবক যুবতী যে আবেগে দেশ মাতৃকার পায়ে আত্মনিবেদন করেছিল শ্রেণীবৈষম্য নির্বিশেষে, সে কথা মনে রাখলে শিবনাথ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। তারাশঙ্কর নিজেও একদা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় শরিক ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে খুব বড় জমিদার পরিবারের না হলেও মোটামুটি প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশেরই সন্তান ছিলেন তারাশঙ্কর। সমাজবাস্তবতার নিরিখে সামন্তবাদকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নবাগত যন্ত্রযুগ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তযুগের অন্তরঙ্গ সংঘাত তাঁর নজর এড়ায়নি। হাঁসুলী বাঁকের বনোয়ারী ও কবালী তো সেই যুগসন্ধিরই প্রতিনিধি। মাটির প্রতি শিবনাথের আবেগরুদ্ধ ভালবাসার মধ্যে তারাশঙ্করের ব্যক্তি জীবনের আদর্শবাদই প্রতিফলিত। ধাত্রীদেবতার বাকি চরিত্রগুলি মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ। রাঢ়ের সমাজ ও সংস্কৃতির ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে। তার জমিদারী প্রতাপের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্লিষ্ট জীবনের ছবি পরম নৈপুণ্যে আঁকা। অতএব হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মতো আঞ্চলিক উপন্যাস হতে 'ধাত্রীদেবতার'ও কোন বাধা থাকে না। কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি, মর্মবস্তু ও চরিত্র-চিত্রন যখন অঞ্চলের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়, 'মানব মনের মূল সুরটি' যখন অনন্য রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হয়, সমগ্র দেশের আপামর মানুষের প্রাণের কথা হয়ে ওঠে, তখন তার আবেদন হয় বিশ্বজনীন এই সত্য বিস্মৃত হলে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি খণ্ডিত হতে বাধ্য। একদা ফরাসী লেখক বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন,

'Balzac, whom I consider a far g eater master of realism than all the Zolas past present or future.' কারণ, এঙ্গেলস মনে করেন সেকালের অনেক পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদের তুলনায় বালজাক থেকে ফরাসী সমাজ সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞানার্জন করা যায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় সময় ও সমাজ সম্পর্কে এমন জ্ঞানার্জন আমরা তারাশঙ্করের সাহিত্য থেকেও করতে পারি। একথা ঠিক যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও তারাশঙ্কর মূলত খ্যাতিমান তাঁর অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসের জন্য। কথাসাহিত্যের সেই বিপুল সম্ভারে সতর্ক দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে রাঢ়ীয় সমাজ প্রতিবেশের বাইরে সমকালের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের অন্তর্গত বিচিত্র প্রবনতা, সংকট ও আকাঙ্খার অন্তর্ভেদী চিত্রও কিছু কম আঁকেননি। বিষয়ের বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনার নৈপুণ্যে তারা সকলেই স্বমহিমায় দীপ্যমান। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দণ্ডিত আসামীর (পাষানপুরী-যবনিকা) পাশাপাশি দরিদ্র চাষীর জীবন (সন্দীপন পাঠশালা), নাগরিক পরিবেশে নারী-পুরুষের প্রেম ও অস্তিত্ব (একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে, মনি বউদি নট ও নটীদের দৈনন্দিনতা (অভিনেত্রী) যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি লাঞ্ছিত পদানত বঞ্চিত যুবকদের (তামস তপস্যা), জৈব রিপু-অধিকৃত মানুষদেরও (পঞ্চপুত্তলী) দেখেছেন গভীর অভিনিবেশে। তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত উত্তর ভারতের পটভূমিকায় নরনারীর অশ্রুসিক্ত প্রেমের কাহিনী (বিপাশা) যেমন লিখেছেন তেমনি যদুনাথ সরকারের Fall of the Mughal Empire অবলম্বনে ঐতিহাসিক রোমান্সও লিখেছেন (গন্ধাবেগম)। তাঁর 'কীর্তিহাটের কড়চা'র মধ্যেও কল্পনার পাশাপাশি ইতিহাস খোদ রাইটার্স বিল্ডিং থেকে মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যশ, ধর্ম ও কামাগ্নির তাড়নায় মানুষের বিপর্যয় (আগুন) এবং তথাকথিত ধর্মের আড়ালে কামনার লেলিহান শিখাও (রাধা) তাঁর দৃষ্টির অগোচর ছিল না। বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ যেমন তাঁর গায়ে লাগে (পদচিহ্ন যুদ্ধোত্তর কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বদলে যাওয়া জীবনও তেমনি তাঁকে বিচলিত করে (মন্বন্তর, মহাশ্বেতা, ফরিয়াদ)। ভারতীয় ধর্মাদর্শ ও মানুষের শাশ্বত জীবনজিজ্ঞাসার (সপ্তপদী) পাশাপাশি মৃত্যুজিজ্ঞাসাও (আরোগ্য নিকেতন) তাঁর উপন্যাসের ভাবসত্য হতে পারে। ১৯৩৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় রশিদ আলি

দিবসকে কেন্দ্র করে লেখা 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (পরে কালবৈশাখী) কিংবা শহরের দরিদ্র মুসলমান ও খ্রীস্টান বস্তীর পটভূমিতে লেখা 'কাম্না' তাঁর সময় সচেতনতারই স্বাক্ষর বহন করে। এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে লিখেছেন 'ছায়াপথ'। 'কালান্তর' ও 'কালরাত্রি'তে দেখিয়েছেন ভারতীয় মূল্যবোধের সাথে নবাগত বিদেশি মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। তাঁর কলমে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা ও হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের তিন প্রজন্মের কাহিনী যেমন গ্রন্থিত হয় (নবদিগন্ত) তেমনি পূর্ববাঙলার মুক্তি সংগ্রাম, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যালীলা এবং সত্তর দশকের অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গও উঠে আসে গভীর বিশ্বস্ততায় (১৯৭১)।

'ধাত্রীদেবতা'য় অনাবৃষ্টি ও মড়কের দুঃসহ স্থানিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বকালের মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এমন একজন বহুদর্শী ও দিগন্তবিস্তারী কথাসাহিত্যিককে শুধু রাঢ়ীয় আঞ্চলিকতার লক্ষণরেখায় আবদ্ধ করা যায় কী? আমার মনে হয়, পল্লীবাঙলার বিশিষ্ট পটভূমি এবং বিশ শতকের নাগরিক জীবনযন্ত্রণা ও বহুমুখী সংকটের প্রেক্ষিতে এঙ্গেলসের উপরোক্ত উক্তিটি তারাশঙ্কর সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য হতে পারে। □

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সময়ের নিখুঁত ছবি

কিন্নর রায়

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র উৎসর্গপত্রে ছাপা আছে —

পরম শ্রদ্ধেয়
কবি কালিদাস রা.
শ্রদ্ধাস্পদেষু
দাদা,

রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে।

ইতি
তারাশঙ্কর

লাভপুর, বীরভূম
আষাঢ়, ১৩৫৫

গ্রন্থপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র এয়োদশ সংস্করণ বেরোয় ১৩৯১-এর জ্যৈষ্ঠে। তখন দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা। আমার হাতের কাছে ঐ সংস্করণেরই বই আছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ফিরে পড়তে পড়তে আবিষ্কার করি :

১ এ বইয়ে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসেছে কাহারদের উপভাষা, বৃত্তি।

২. কিন্তু খাদ্য বা পোশাক সে ভাবে আসে নি। যা দেখা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়।

বাঘ, গুলবাঘা, ভালুক, বুনো শুয়োর, কুমির, ঘড়িয়াল, চন্দ্রবোড়া ও অন্যান্য সাপ—এইসব হিংস্র প্রাণীর কথা। আর আছে হনুমানদের নিয়ে নানা বিবরণ।

৪. কাহারদের গোত্র ঘোড়া বা অশ্ব। 'বাহন গোত্র' ও বলা হয় এদের।

৫. নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ।

৬. সুচাঁদ ব্যাঙ দেখে ভয় পায়।

৭ স্থানীয় নানা লোক কাহিনী।

ক) 'সেই থমথমে মজলিসে সুচাঁদ আবার আরম্ভ করলে—এই বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। ওই চৌধুরীরা তিন পুরুষ আগে তখন গেরস্ত, সাহেবদের নীলকুঠির গোমস্তা। কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা। সেবার এল কোপাইয়ের 'পেলয়' বান। সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই, বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুর বেলা থেকে ভাসতে লাগল কোপাই। রাত এক পহর হতে হতে তুফান! 'হদের' পুকুরের শাহী পাড় পর্যন্ত ডুবে গেল। নীল কুঠির সায়েব মেম গাছে চড়ল তারপর সমস্ত রাত হড় হড়-হড়-হড় বান চললই। চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি। আর ঝম-ঝম জল। সে রাত যেন আজ পার হয়ে কাল হবে না। এমন সময়, রাত তখন তিন প্রহর চলছে,—হাঁসুলী বাঁকের অনেক দূরে নদীর বুকে যেন আলো আর বাজনা আসছে বলে মনে হ'ল। দেখতে দেখতে পঞ্চশব্দের বাদ্যি বাজিয়ে নদীর বুক 'আলোকীয়ী' করে এক বিয়ে সাদীর নৌকোর মত নৌকো এসে লাগল হাঁসুলী বাঁকের দহের মাথায়। সায়েব দেখেছিল—সে ঝাঁপিয়ে নামল জলে। মেম বারণ করলে। সায়েব মানলে না। তখন মেম আর কি করে। মেমও নামল। সায়েব এক কোমর জল ভেঙে চলল নৌকো ধরতে। হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কত্তা। বলতে কাঁটা দিয়ে উঠেছে গায়ে। সত্যিই শিউরে উঠল সুচাঁদ। এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে, পরণে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম—কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বললেন—কোথা যাবে সায়েব? নৌকো ধরতে? যেয়ো না, ও নৌকো তোমার নয়। সায়েব মানলে না সে কথা। বললে—পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা! কত্তা হাসলেন,—বেশ, ধরাঙ্গা তবে নৌকো। বাস, যেমনি বলা, অমনি সায়েব মেমের এক কোমর জল হয়ে গেল অথৈ জল। সঙ্গে সঙ্গে, এক ঘুরণ চাকিতে পাক দিয়ে ডুবিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে গেল সেঁ করে। চৌধুরী ছিল সায়েবের কাছেই আর একটা ডালে বসে। কত্তা এসে তাকে ডাকলেন—নেমে আয়। চৌধুরী তখন ভয়ে কাঁপছে। কত্তা

হেসে বললেন—ওরে বেটা, ভয় নাই, নামু। তুই ভুবাবি না। বললে না পেত্যয় যাবে বাবা—চৌধুরী নামল, তো এক হাঁটুর বেশি জল হল না। কত্তা হাসলেন, তা'পরে আঙুল দেখিয়ে বললেন—নৌকো লেগেছে দেখেছিস? ও নৌকো তোর। আমার পুজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথিকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী; তোকে দিলাম। যতদিন আমার কথা মেনে চলবি—উনি অচলা হয়ে থাকেন। অমান্যি করলে ছেড়ে চলে যাবেন, আর নিজেই ফলভোগ করবি। তাকেই—সেই কত্তাকেই এত হতচ্ছেদা। মা-লক্ষ্মী তো গিয়েছেন। অধর্মের তো বাকি নাই। শেষ মেষ সেই কত্তার থানেই খুঁতো, কুকুর ধরা, এঁটো পাঁঠার পুজো! এতে কি আর দেবতা থাকেন!' [পৃ—১৩]

থ 'বাবা কালরুদ্দু—কর্তা ঠাকুরের উপরওয়ালা—বাবাঠাকুরের বাবা। নারায়ণের যেমন নারদ, বাবা কালরুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়ামাথা গেরুয়াপরা খড়ম পায়ে দণ্ডহাতে কর্তাঠাকুর। কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম, কালরুদ্রের হুকুমের মরণ বাঁচন। গতবারে গাজনের ঠিক পনেরদিন পরেই বাবা কালরুদ্দের প্রধান ভক্ত মারা গিয়েছে। প্রধান ভক্তই চড়কের পাটার গজালের ডগায় শোয়, সে-ই দুহাতে আগুন ফুলের 'আজলা' অর্থাৎ অঞ্জলি নিয়ে চাপিয়ে আসে বাবার মাথায়, সে-ই নাচে আগুনে ফুলের উপর। মড়ার মাথা নিয়ে তাকেই খেলতে হয়। নিজের অনেক পুণ্য—তার অনেক বেশি দেবতার দয়া না থাকলে কালরুদ্রের প্রধান ভক্ত কেউ হতে পারে না। এবার সেই প্রধান ভক্তের খালি ঠাঁইয়ে বনওয়ারী গিয়ে শোবে। সংকল্প দৃঢ় করে ফেললে সে। বাবা কালরুদ্দের প্রধান ভক্ত চিরকাল হয় নীচজাতের লোক। সে আদ্যিকালের বাণ গোঁসাইয়ের কাল থেকে। সুচাঁদ পিসি বাণ গোঁসাই-য়ের কাহিনী বলে। বাণ গোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্দের ভক্ত। মদ খেত, 'মাস' খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিত, গাজনে সন্ন্যেস করতে কখনও ভুলত না। সন্ন্যেস করে আগুনের আঙরের ওপরে বসে বাবাকে ডাকত, লোহার কাঁটার শয্যেতে 'শয়েন' করত, সোনা রুপো হীরে মানিকের গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিম্বা 'আস্তি' কিম্বা দিন গলা বাজিয়ে বম বম করত, বাবার নাম গান করত। 'শিবো হে—শিবো হে—শিবো হে।' বাবার দয়াও তাঁর ওপর খুব।

পিথিবীর 'আজা আজড়া' থেকে দেবতারা পর্যন্ত বাণ গোঁসাইয়ের সঙ্গে এ'টে উঠত না। গোঁসাইয়ের একশো পরিবার। একটি মাত্র সন্তান—তাও কন্যে; কন্যের নাম রুষা অর্থাৎ ঊষা। সেই রুষাকে দেখে নারায়ণের নাতির মন টলল। নারায়ণের নাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বাণ-গোঁসাইয়ের বাড়িতে রুষাবতীর ঘরে। বাণ-গোঁসাই জানতে পেরে বলে—কাটব নারায়ণের নাতিকে। নারায়ণের আসন টলল, মুকুট লড়ল। নারায়ণ বললেন, নারদ আসন কেনে টলে, মুকুট কেনে লড়ে, গুণে দেখতো? নারদ খড়ি পেতে গুনে বললেন বিবরণ। নারায়ণ ছুটে এলেন, গোঁসাইয়ের বাড়িতে হানা দিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই। পিথিবী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগল, মাটির বুক ফেটে জল উঠতে লাগল, আকাশের তারা খসে পড়ল, 'ছিষ্টি গেল গেল' রব উঠল। নারায়ণ 'চক্র' নিয়ে কেটে ফেললেন বাণ-গোঁসাইয়ের হাত পা। তবু গোঁসাই হারে না, মরে না, মরে —আবার বাঁচে। তখন এলেন বাবা কালরুদ্দু। আর নারায়ণ—হরি আর হর, হরি আর হরের মিলন হল। বাবা কালরুদ্দু মাঝে প'ড়ে রুষাবতীর সঙ্গে নারায়ণের নাতির বিয়ে দিলেন। হরি বললেন, বাণ-গোঁসাইকে—তোমাকে আমি বর দোব। বর লাও। তোমার কাটা হাত-পা জোড়া লাগবে, তোমাকে পিথিবীর আজা ক'রে দোব। বাণ-গোঁসাই বললেন—না। কাটা হাত-পা আমি চাই না। আজাও আমি হব না। বর যদি দেবে তো বর দাও বাবা কালরুদ্দুর সাথে সাথে আমার যেন পুজো হয়। আমার জাত-জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাড়া বাবার গাজনে ভক্ত যেন কেউ না হয়। হরি-হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোঁসাইয়ের হাত-পা নাই, কেবল ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু। আর সেই কারণে বাণ-গোঁসাই আর 'কালরুদ্দুর' ভক্ত দেবতা। আগে বাণ-গোঁসাইয়ের পুজো হবে, তবে বাবা পুজো নেবেন। সেই কালরুদ্দুর বাবার দয়াই তাদের সম্বল। সেই ভরসাতেই কালরুদ্দুর পুজোয় তারা নির্ভয়ে দেবকাজে এগুতে পারে, নইলে তাদের পুণ্য কতটুকু?' [পৃ—১২৬]

'নসুবালা' নামের আশ্চর্য কিম্পুরুষ চরিত্রটি। এই চরিত্রটি এ উপন্যাসের অন্যতম সম্পদ। তার পরিচয় দিতে তারাশঙ্কর লিখেছেন—

'নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গীতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত।

মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছাবি পরে, মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়োয়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্দনপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট—গান গায়, নাচে। গান আর নাচ—এই তার সবচেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাজোর নাচনে সেই মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গে সে ব্রত-পার্বণ করে। করালীর ঘরে সেই গৃহিণী। করালী বিয়ে করা বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, বউ তার পছন্দ হয় নি, সে আবার বিয়ে করবে। নসুরও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নসুও বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আর বিয়ে করবে না। পাড়ার বিয়েতে নসুবালাই বাসরে নাচে, গান গায়। শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে যে কোন ঘরে ধুমধামের বিয়ে হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর দেয়। নসু খোঁপা বেঁধে আলতা প'রে, রঙিন শাড়ি পরে, কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে অর্থাৎ টিপ পরে রওনা হয়, আবার উৎসব মিটলে ফেরে। করালীর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে। [পৃ—৫৮]

এই উপন্যাসের ২৫১-২৫২ পাতায় পাই টর্নেডোর বিবরণ। তারাশঙ্কর লেখেন,

'পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখে বনওয়ারীর বুকের ভেতরটাও গুর-গুর করে উঠল। চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয়স্তম্ভের মত বিরাট এবং গোল—দেবহস্তীর সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ সোঁ সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে পালাও পালাও। ওর মধ্যে পড়লে রক্ষে নাই। আছড়ে পড়বে মাটিতে, দমবন্ধ ক'রে মেরে মাটিতে কাদার মত ছেঁচে তার মধ্যে আধ-পোঁতা করে দিয়ে যাবে। মাঠসুদ্ধ লোক ছুটে পালিয়ে গেলে উত্তর মুখে; বনওয়ারীও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জাঙালের জামবনের আশ্রয়।

'দেবলোকের হাতী ইন্দ্ররাজার বাহন। জল যেন ইন্দ্ররাজা। হাতীতে চ'ড়ে মহারাজ মেঘের সাত সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান, তার বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে ছিটিয়ে দেন চারিধারে—ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজ হাতের 'ডণ্ড'—তার নাম 'বজ্রদণ্ড' অর্থাৎ বজ্রদণ্ড, সেই দণ্ড দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করেন। তা থেকে ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি। কড়-কড়-কড়-কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে। কখনও কখনও পাপী তাপীর উপর এসে পড়ে সেই বাজ। পাপী

শুধু মানুষই নয়, গাছপালা পশুপাখি কীটপতঙ্গ—সবার মধ্যেই পাপী আছে। কখনও কখনও ইন্দ্ররাজার ভাই পবনদেবও তাঁর সঙ্গে বার হন—এই ছিল নিয়ম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে হাতীটা ক্ষেপে উঠে পিলখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে কাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সাত সমুদ্রে। তখন মেঘ কালো হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, দিন বুঝি রাত হয়ে গেল। তখন সেই ক্ষ্যাপা হাতী নামিয়ে দেয় তার লম্বা শুঁড় মাটি পর্যন্ত, দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে। যেদিকে যায়, সে দিকে এমন জল দিয়ে যায় যে, মাঠ-ঘাট ভেসে সে এক প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়। ধুয়ে মুছে ধান উপড়ে আল ভেঙে তাণ্ডব ক'রে তোলে। মাইতো ঘোষ বলেন—জলস্তম্ভ।'

বাজার দর : [পৃ—২৫২]

১. যুদ্ধের আগে ধানের মণ চার টাকা থেকে আট টাকা।
২. চালের মণ ষোল টাকা। যুদ্ধের বাজারে ধানের মণ চব্বিশ টাকা। মণ চল্লিশ টাকা।
৩. খড়ের কাহন চল্লিশ টাকা। শেষ-তক দুশো টাকা উঠবে।
৪. চার পয়সা সের দুধ (যুদ্ধের আগে)
৫. সাড়ে আট গণ্ডা বাঁশ এক টাকা (যুদ্ধের আগে)। যুদ্ধ লাগার পর সেই বাঁশই টাকায় আটটা থেকে দুটো হয়ে গেল।

খাবার দাবার :

চাল—বাদশাভোগ, কনকচুর, রামশাল, সিঁদুরমুখী, নয়ানকলমা, হাতিঠেলা। সন্দেশ, মদ, কলমি শাক, সুষনি শাক, পানিফল, পাকাল মাছ, গুড়, মুড়ি আলু, পাঠার মাংস, হাঁসের মাংস, বরবটি, ঘেসোমুগ, গোসাপ, ইঁদুর, পাট বুনো শুয়োর, নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত, শিউলি পাতার রস (জ্বরে)

পাল্কি বিষয়ে লেখক জানান—

'যে কালে তারা ছিল কুঠির দরবারের গোলাম, সে কালে দেশে বড় বড় বাড়িতে ছিল মতির ঝালর দেওয়া কিংখাবে মোড়া পাল্কী, পাল্কীর ডাণ্ডে থাকত রুপোর মকর মুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ।' [পৃ-১৭৮]

২. 'বিয়ে সাদীতে পাল্কী নিলে মাছ দিতে হয়! জ্ঞান-গঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী নিলে সিধে দিতে হয়—ঘি-ময়দার সিধে। এগুলি বহন করে নিয়ে যায় কাহাররাই।' [পৃ—১৮০]

এভাবেই বাঙলাভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক আমাদের দেশ, মানুষ, রীতি-আচরণ, সংস্কৃতি তুলে ধরেন তাঁর উপন্যাসে। যা বারবার সময়ের নিখুঁত ছবি হয়ে সামনে আসে। □

বসন্ত উৎসব-দোল পূর্ণিমা

সচিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪০ সালে পিতা তারাশঙ্করের সঙ্গে আমরাও কলকাতার বাসিন্দা হয়েছিলাম —বাগবাজার, আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে। সাধক শিল্পী যামিনী রায়ের পড়শী হয়েছিলাম। তিনি থাকতেন আমাদের দেওয়ালের ওপাশে, আর সামনেই ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার বিরাট-ছ-তলা আকাশ ছোঁয়া বাড়ি আর ছাপাখানা।

ইঁট পাথরের দেওয়ালে বন্দী কলকাতা শহর দেখে পল্লীগ্রাম থেকে আসা সদ্য এক যুবকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও মাঝে মাঝে যেন দমবন্ধ হয়ে আসতো। একটু আকাশ-গাছপালা দেখবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

১৯৪৯ সালের রথের দিন—টালাট্যাঙ্কের ঠিক কোলঘেঁসে শ্যাম সবুজে ঘেরা এই অঞ্চলের মধ্যে ছোট্ট একটি অর্ধ-সমাপ্ত দোতলা বাড়ির বাসিন্দা হলেন তারাশঙ্কর—সঙ্গে আমরাও সকলে তাঁর পরিবারের মানুষজন; ঠিকানা হল ১৭১ নং সি. সি. ও. এস। বছর খানেক আগে এই অঞ্চলেই বেলগাছিয়ার দিকে বাড়ি করেছেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এবং তাঁর পাশেই এসেছেন গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চারিদিক খোলা, উন্মুক্ত নীল আকাশ, প্রচুর গাছপালা, অফুরন্ত জল এবং ভয়ানক মশা। আমাদের বাড়ির সামনেই বিশাল মাঠ, কলকাতা আর্মড পুলিশের বসতি, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত টালির ঘরে তাদের কর্মযজ্ঞ।

তাদের বাগান অথবা কর্পোরেশনের বাগান কোনটি বেশি ভাল, তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। আমাদের চোখের সামনে ফুটে থাকত নানাবর্ণের মরশুমী ফুল আর অজস্র গাঁদা চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আর গুচ্ছ গুচ্ছ রঙ্গকরবী। হঠাৎ একদিন সমস্ত এলাকাটা যেন ফুলে ফুলে কচি পানায়, লাল, হলুদ, বেগুনী, গোলাপী ফুলে ফুলে রঙ্গীন করে দিত, মনে চুপিচুপি খবর দিয়ে যেত—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

এই পরিবেশে আমাদের নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এসেছিল, জীবনযাত্রায় নতুন স্বাদের আস্বাদ পেয়েছিলাম।

ক্রমে ক্রমে রাস্তার দুপাশেই বসতি গড়া শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলতে

লাগল বৃক্ষ নিধন পর্ব। বড় বড় দেবদারু, বট, শিমুল, নারকেল কাঠবাদামের গাছগুলির অনেকে ধরাশায়ী হলেন—বনস্পতির অপমৃত্যু ঘটতে থাকল—মানুষের প্রয়োজনের দাবী সবচেয়ে জরুরী।

পার্কের ওপাশে আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে বাড়ি করলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তাঁর ভাড়াটে হলেন নীরেন চক্রবর্তী পাইকপাড়ার দিকেও তখন এসেছেন গৌর কিশোর ঘোষ, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, বিমল কর, নরেন মিত্র, অন্নদা মুন্সী থাকেন ৩৩ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের বড় বাড়ির এক অংশে। সব মিলিয়ে টালা, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়ার এই অঞ্চলটি সাহিত্য কর্মীদের একটি মস্ত আসরে পরিণত হয়েছিল। এঁদের সকলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রীতিপূর্ণ বিচিত্র পারিবারিক পরিবেশ। কাজে কর্মে, বিপদে আনন্দে সকলেই আছেন একসঙ্গে। ঐ পরিবারের মুখ্য ব্যক্তিটি ছিলেন 'তারাশঙ্কর'। ওঁরাই সকলে ওঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন।

বৎসর বৎসর আসে বসন্ত পূর্ণিমা—হোলিখেলা চলে আসছে বহু অতীত কাল থেকেই। এবারও সামনেই রয়েছে সেই দিনটি—মনের মধ্যে ঢেউ উঠেছে আনন্দের, স্মৃতির বেদনায় ভারী হয়ে আসবে যাঁরা একদিন এই দিনটিতে তারাশঙ্করের আশেপাশে ঘিরে থাকতেন, বুক মথিত করে দীর্ঘশ্বাস আসবে। কানে ভেসে আসবে দূরাগত সমবেত সঙ্গীতের সুরতরঙ্গ—

"ওরে গৃহবাসী, খোলদ্বার খোল, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।"
দ্বার খোল্, দ্বার খোল"…

গান গাইতে গাইতে ফাগে রঙে রঙ্গীন হয়ে ওইতো ওঁরা আসছেন—সার্কাস ময়দান পার হয়ে পশ্চিমের দিকে অর্থাৎ তারাশঙ্করের বাড়ির দিকেই আসছেন ওঁরা। ওইতো সামনেই রয়েছেন মুন্সীদা। গলায় ঢোল, পরেছেন চটের বস্তা আহা কি বিচিত্র রূপ—মাথায় একটা তালপাতার টুপি, দক্ষিণাদাকে প্রায় কাঁধে তুলেছেন গৌরদা আর গৌরীদা, নীরেনদা গাইছেন— ওরে গৃহবাসী, মুন্সীদার সঙ্গে। গম্ভীর নারাণবাবুও হাসতে হাসতে চলেছেন। অরবিন্দ মানে ঢুলুদার ফর্সা মুখটা লালকালোতে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

তারাশঙ্করের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওঁরা গান ধরলেন 'এবার সবাই

জয়হিন্দ বল—জয়হিন্দ জয়হিন্দ বলে তারাশঙ্কর-বাড়ি চল।' সমস্ত রঙীন দলটি এসে পৌঁছত তারাশঙ্করের বাড়ির দরজায়। তারাশঙ্কর খালিগায়ে দরজা খুলে দুহাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাতেন—এস। এস। ভেতরে এস। রাস্তার থেকে উঠে এস। আমার ঘরের জিনিষগুলি একটু রঙীন হয়ে উঠুক না!

এরপর হতো তারাশঙ্করের সঙ্গে ফাগের পারস্পরিক আদান-প্রদান —লেখক এবং তাঁর লেখার জায়গাটা রঙীন হয়ে উঠতো।

গৌরীদা মানে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর লেখায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে গেছেন তাঁর একটি বইতে। ওদিক থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের সকলের মিলিত হবার জায়গাটাও ছিল গৌরীদার বাড়ি আর গৌরীদা ছিলেন তারাশঙ্করের বিশেষ স্নেহের পাত্র, যেন আমাদের বাড়িরই একজন। গৌরীদা লিখছেন:

"একটা পুরনো দোলের পট আঁকি। ধরুন ১৯৫৫-৬৫ সাল—যখন পাইকপাড়ায় সবুজের ইশারা ছিল দিক-বিদিকে। বসন্ত আসার খবর পলাশে-শিমুলে রাঙা হয়ে ফুটে থাকতো আকাশের পটভূমিতে। সেই সময়ে টালা থেকে পাইকপাড়া পর্যন্ত মহল্লায় বিচিত্র এক যৌথ পারিবারিক পরিবেশ রচিত হয়েছিল। অনেকে যেমন পয়সা খরচ করে শান্তিনিকেতনে দোল বা বসন্ত উৎসব দেখতে যান, অতদূর না গিয়ে আমরা প্রকৃতির আমন্ত্রণে টালাপার্কের [illegible] যখন তখন পাক দিতাম।

শান্তিনিকেতন থেকে আমার এক বন্ধু ফিরে এসেছিলেন হতাশার বেদনা নিয়ে। তিনি বললেন, 'সবই ভালো দাদা। নাচ গান ছন্দ—অপূর্ব। কিন্তু আমাদের গায়ে কেউ একটু ফাগও দিল না। আমরা যেন উৎসবের বাইরের অস্পৃশ্য জীব। যখনই মনে হয় উৎসব থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে তখনই খারাপ লাগে। এই সময়েই মনে পড়ে, একাকী গায়কের নহে ত গান। কই আশ্রমের বাসিন্দারা ত কবির সে-কথা মনে রাখেননি।'

বন্ধুর এ-কথা থেকেই পাইকপাড়ার সেই রঙিন দোলের ছবিটা জেগে উঠল।

সকাল হতে-না হতে গৌর আর শিব দু'জনে এসে গেলেন। গৌরকিশোর ঘোষ এবং শিবনারায়ণ রায় তখন একই বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন, আমাদেরই খুব কাছাকাছি। এলেন মুন্সীদা তাঁর দল নিয়ে। শিল্পী অমদা মুন্সীকে যিনি কাছাকাছি থেকে না দেখেছেন তিনি এই মানুষটির অমেয় প্রাণ-প্রাচুর্যের কোনো

খবরই পাননি। মুন্সীদার গলায় ঝুলছে ছোট একটি ঢোলক। সঙ্গী আছেন রঘুনাথ গোস্বামী, দিলীপ, নীলু এবং আরও দু-তিন জন—সকলের কাছেই কিছু-না-কিছু বাদ্যযন্ত্র।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ যাত্রা শুরু হল। প্রথমে দক্ষিণাদার বাড়ি। দোতলার বন্ধ দরজা গান দিয়েই খোলানো হল। 'আজি রঙে-রঙে রাঙিল আকাশ।' বৌদি-দাদাকে আবীর দিয়ে—দাদাকে সঙ্গী করে আমাদের অভিযান। পথে বাজার পড়ল। এক গুচ্ছ সজনে ডাঁটা নিয়ে, সাজানো রাজা গৌরের গামছা-মোড়া মাথায় গুঁজে দিয়ে মুকুট বানানো হল। আর পরনে ত তার চটের আলখাল্লা ছিলই। এবার নরেন মিত্র। সে-বাড়িতে মিষ্টান্ন জুটলো। নরেন-ধীরেন আমাদের দলভারি করলেন।

এরপর মধ্য পাইকপাড়ায়। আছেন নারায়ণ চৌধুরী, নীরেন চক্রবর্তী, বিমল কর, চিত্ত সিংহ, অরবিন্দ মুখার্জি, (তিনি তখনও সিনেমা ডিরেক্টর হিসাবে খ্যাত হননি) দেবব্রত সুরচৌধুরী। সব বাড়ির দরজাই বন্ধ ছিল প্রথমে। 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' বলে অকপট আবেদনে সাড়া আদায় করে আমরা যখন বড় রাস্তায় ফিরলাম দলটি ক্ষুদে বাহিনীর আকার ধারণ করেছে।

কেউ অবাক হয়ে দেখছেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণা বসুকে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে! কেউ অবাক কট্টর সমালোচক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের এই মূর্তি দেখে। তাজ্জব খবর। এর মধ্যে স্থানীয় আভিজাত্য ফেলে দিয়ে ডাক্তার সোমও জুটে গেছেন।

সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দেবব্রত সুর চৌধুরী আর নীরেন্দ্র তাঁদের দরাজ গলায় গান দিয়ে। চলছে মিছিল। মিছিলে নতুন গানের সংযোজন হয়েছে। দেবু চলতে চলতেই গান বাঁধল, 'মন একবার জয়হিন্দ বল। জয়হিন্দ, জয়হিন্দ বলে তারাশঙ্কর বাড়ি চল।' সবাই গাইছে। নাচের তালে হাত-পা তুলে উচ্ছ্বাসেও কেউ কুণ্ঠিত নয়।

তারাশঙ্করের বাড়িই হল আমাদের শিবির। সেখানে যাবো। পথে তাঁর জামাতা শান্তিশঙ্করকেও (শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়) পাওয়া গেল। তারাশঙ্করের জামাতা কবি, সুরসিক। শান্তিও গানের সুরে 'তারাশঙ্কর-বাড়ি'র ধুয়োতে কণ্ঠ সংযোগ করতে দ্বিধান্বিত নন।

বিলের পাশ দিয়ে মিছিল চলল। কে দেখছে, কি মন্তব্য করছে—তা শোনার

দরকার নেই। আবীরে আবীরে মেখানো হয়েছে। পথিককে আবীর মাখানো হচ্ছে। হাওয়াতে ফাগ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এমনি করে আমরা তারাশঙ্করের বাড়ির সামনে এসে থামলাম। গান কিন্তু থামল না।

দরজা খুলে গেল।

—'এস এস। পথে কেন, ভিতরে এস, সবাই এস।'

কর্তা স্বয়ং দু হাত প্রসারিত করে আমন্ত্রণ জানালেন। লেখার পাশের বড় ঘর। সবার সঙ্গে তিনিও মাটিতে একাসনে বসলেন।

প্রথম বছরে কি করে যে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল তা মনের খতিয়ানে লেখা নেই। তবে তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটিতে তারাশঙ্করও যে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকতেন তা জানা হয়ে গিয়েছিল। এক বছরের খবর : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন। বোধহয় দিল্লী। আমাদের দেখেই সনৎ বললেন, 'বাবা কালই ফিরে এলেন আজ তোমরা আসবে সেইজন্যে।'

এই দুপুরে ওই ঘরে বসে গান গা তে হবে। তারপর আসরে রসগোল্লা বিলি হবে, চা আসবে। বেলা একটা বাজবে। আসর ভাঙলেই তারাশঙ্কর বলবেন—'ও-বেলা তোমরা সবাই এসো। সন্ধ্যের পর আসবে, গান হবে; এখানেই সবাইকে খেতে হবে।' রাতে সকলের আহারের নিমন্ত্রণ। গানের আসর বসতো।

এটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিবছর এ মহল্লার তরুণ গম্ভীর সম্প্রদায় এই একটি দিন মুখোশ ফেলে দিয়ে রঙের মিছিলে মিশে যেতেন।"

রাত্রের আসর শেষ হতে প্রায় এগারোটা বেজে যেত।

ওঁদের সকলকে পরম সমাদরের সঙ্গে লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল আর মিষ্টি খাইয়ে তাঁদের সকলকে বিদায় জানিয়ে তারাশঙ্কর পুজো সেরে নিয়ে খেতে বসতেন বাড়ির অন্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে।

একটি নিটোল পরিপূর্ণ আনন্দের মিছিল এটি আমাদের কাছে। আমরা যখন শোবার জন্যে ঘরে আসতাম—দেখতাম পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোয় প্লাবিত হয়ে রয়েছে আমাদের শয্যা। ওদিকে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজছে টালা ট্যাঙ্কে—মধ্যরাত্রি শেষ—পরের দিন শুরুর ঘোষণা। □

তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত চিঠি

কমল মল্লিন

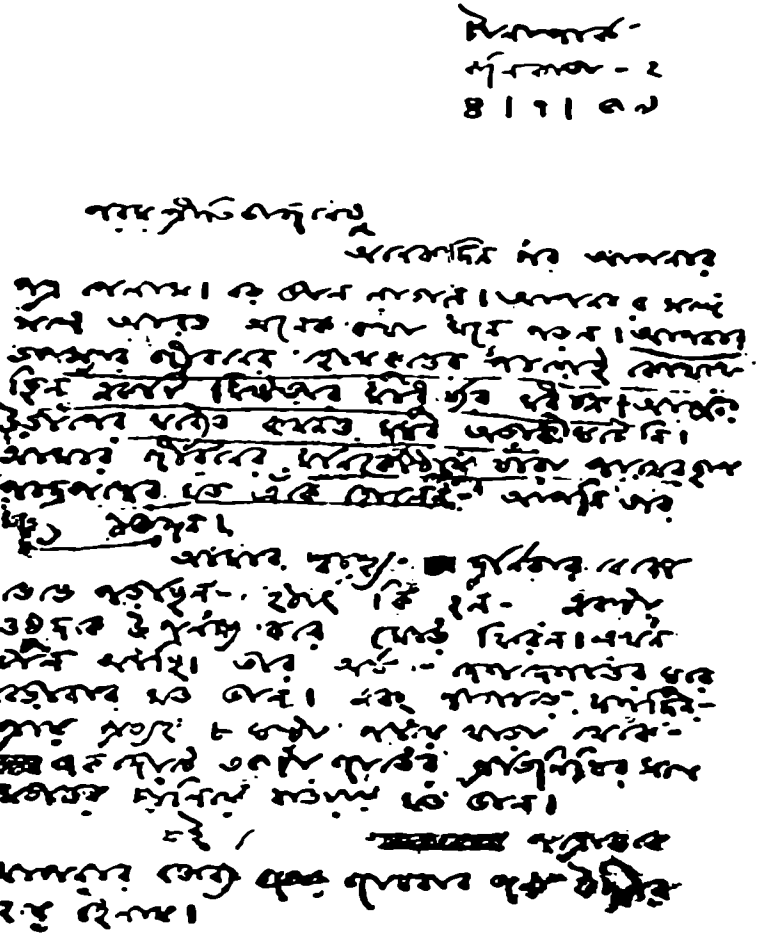

পরম প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন পর আপনার পত্র পেলাম। বড় ভাল লাগল। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথা মনে পড়ল। আপনার তপস্যার জীবনের হোম-কুণ্ডের পাশেই কোথায় ছিল একটি মিষ্টতার মাধ্বীর মধুচক্র। আগুনের

উত্তাপের মধ্যেও কখনও মধুর অভাব ঘটেনি। আমার জীবনের মণিকোঠায় যাঁরা পায়ের ছাপ পাদপদ্মের মত এঁকে গেলেন আপনি তাঁর মধ্যে একজন।

আমার স্বাস্থ্য দুর্নিবার বেগে ভেঙ্গে পড়ছিল, হঠাৎ কি হল একটা ওষুদকে উপলক্ষ্য করে মোড় ফিরল। এখন ভাল আছি। তার অর্থ দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াবার মত ভাল। এবং নাগাড়ে দশদিন প্রায় প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা পায়ে খাড়া

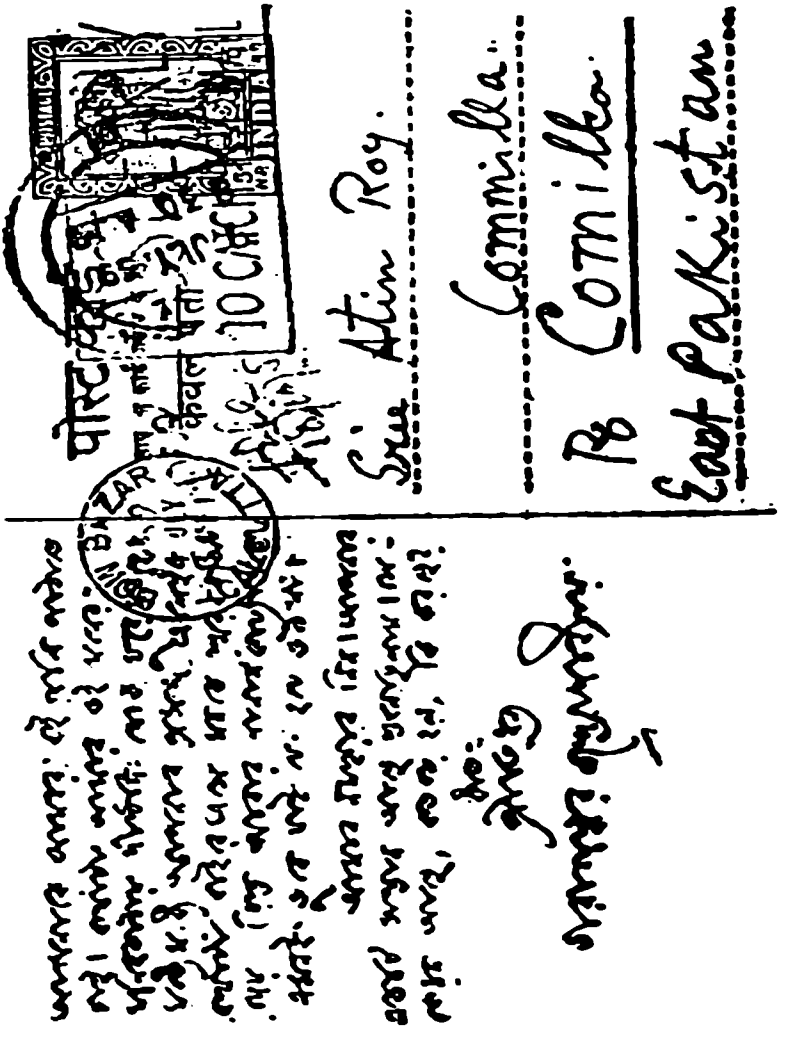

থেকে এক জোটে ৩৫টা জাতের প্রতিনিধির সঙ্গে মতান্তর চালিয়ে যাওয়ার মত ভাল।

যাই হোক পত্রোত্তরে আপনার বক্তব্য জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

আপনাকে আমার বইগুলি পাঠাতে চাই। কথাটা আমার ওই মনের মণিকোঠায় দীর্ঘদিন থেকে ঘুরে মরছে। মধ্যে মধ্যে আপনার প্রসঙ্গ এলেই কথাটা বাইরে এসে মনকে স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু আবার নানান কার্যান্তরে এমনই ডুবে যাই যে হয়ে ওঠে না।

আমার নমস্কার নিন। আপনার একটি সন্তান আছে শুনেছিলাম। সে কেমন আছে, কত বড় হল, কি করছে ?

ইতি—
প্রীতিধন্য
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরোক্ত চিঠিখানা টালাপার্ক, কলকাতা থেকে ১৯৫৯ সালের ৪জুলাই তারাশঙ্কর লিখেছিলেন কুমিল্লায় অতীন্দ্রমোহন রায়কে। কে এই অতীন্দ্রমোহন যাঁর 'পায়ের ছাপ' তারাশঙ্করের মত দুর্জয় খ্যাতির শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের 'জীবনের মণিকোঠায়' আঁকা থাকে 'পাদপদ্মের' মতো ? এরও প্রায় একযুগ আগে লেখা আর একটি চিঠি (তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৪৮) পড়লে বোঝা যায় কী অসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও নৈকট্যবোধ তারাশঙ্কর পোষণ করতেন অতীন্দ্রমোহনের প্রতি।

Phone : B. B. 3076
TALLA PARK,
Calcutta—2

প্রীতিভাজনেষু

অতীন বাবু, আমার অন্তরের প্রীতি শ্রদ্ধা গ্রহণ করুণ। জীবনের গভীরে যারা নির্জনে নিরবে অতীতকালের সুখস্মৃতির মহাজন হয়ে বসে থাকেন— তাঁদের মধ্যে আপনি একজন। যারা প্রীতির সঙ্গে পাথেয় অনেক দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আপনি একজন। কত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আপনাকে স্মরণ করি, অথবা আপনি আপনা থেকেই সামনে এসে দাঁড়ান। কাগমারীতে আপনাকে পেয়ে কথাবার্তা বেশী হয়নি, আপনার জীবনের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথাগুলি শুনার পর আনন্দ উল্লাস বাইরে প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন

পর আপনাকে দেখে কাছে পেয়ে—কাগমারীর অনুষ্ঠান ও সমারোহ সর্বস্ব দিনটি অন্তর মাধুর্য্যে ধন্য হয়ে উঠেছিল।

আপনার দিকে তাকিয়ে অনেক ভেবেছি; দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা দেখে ভেবেছি—শুধু কি আদর্শ; কি মধু পেয়েছেন সেখানে? আমারও লাভপুরে আছে, কিন্তু সে যদুপতির মথুরা রঘুপতির মত শূন্য খাঁ খাঁ করছে। আমি সেখানে যেতে পারিনে, থাকতে পারিনে অনেক সময় কাঁদি। কিন্তু ওই মাটি আঁকড়ে থাকতে পারিনে।

জীবনের নদীতে অনেক বন্যা অনেক শুকা এল গেল। প্রতিষ্ঠা, যশ সাহিত্য সাধনার সাফল্য, বস্তু জগতের সুখ সবই পেয়েছি; আপনার মত আমিও সবিস্ময়ে ভাবি এ হল কি করে? ভাবের ফাঁকি দিয়ে দেখে নেই লাভপুরের সে দিনের আমাকে চিরে চিরে ফালি ফালি করেও তো ঐ কালের আমার ভ্রূণকেও আবিষ্কার করা যায় না। শুধু একটি জিনিষ জানি আমার ছিল, সে জিনিষ বা সত্তা যাই বলুন আপনার চোখে ঠেকেছিল কিনা জানিনা—ছিল আকাঙ্খা; আকাঙ্খা ছিল এমন কিছু পাবার যার স্পর্শে সব সোনা হয়, জীবনটা ভরে যায়। ভেবেছিলাম সাহিত্য-সাধনায় তা পাব, চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। আজ যখন অনেক সোনায় জীবন ভরল—তখন দেখছি সোনায় জীবন ভরেনা। জীবন আজ ব্যস্ততায় ভরা কিন্তু তার অন্তরালে সব শূন্য—সেই আগের মতই; হয়তো বা আগের চেয়ে বেশী। অনেক উঁচুতে ঝড় বয় মাটির বুকে গুমোট থাকে সে রকম। তাই আপনাকে দেখে প্রশ্ন জেগেছিল—দুঃখ আঁকড়ে পড়ে থাকার মধ্যেই কি আছে পরশ পাথর? যার স্পর্শে সোনা নয়—দুঃখ সুখ হয়? জানি এটাও সব শেষ নয়, এর পিছনেই আছে শূন্যতা। তবুও হয়ত বেঁচে গেছেন আপাতত; যাক তত্ত্ব কথা। জীবনে যা খুঁজছি তা পাইনি, তা পাবনা। তবে তার স্বাদ পেয়েছি ইসারা পেয়েছি আপনার মত যারা শুধু মধু নিয়ে এসেছিলেন এবং আমার জীবন থেকে মৌমাছির মত মধুই সংগ্রহ করেছেন তাঁদের কাছ থেকে। এ মানুষ সংসারে বেশী নয়। দু চারজন। স্ত্রী শুভ্রাও নয় অতীন বাবু।

যাক সে কথা। আপনার গ্রন্থাগারের জন্য বই নিশ্চয়ই পাঠাব। ঢাকার ডেপুটি হাই-কমিশনার আপিস মারফতই পাঠাব। আমি পাঠাবার আগে এ বিষয়টা জানিয়ে তাঁদের সম্মতির জন্য পত্র দিচ্ছি। তাঁদের সম্মতি পেলেই

পাঠাব। আপনি ইতিমধ্যে তাঁদের লিখুন। বোধকরি তাতে আপনার পাওয়া সম্পর্কে সুবিধা হবে।

আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুণ। ইতি

প্রীতিবন্ধ

12.3.48 তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি হলেন বিপ্লবী যুগের অগ্নিপুরুষ অতীন্দ্র মোহন রায়, যিনি অতীন রায়, বাঘা অতীন নামে পরিচিত ছিলেন এবং যাঁকে নিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর অমর উপন্যাস গণদেবতায় নির্মাণ করেছেন ডেটিনিউ যতীন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এর অতীন চরিত্রও বিপ্লবী যুগের এই অগ্নিপুরুষ।

বীরভূমের লাভপুরে অন্তরীণ অবস্থায় তারাশঙ্করের সাথে অতীন রায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তারাশঙ্কর অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাঁকে। তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল মহাত্মা গান্ধী, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ও কাজী নজরুল ইসলামের। নজরুলের অনেক অপ্রকাশিত লেখা ছিল তাঁর কাছে। ১৯৩১ সালের ১৯শে মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রত্যভিনন্দন' নামক কবিতাটি লিখেছেন অতীন রায়ের খাতায়। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে তিনি মিশেছেন গভীর ভাবে। কুমিল্লার এই বীরপুরুষ অতীন রায় জন্মে ছিলেন নবীনগর থানার ভোলাচং গ্রামে বাঙলা ১৩০০ সালে। পিতা ছিলেন আনন্দ মোহন রায়চৌধুরী। মা কামিনী সুন্দরী রায়চৌধুরী। পাঠ্য জীবন শুরু করেছিলেন নবীনগরে। কুমিল্লা শহরের ইউসুফ হাইস্কুল থেকে পাশ করেন এনট্রান্স। তারপর ভর্তি হন ভিক্টোরিয়া কলেজে। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে।

অতীন রায়ের পুরো জীবন ছিল বর্ণময়, ঘটনাবহুল, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মিছিল সমাবেশ দিয়ে তিনি রাজনৈতিক দীক্ষা নেন। ১৯১১ সালে সদস্য হন বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির। ১৯১৬ সাল থেকে শুরু হয় পলাতক জীবন। পলাতক জীবন কাটে ঢাকা, কলকাতা, রাজশাহী, নাটোর, পাঁটিয়ায়। এইসময় ঢাকার কলতা বাজারে দুইজন পুলিশ হত্যায় অংশ নেন। তারপর অংশ নেন কলকাতার আই

বি-র ডি.এস.পি বসন্ত চ্যাটার্জীকে খুন করার কাজে। সে বছর চাঁদপুরে গ্রেপ্তার হন তিনি। ১৯২১ সালের মধ্যভাগে কারামুক্ত হন।

কুমিল্লা, দমদম, আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল, রাজপুতানার দেউলী বন্দী-শিবির, হিমালয়ের পাদদেশে বকসার এবং হিজলীর বন্দীশিবিরে দীর্ঘজীবন কাটে তাঁর। সর্বমোট ২৫ বছর জেল খেটেছিলেন তিনি। অনশন করেছেন ৩৫ দিন। ১৯৪৬ সর্বশেষ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারাগার থেকে বের হয়ে নির্বাচিত হন কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যান। দীর্ঘ নয় বছর তিনি এই পদে কাজ করেছেন। ১৯৪৭-এ কুমিল্লা টাউন হলে তিনি পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন। কুমিল্লায় ফরিদা বিদ্যায়তন থেকে শুরু করে অসংখ্য সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুমিল্লাবাসীর সুখদুঃখে তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। ১৯৬৯সালে কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল গঠন করেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একমাত্র পুত্র অসীম শান্তি রায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। পুত্রের মৃত্যুর পর বাইরের জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি। মানসিক শারিরীক অসুস্থতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর পর অসংখ্য পান্ডুলিপি, কবি নজরুলের অপ্রকাশিত কিছু লেখা, তারাশঙ্করের চিঠি বাঙলা দেশের এক বিখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেনের হাতে চলে যায়। তারাশঙ্করের উপরোক্ত চিঠি দুটি আমি সংগ্রহ করেছি পুত্রবধূ অজন্তা রায় চৌধুরীর কাছ থেকে।

আজ কুমিল্লার লোকজন তেমন মনে রাখেনি বিপ্লবী অতীন রায়কে, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশ মাতৃকার সেবায়। যাঁর সন্তান শহীদ হয়েছেন বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।

তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে কুমিল্লার এক তরুণ হিসেবে সেদিনের সেই বীর বিপ্লবীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। □

উপন্যাস ও তার প্রকাশকাল	প্রকাশক	তারাশঙ্করের গ্রন্থপঞ্জী যে পত্রিকায় প্রথম বেরোয়
চৈতালী ঘূর্ণি আশ্বিন ১৩৩৮ (১৯৩১)	উপাসনা প্রেস পরে বেঙ্গল পাবলিশার্স	উপাসনা কার্তিক—চৈত্র ১৩৩৬, বীজগল্প শ্মশানের পথে মুরলীধর বসুর কালিকলম আশ্বিন ১৩৩৫ সংখ্যায় বেরোয়।
পাষাণপুরী শ্রাবণ ১৩৪০ (১৯৩৩)	বর্মন পাবলিশিং হাউস	অভ্যুদয়, পরে নবশক্তি (১৩৩৯)
নীলকণ্ঠ আশ্বিন ১৩৪০ (১৯৩৩)	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স	উপাসনা (১৩৩৯), যোগবিয়োগ নামে বেরিয়েছিল।
রাইকমল আশ্বিন ১৩৪১ (১৯৩৪)	রঞ্জন প্রকাশালয়	কল্লোল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) এ প্রকাশিত রাইকমল ও উপাসনা (ফাল্গুন ১৩৩৮) এ প্রকাশিত মালাচন্দন গল্প দুটির সম্মিলিত রূপ
প্রেমও প্রয়োজন আশ্বিন ১৩৪২ (১৯৩৫)	ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট	অভ্যুদয় (১৩৪০) এ বেনের বেসাতী নামে বেরিয়েছিল।
আগুন আশ্বিন ১৩৪৪ (১৯৩৭)	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস	দেশ '১৩৪৪) পত্রিকায় কালপুরুষ নামে বেরোয়।
ধাত্রীদেবতা আশ্বিন ১৩৪৬ (১৯৩৯)	ঐ	বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (১৩৪১) জমিদারের মেয়ে নামে শুরু হয়, পরে ধাত্রীদেবতা নামে শনিবারের চিঠি-তে ধারাবাহিক প্রকাশ।

কালিন্দী ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০)	কাত্যায়নী বুক স্টল	প্রবাসী ১৩৪৬ এর বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক বেরোয়। বীজগল্প মা পরিচয় (১৩৪৫) পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় বেরিয়েছিল।
গণদেবতা আশ্বিন ১৩৪৯ (১৯৪২)	শক্তিরঞ্জন সোম ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট	ভারতবর্ষ (১৩৪৭) পত্রিকায় চণ্ডীমণ্ডপ নামে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল।
মন্বন্তর মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪)	মিত্রালয় প্রকাশনী	শারদীয় আনন্দবাজারে (১৩৫০) অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম প্রকাশ।
পঞ্চগ্রাম মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪)	শক্তিরঞ্জন সোম প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুক স্টল	—
কবি ফাল্গুন ১৩৫০ (১৯৪৪) মতান্তরে ১৩৪৮ (১৯৪২)	কাত্যায়নী বুক স্টল	প্রভাতী (পাটনা থেকে প্রকাশিত মণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত) পত্রিকায় ১৩৪৭ চৈত্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল।
সন্দীপন পাঠশালা মাঘ ১৩৫২ (১৯৪৬)	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস	দৈনিক কৃষক পত্রিকার শারদীয় (১৩৫২) সংখ্যায় উদয়াস্ত নামে প্রথম প্রকাশিত।
ঝড় ও ঝরাপাতা অঘ্রাণ ১৩৫৩ (১৯৪৬)	বসুমতী-সাহিত্য মন্দির	মাসিক বসুমতীর ফাল্গুন ১৩৫২ থেকে ধারাবাহিক বেরোয়।
অভিযান পৌষ ১৩৫৩ (১৯৪৭)	মিত্র ও ঘোষ	পরিচয় (১৩৫২) তে ধারা বাহিক বেরোয়।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)	বেঙ্গল পাবলিশার্স	শারদীয় আনন্দবাজার (১৩৫৩)
সন্দীপন পাঠশালা (কিশোর সংস্করণ) ফাল্গুন ১৩৫৪ (১৯৪৮)	—	—
তামস তপস্যা চৈত্র ১৩৫৪ (১৯৪৮) বেঙ্গল লাইব্রেরী মতে এপ্রিল ১৯৪৯	মিত্র ও ঘোষ	—
পদচিহ্ন বৈশাখ ১৩৫৭ (১৯৫০)	—	—
উত্তরায়ণ আষাঢ় ১৩৫৭ (১৯৫০) মতান্তরে ১৩৬৫ (১৯৫৮)	মিত্র ও ঘোষ	—
নাগিনী কন্যার কাহিনী চৈত্র ১৩৫৯ (১৯৫৩)	ডি. এম. লাইব্রেরী	শারদীয় সত্যযুগ (১৩৫৭) এ শবলার কাহিনী নামে প্রথম প্রকাশ।
আরোগ্য নিকেতন চৈত্র ১৩৫৯ (১৯৫৩)	—	শারদীয় আনন্দবাজারে (১৩৫৯) সঞ্জীবন ফার্মাসী নামে বেরোয়।
স্বর্গমর্ত্য ১৩৬১ (১৯৫৪)	ডি. এম লাইব্রেরী	শারদীয় বসুমতী।
চাঁপাডাঙ্গার বউ শ্রাবণ ১৩৬১ (১৯৫৪)	—	উপাসনা (১৩৩৮) এ বড় বৌ নামে প্রথম প্রকাশ।
পঞ্চপুত্তলী ভাদ্র ১৩৬৩ (১৯৫৬)	ডি. এম. লাইব্রেরী	তরুণের স্বপ্ন (১৩৬২)।
বিচারক শ্রাবণ ১৩৬৩ (১৯৫৬) শনিবারের চিঠি মতে ১৩৬৪ (১৯৫৭)	—	—

কালান্তর	—	শনিবারের চিঠি
ভাদ্র ১৩৬০ (১৯৫৬)		
মতান্তরে ১৩৬১		
সপ্তপদী	বেঙ্গল পাবলিশার্স	শারদীয় আনন্দবাজার
পৌষ ১৩৬৪ (১৯৫৮)		(১৩৫৬)।
বিপাশা	ডি. এম. লাইব্রেরী	—
মাঘ ১৩৬৪ (১৯৫৮)		
রাধা	ত্রিবেণী প্রকাশন	শারদীয় আনন্দবাজার
ফাল্গুন ১৩৬৪ (১৯৫৮)		
ডাক হরকরা	—	প্রবাসী (১৩৪৩) কার্তিক
বৈশাখ ১৩৬৫ (১৯৫৮)		সংখ্যায় গল্পাকারে বেরোয়।
না	—	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৫
অঘ্রাণ ১৩৬৭ (১৯৬০)		গল্পাকারে প্রথম বেরোয়।
মহাশ্বেতা	বেঙ্গল পাবলিশার্স	—
আষাঢ় ১৩৬৭ (১৯৬০)		
যোগভ্রষ্ট	ত্রিবেণী প্রকাশন	শারদীয় উল্টোরথ (১৩৬৬)এ-
শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)		যবনিকা নামে প্রথম বেরোয়।
নাগরিক	—	—
১৩৬৭ (১৯৬০)		
নিশিপদ্ম	বাক সাহিত্য	নবকল্লোল।
মাঘ ১৩৬৮ (১৯৬২)		
যতিভঙ্গ	—	—
বৈশাখ ১৩৬৯ (১৯৬২)		
কান্না	—	নবকল্লোল ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৬৮।
বৈশাখ ১৩৬৯ (১৯৬২)		
কালবৈশাখী	প্রাইমা পাবলিকেশানস।	মাসিক বসুমতী ফাল্গুন
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০	তার আগে ১৩৫৩ সালে	(১৩৫২) থেকে ঝড় ও
(১৯৬৩)	বসুমতী সাহিত্য মন্দির	ঝরাপাতা নামে ধারাবাহিক
	থেকে ঝড় ও ঝরাপাতা	বেরিয়েছিল।
	নামে প্রকাশিত হয়েছিল।	

একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে আশ্বিন ১৩৭০ (১৯৬৩)	বাক্ সাহিত্য	সাতরঙ নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭০ ও
জঙ্গলগড় ফাল্গুন ১৩৭০ (১৯৬৪)	গ্রন্থপ্রকাশ	—
মঞ্জরী অপেরা বৈশাখ ১৩৭১ (১৯৬৪)	ডি. এম. লাইব্রেরী	শারদীয় নবকল্লোল।
চিন্ময়ী জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ (১৯৬৪)	—	—
সংকেত আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)	মিত্র ও ঘোষ	—
ভুবনপুরের হাট আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)	শ্রীগুরু লাইব্রেরী	—
বসন্তরাগ অঘ্রাণ ১৩৭১ (১৯৬৪)	গ্রন্থপ্রকাশ	—
গল্পাবেগম আষাঢ় ১৩৭২ (১৯৬৫)	মিত্র ও ঘোষ	শারদীয় নবকল্লোল
অরণ্যবহ্নি চৈত্র ১৩৭৩ (১৯৬৬)	গ্রন্থম	—
হীরাপান্না বৈশাখ ১৩৭৩ (১৯৬৬)	গ্রন্থপ্রকাশ	—
মহানগরী আষাঢ় ১৩৭৩ (১৯৬৬) মতান্তরে ১৩৭৮	তুলিকলম	শারদীয় সাতরঙ (১৩৭১)।
গুরুদক্ষিণা শ্রাবণ ১৩৭৩ (১৯৬৬)	দেব সাহিত্য কুটীর	সাময়িকপত্রে হেডমাষ্টার নামে বেরিয়েছিল।
তপোভঙ্গ শ্রাবণ ১৩৭৩ (১৯৬৬)	—	—
নারী রহস্যময়ী শ্রাবণ ১৩৭৪ (১৯৬৭)	—	—

শিবাণীর অদৃষ্ট ভাদ্র ১৩৭৪ (১৯৬৭)	—	—
পঞ্চকন্যা ১৩৭৪ (১৯৬৭)	—	—
শঙ্কর বাঈ রাস পূর্ণিমা ১৩৭৪(১৯৬৭)	দেব সাহিত্য কুটীর	শারদীয় নবকল্লোল।
শুকসারী কথা ১৩৭৪ (১৯৬৮)	মিত্র ও ঘো	—
মনি বউদি শ্রাবণ ১৩৭৫ (১৯৬৮)	বাক্ সাহিত্য	সাপ্তাহিক অমৃত
ছায়াপথ আষাঢ় ১৩৭৬ (১৯৬৯)	ডি. এম. লাইব্রেরী	নবকল্লোল
কালরাত্রি বৈশাখ ১৩৭৭ (১৯৭০)	—	—
অভিনেত্রী ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯৭১)	তুলিকলম	শারদীয় নবকল্লোল (১৩৭৭)
ফরিয়াদ বৈশাখ ১৩৭৮ (১৯৭১)	মণ্ডল বুক হাউস	শারদীয় নবকল্লোল (১৩৭৬)
শতাব্দীর মৃত্যু অঘ্রাণ ১৩৭৮ (১৯৭১)	ঐ	প্রথমে নবকল্লোল-এ ধারা বাহিক শুরু। ১ম পর্ব শেষ হলে লেখকের মৃত্যু হয়। পরে ছেলে সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব শেষ করেন। সদর্থে এটা তারাশঙ্করের সৃষ্টি বলা চলে না।
১৯৭১ অঘ্রাণ ১৩৭৮ (১৯৭১)	—	নবকল্লোলে একটি কালো মেয়ের কথা ও উল্টোরথে সুতপার তপস্যা নামক দুটি নভেলেটের মিলিত প্রকাশ।
সখী ঠাকরুণ ১৩৭৯ (১৯৭২)	মিত্র ঘোষ	—

ব্যর্থ নায়িকা ১৩৭৯ (১৯৭২)	বাক্ সাহিত্য	—
জনপদ ১৩৮০ (১৯৭৩)	ডি. এম. লাইব্রেরী	—
নবদিগন্ত আষাঢ় ১৩৮০ (১৯৭৩)	দেব সাহিত্য কুটীর	—
কাঞ্চনী বিলের ধারে মালঞ্চীর চর ১৩৮০ (১৯৭৩)	ঐ	
কীর্তিহাটের কড়চা ভাদ্র ১৩৮৩ (১৯৭৬)	—	অমৃত ১৩৭১-এ ধারাবাহিক বেরোয়।
ধারমণ্ডল (গণদেবতার শেষপর্ব) শ্রাবণ ১৩৯১ (১৯৮৪)		
জবানবন্দী	—	শারদীয় উল্টোরথ (১৩৬৩)। পরে কীর্তিহাটের কড়চায় অন্তর্ভুক্ত হয়।
দীনার দান		শিশির বসু সম্পাদিত এক পয়সার সচিত্র শিশির পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য। বই হয়ে বেরোয়নি।

☐ গল্পগ্রন্থ

প্রকাশকাল	প্রকাশকাল
রাইকমল/আশ্বিন ১৩৩৮ (১৯৩১)	ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প / ১৩৬৩ (১৯৫৬)
ছলনাময়ী/বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬)	বিষপাথর/অঘ্রাণ ১৩৬৪ (১৯৫৭)
জলসাঘর/শ্রাবণ ১৩৪৪ (১৯৩৭)	মানুষের মন/বৈশাখ ১৩৬৫ (১৯৫৮)
রসকলি/বৈশাখ ১৩৪৫ (১৯৩৮)	প্রেমের গল্প/ভাদ্র ১৩৬৬ (১৯৫৯)
তিনশূন্য/বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)	রবিবারের আসর/ ১৩৬৭ (১৯৬০)
হারানো সুর/অঘ্রাণ ১৩৪৭ (১৯৪০)	(বিষপাথর গল্পের নব রূপায়ণ)
প্রতিধ্বনি/বৈশাখ ১৩৪৯ (১৯৪২)	পৌষলক্ষ্মী/ ১৩৬৭ (১৯৬০)

বেদেনী/আশ্বিন ১৩৪৯ (১৯৪২)
দিল্লি কা লাড্ডু ১৩৪৯ (১৯৪৩)
যাদুকরী/ফাল্গুন ১৩৫০ (১৯৪৪)
স্থলপদ্ম/ফাল্গুন ১৩৫০ (১৯৪৪)
১৩৫০/অঘ্রাণ ১৩৫১ (১৯৪৫)
প্রসাদমালা/শ্রাবণ ১৩৫২ (১৯৪৫)
ইমারত/মাঘ ১৩৫৩ (১৯৪৭)
রামধনু/বৈশাখ ১৩৫৪ (১৯৪৭)
শ্রীপঞ্চমী/আশ্বিন ১৩৫৪ (১৯৪৭)
তারাশঙ্করের
শ্রেষ্ঠ গল্প/পৌষ ১৩৫৪ (১৯৪৭)
কামধেনু/ভাদ্র ১৩৫৫ (১৯৪৮)
মাটি/আশ্বিন ১৩৫৭ (১৯৫০)
শ্রেষ্ঠ গল্প/ ১৩৫৭ (১৯৫০)
শিলাসন/মাঘ ১৩৫৮ (১৯৫১)
প্রিয় গল্প/আশ্বিন ১৩৬০ (১৯৫৩)
স্বনির্বাচিত গল্প/ ১৩৬১ (১৯৫৪)
গল্প সঞ্চয়ন/ ১৩৬১ (১৯৫৪)
বিস্ফোরণ/জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ (১৯৫৫)

(১৩৫০ গ্রন্থের পরিবর্ধিত রূপ)
আলোকাভিসার/অঘ্রাণ ১৩৬৭ (১৯৬০)
চিরন্তনী/ফাল্গুন ১৩৬৮ (১৯৬২)
অ্যাক্সিডেন্ট/বৈশাখ ১৩৬৯ (১৯৬২)
ছোটদের ভালো ভালো
গল্প/আষাঢ় ১৩৬৯ (১৯৬২)
গল্প পঞ্চাশৎ/ভাদ্র ১৩৭০ (১৯৬৩)
তমসা/বৈশাখ ১৩৭০(১৯৬৩)
আয়না/অঘ্রাণ ১৩৭০ (১৯৬৩)
একটি প্রেমের গল্প/ ১৩৭১ (১৯৬৫)
কিশোর সঞ্চয়ন/জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ (১৯৬৬)
দীপার প্রেম/ ১৩৭৩ (১৯৬৬)
জায়া/ ১৩৭৪ (১৯৬৮)
গোবিন সিংয়ের ঘোড়া/ফাল্গুন১৩৭৪ (১৯৬৮)
এক পশলা বৃষ্টি/জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ (১৯৬৮)
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প/আশ্বিন১৩৭৫ (১৯৬৮)
রূপসী বিহঙ্গিনী/১৩৭৭ (১৯৭০)

□ **নাটক ও প্রহসন**

মারাঠা তর্পণ (প্রথম লেখা নাটক) কালিন্দী / ১৩৪৭ (১৯৪০), দুই পুরুষ / বৈশাখ ১৩৪৯ (১৯৪২), পথের ডাক / ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪২), দ্বীপান্তর / আষাঢ় ১৩৫০ (১৯৪৩), বিংশ শতাব্দী / মাঘ ১৩৫১ (১৯৪৫), চকমকি (প্রহসন) / জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ (১৯৪৫), যুগবিপ্লব / শ্রাবণ ১৩৫৮ (১৯৫১), কবি / আষাঢ় ১৩৬৩ (১৯৫৬), কালরাত্রি / আশ্বিন ১৩৬৪ (১৯৫৭), বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা / ১৩৬৭ (১৯৬০), সংঘাত / জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ (১৯৬২), আরোগ্য নিকেতন / ১৩৭৪ (১৯৬৭)। উমানন্দের মন্দির, ডাইনির মাথা, অভিশপ্ত এই তিনটি নাটক বেতারে প্রচারিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

☐ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

সাহিত্যের সত্য / ১৩৬৭ (১৯৬০), ভারতবর্ষ ও চীন / শ্রাবণ ১৩৭০ (১৯৬৩), মিছিল / জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী / ভাদ্র ১৩৭৮ (১৯৭১)।

☐ ভ্রমণ

মস্কোতে কয়েকদিন / আশ্বিন ১৩৬৫ (১৯৫৮)।

☐ স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী

আমার কালের কথা / জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ (১৯৫১), বিচিত্র / চৈত্র ১৩৫৯ (১৯৫৩) আমার সাহিত্য জীবন (১ম পর্ব) / শ্রাবণ ১৩৬০ (১৯৫৩), কৈশোর স্মৃতি / শ্রাবণ ১৩৬৩ (১৯৫৬), আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব)/অগ্রাণ১৩৬৯ (১৯৬২)।

☐ কবিতা

ত্রিপত্র। এতে প্রকাশকাল লেখা নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মুদ্রিত তালিকা মতে এর প্রকাশকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০, দাম ছয় আনা। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত। লাল কালিতে ছাপা এই বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তিন অধ্যায়ের সূচীপত্র এইরকম :

প্রথম পত্র। পাষাণের বাণী

১। পাষাণের প্রতি, ২। ভূগর্ভস্থ পাটলীপুত্র, ৩। জীর্ণ মসজিদ, ৪। খসরু সমাধি, ৫। খসরু পত্নীর সমাধি, ৬। এলাহাবাদ দুর্গ, ৭। ছত্র মঞ্জিল, ৮। অজ্ঞাত সমাধি, ৯। দেলখুসা

দ্বিতীয় পত্র। মর্মবাণী

১। নিশীথে, ২। মিনতি, ৩। প্রতীক্ষায়, ৪। বাঞ্ছিত, ৫। তপ্ত, ৬। অভিসারে, ৭। পূজারিণী, ৮। মুগ্ধ, ৯। প্রথম চুম্বন, ১০। আকিঞ্চন ১১। অনুশোচনা, ১২। অনুযোগ, ১৩। আকাঙ্ক্ষা, ১৪। নিবেদন, ১৫। ভিক্ষা

তৃতীয় পত্র। মুগ্ধবাণী

১। শারদোৎসব, ২। মরণোন্মাদ, ৩। উৎসবের ব্যথা, ৪। হাঘরে, ৫। চোখের জল, ৬। সন্ধ্যাতারা, ৭। ব্রাহ্মণ, ৮। ঢেউ, ৯। কাঙাল, ১০। খোকার ত্যাগ, ১১। আমার বধূ, ১২। আমার তীর্থ, ১৩। বীরভূম সাহিত্যিক সম্মেলনে, ১৪। করুণা, ১৫। শীতের প্রভাতে, ১৬। সাল তামামী।

বইটি দুষ্প্রাপ্য। প্রকাশক ছিলেন চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৮বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর কানাইলাল দাস, ইকনমিক্যাল প্রেস, ২৩ মুজাপুর লেন, কলিকাতা। জানা গেছে জাতীয় গ্রন্থাগারে বইটির একটা কপি সংরক্ষিত আছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর এবং প্রবহমানশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা একনজরে :

- ☐ মোট লোকসংখ্যা—৭০ লক্ষ। [বিগত আদমসুমারী মতে]
- ☐ ৫টি মহকুমা, ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি, ২০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত।
- ☐ ২৭টি পৌরসভা—ওয়ার্ডের সংখ্যা ৭৪২।
- ☐ ১টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা।

১৯৯১, ৮ই সেপ্টেম্বর জেলার সাক্ষরতা কর্মসূচীর সূচনা

- ☐ মোট নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ১০·০৫ লক্ষ। [৯ থেকে ৫০ বছর]
- ☐ সাক্ষরতা কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছেন ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার
- ☐ সাক্ষরোত্তর পর্যায়ের মূল্যায়নে সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯৩। সাক্ষরোত্তর পর্বের এইসব সফল পড়ুয়াদের একাংশকে ইতঃমধ্যেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে স্বনির্ভর করা গেছে।
- ☐ যারা ধারাবাহিকভাবে এই কাজ রূপায়ণ করেছেন সেইসব কে, পি, এম, টি,ভি,টি, ও ভি,এস, দের সংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ৯ হাজার।
- ☐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে আনন্দের সাথে শিক্ষাদান কর্মসূচী 'আনন্দ পাঠ' পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জেলায় শুরু হয়েছে।
- ☐ 'ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স ইউনিট' [ডি,আর,ইউ] জেলায় কাজ শুরু করেছে।
- ☐ সাক্ষরতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য কর্মসূচী জনস্বাস্থ্য, চেতনা বৃদ্ধি, মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল কর্মসূচীতে এই জেলা সারা রাজ্যে ১৫/১৬ তম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উন্নীত হতে পেরেছে।
- ☐ সাক্ষরতা আন্দোলনে জেলার সকল গ্রন্থাগারকেও যুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ ৪০টি "শিশুশ্রমিক কল্যাণ" বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।
- ☐ সাক্ষরোত্তর পর্বের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে আমাদের জেলা এক নতুন পর্যায়ে—"ধারাবাহিক শিক্ষা" কার্যক্রমে প্রবেশ করতে চলেছে। জেলায় এই ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রের [সি, ই, এ] সংখ্যা হবে প্রায় ২ হাজার ২ শত ৪০টি।
- ☐ জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনের এই নব পর্যায়ে এবং এর আগামী সাফল্যের জন্য, জেলার সকল মতের, সকল পথের মানুষজন, সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র-যুব ও সাংস্কৃতিক জগতের সৃজনশীল মানুষদের আশীর্বাদ, সহমর্মিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের একান্ত কাম্য।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সাক্ষরতা সমিতি : বারাসাত

EKUSH SHATABDI

a distinctive bengali periodical ▢ R. N. 68099/96

Vol. 3 ▢ No. 1-3 ▢ January—September 1998 ▢ Rs. 25

Heartiest congratulations from

Sunglow Securities

&

Ghosh Development Project.

ডালিয়া রায় (সত্বাধিকারী) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১, রাজা রামমোহন রায় সরণি কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন-২১, নবাদশ, কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক—সাগর বিশ্বাস

অর্থনীতি-শিক্ষকের চোখে অমর্ত্য সেন
সৌরকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ
কবি : কাব্যে ও জীবনচরিতে
এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিনয়তোষ :
একটি নিঃশব্দ শতবর্ষ

স্মরণের আবরণে : কবিতা সিংহ
ছোটগল্প □ বইপত্র
দুই বাংলার ২৭টি সাম্প্রতিক কবিতা

A Well Wisher

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষ ৩ ☐ সংখ্যা ৪ ☐ ১৯৯৮
[অক্টোবর—ডিসেম্বর]

সম্পাদক ☐ সাগর বিশ্বাস
সহযোগী ☐ সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

এম-২১, নবাদর্শ
কলকাতা-৭০০০৫১
দূরভাষ ; ৫১২-২০৬৪

উত্তর ২৪ পরগণা নোনাজল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা মীন ভবন, বারাসাত

North 24 Parganas Brackish water Fish Fermers' Development Agency MEEN BHAVAN, BARASAT.

"চিংড়ি চাষে উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখুন"

বাগদা চিংড়ি চাষ আপনার জীবনে আনতে পারে সাফল্যের জোয়ার।
প্রথাগত পদ্ধতি নয়, উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে
চিংড়ির চাষ করুন।
আপনাদের সাহায্যের জন্য আছে উত্তর ২৪ পরগণা নোনাজল মৎস্য
চাষী উন্নয়ন সংস্থা।

গ্রহণ করান প্রশিক্ষণ,
সুযোগ নিন ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারী অনুদানের
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
নিকটস্থ ব্লক অফিসে অথবা উপরিউক্ত ঠিকানায়।

সভাপতি
অপর্ণা গুপ্ত
সভাধিপতি
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

সহঃ সভাপতি
শ্রীঅরুণ মিশ্র
জেলা শাসক, উত্তর ২৪ পরগণা

মুখ্য নির্বাহী আধিকারীক
শ্রী সুকুমার ঘোষ
সহঃ মৎস্য অধিকর্তা

একুশ শতাব্দী

(কার্তিক-পৌষ ১৪০৫)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৮

প্রবন্ধ

অমর্ত্য সেন ও একটি কবিতার জন্ম □ ঈশ্বর ত্রিপাঠী ৯

সৌরকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ □ উদয়ন ঘোষ ২০

কবি : কাব্যে ও জীবনচরিতে □ অরবিন্দ পুরকাইত ২৪

এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিনয়তোষ □ জগৎপতি সরকার ৩০

গল্প

মেয়েদের কিছু একটা হয়েছে □ যশোধরা রায়চৌধুরী ৩৩

শীতলতম দিন □ আরতি মুখোপাধ্যায় ৪১

কবিতা ৪৫—৫৮

নির্মলেন্দু গুণ, ফেরদৌস নাহার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, দিলারা হাফিজ, রবিউল হুসাইন, টোকন ঠাকুর, শওকত হোসেন, অসীম সাহা, রাসেল আশেকি, জীবন নজরুল, আহমেদ স্বপন মাহমুদ, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, শিখা ঘটক, সমর্পণ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম দত্ত, পীযূষ ধর, ব্রত চক্রবর্তী, অনিমা মিত্র, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য, মানসকুমার চিনি, সুমিত্রা দত্তচৌধুরী, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, তাপস রায়, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, অভিজিৎ পালচৌধুরী।

স্মরণের আবরণে

কবিতা সিংহ □ কৃষ্ণা বসু

বইপত্র

পোড়া তামাকের গন্ধ □ অভিজিৎ ঘোষ ৬০

কিছু ব্যক্তিত্ব কিছু ঘটনা □ অ-গ্রন্থাগারিক ৬১

ফিরে আসি কোলাহলে □ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৬৩

প্রচ্ছদ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

With best compliments from :

DAS CONSTRUCTION & HARDWARE

All kind of Building materials and
Hardware goods.
Bisharpara, North 24-parganas
Phone : 512-7023

With Best Complements From :

C. I, Laboratories

24B, B. L Shah Road,
Calcutta-700 053.
Manufacturer of :
Tablets, Capsules, Dry Syrups /
Pharmaceutical Preparations.
Phone : 235-4506 / 9432 Gram : CIPHARMA

শিশু শিক্ষার নিভ'রযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নব শিশু নিকেতন

বিশর পাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

সাহিত্য বিহার-এর শরৎ সাহিত্য

পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১১·০০ ।। বড়দিদি ৮·০০ ।। পরিণীতা ৮·০০ ।। চন্দ্রনাথ ৯·০০ ।। পল্লী-সমাজ ১৩·০০ ।। বিরাজ বৌ ১২·০০ ।। অরক্ষণীয়া ৮·০০ ।। বামুনের মেয়ে ১০·০০ ।। গৃহদাহ ১৮·০০ ।। গল্প সংকলন ১৮·০০ ।। নিষ্কৃতি ৮·০০ ।। স্বামী ৮·০০ ।। পণ্ডিতমশাই ১১·০০ ।। নববিধান ৮·০০ ।। বৈকুণ্ঠের উইল ৯·০০ ।। দেনা-পাওনা ১৫·০০ ।। রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে ৭·০০ ।। কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮·০০ ।। মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮·০০ ।। দত্তা ১৫·০০ ।। চরিত্রহীন ২০·০০ ।। পথের দাবী ১৮·০০ ।। কিশোর রচনা সংকলন ১১·০০ ।। প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮·০০ ।। নাটক—ষোড়শী ১০·০০ ।। বিজয়া ১০·০০ রমা ৯·০০ ।।

শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০·০০ ।। পথের দাবী ২০·০০ ।। চরিত্রহীন ২২·০০ ।। দেনা-পা ১৮·০০ ।। শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০·০০ ।।

কিশোর সংস্করণ

চিত্তরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত ডঃ অজিতকুমার ঘোষের ভূমিকা সহ (২য় সং) ৪টি খণ্ডে সম্পূর্ণ ।। প্রতি খণ্ড ৩০·০০ ।। সুদৃশ্য আধার সহ ৪টি খণ্ড একত্রে ১০০·০০ ।।

সাহিত্য বিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৫০-১৫৬৩

পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

With Best Compliments from

P. ARTS

A Creative Ad. Agency

59, Mott Lane

Calcutta-700 013

Phone : Office-246-4940

Resi-673-9454

পত্র পত্রিকায় সবিশেষ প্রসংসিত

ছোট বড় সকলের জন্য ছড়ার বই

সাগর বিশ্বাসের

ছড়াছড়ি কলকাতা (২য় সংস্করণ)

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী

৫৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯

বইমেলায় বেরোচ্ছে

অমলেন্দু বিশ্বাসের

কবিতার বই

মহাগ্রহ, তুমি আলো ফেলো

নৌকো প্রকাশনী

একুশ শতাব্দী

- তিন মাস অন্তর বেরোয় (জানুয়ারি—মার্চ, এপ্রিল—জুন, জুলাই—সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর—ডিসেম্বর)।
- গ্রাহক চাঁদা বছরে ৩০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা নিলে ৫০ টাকা।
- লেখকেরা কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
- নতুন লেখকদের ভাল লেখা অগ্রাধিকার পায়।

কলকাতায় একুশ শতাব্দী পাওয়া যায়

কলেজ স্ট্রিট ☐ বুক মার্ক, পাতিরাম, লিটল ম্যাগাজিন স্টল
বি বা দী বাগ ☐ ইমা বুক সেন্টার (টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকে)
ডি. পি. দত্ত ☐ ১০ গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট) এজরা ম্যানসন (তিনতলা)
শ্যামবাজার ☐ লিপিকা
রাসবিহারী ☐ প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল

এ বছর যাঁদের বিয়োগে আমরা ব্যথিত:

শওকত ওসমান	তালাত মাহমুদ
লক্ষ্মীকান্ত	অপরেল লাহিড়ী
রমাকান্ত দেশাই	ব্রজেন দাস
অশীন দাশগুপ্ত	নিখিল চক্রবর্তী
চিররঞ্জন দাস	অনুপকুমার দাস
ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র	কবিতা সিংহ

● সম্পাদকীয়

মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও অধিকারবোধ কত তীব্র হলে মানুষ শাসকশ্রেণীর অত্যাচারকেও নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে গ্রহণ করতে পারে তা খণ্ডিত বাঙলার পূর্বখণ্ড সেই চারের দশক থেকেই দেখিয়ে এসেছে। ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ওই পূর্বখণ্ড বা বাঙলাদেশ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। আমরা নত হই, বিনম্র শ্রদ্ধায় ও আত্মীয়তাবোধে সিক্ত হই, প্লাবিত হই। তাই পূর্বখণ্ডের প্রতি আমাদের কৌতূহল অনেক। ঋণও কিছু কম নয়।

সম্প্রতি ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাঙলা কবিতা উৎসবে দুই বাঙলার ৬০-৬৫ জন কবি অংশগ্রহণ করলেন। ওপার থেকে এসেছিলেন, শামসুর রাহমান, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, বেলাল চৌধুরী, শামসুল হক, ফরহাদ মাজহার, রফিক আজাদ, রেজাউদ্দিন স্টালিন, অসীম সাহা, দিলারা হাফিজ, রুবি রহমান, আল ফারুক, তারিক সুজাত, দ্রিদিব দস্তিদার, রবিউল হুসাইন ও সুহিতা সুলতানা

উৎসবে কবি নির্বাচন যথাযথ হয়েছে কিনা, এ পাশের কবিদের প্রতি সরকারী বীক্ষণ নিরপেক্ষ হল কিনা, এসব তাৎক্ষণিক কুটকচালি অগ্রাহ্য করেও বলা যায়, এরকম মিলনোৎসবের প্রয়োজন আছে। সেদিক থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের এই যৌথ উদ্যোগ কুণ্ঠাহীন অভিনন্দনের দাবী রাখে। প্রসঙ্গত আমরা মনে করি শুধু কবি সম্মেলন নয়, সামগ্রিকভাবে লেখক সমাবেশেরও প্রয়োজন আছে। দুদিক থেকেই।

'একুশ শতাব্দী' তার ক্ষুদ্র ও দুর্বল হাতে ছুতে চেয়েছে ওপারের করোষ্ণ করতল। অসংকোচে জানিয়েছে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা। অর্থের জোর নেই, ফ্যাক্স নেই, আই-এস-ডি-র সামর্থ নেই, নেই কত কি, সে কথাও জানাতে ভোলেনি। তথাপি মানুষের সাহচর্য আর সহযোগিতার জোর সে আছে, থাকবে আগামীদিনেও। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা ও দায়বদ্ধতাই তার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি। সেই দায়বদ্ধতা নিয়েই সে যোগসূত্র নিবিড় করতে চায়, দাঁড়াতে চায় পূবের জানালায়। কারন পূবের জানালা খোলা থাকলেই প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঘর ভরে ওঠে। □

● প্রবন্ধ

অমর্ত্য সেন ও একটি কবিতার জন্ম

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

১.

কলকাতা তখন কল্লোলিনী ছিল। তখন, অর্থাৎ পঞ্চাশ ও ষাটের প্রথম দিকে। জীবনানন্দ চলে গেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু আছেন। আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে, সাহিত্য পড়ি আর অর্থনীতির ক্লাসে যাই এমন কিছু আমাদের মত ছাত্রছাত্রীর কাছে আছেন প্রবাদ-প্রতিম ভবতোষ দত্ত, ধীরেশ ভট্টাচার্য, অম্লান দত্ত প্রমুখ। আমরা গ্রাম-বালক। কলকাতা তখনও আমাদের কাছে স্বপ্নপুরী—রূপশহর। জীবনটাও রূপকথা, উপকথার রাখাল বালকের মতো। সেই সময় আমাদের কাছে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা—অমর্ত্য ও নবনীতা। দূরে থেকে শুনি আর ভাবি, একদিন দুঃসাহসী হলে ক্ষতি কী? যদি দেখা পাওয়া যায়! যদি কথা বলা যায়!

কলকাতা তখন দেবতাদের বাসভূমি ছিল। ছিলেন জানকী পাঠকের মতো এই শতাব্দীর বিদ্যাসাগর কয়েকজন। শম্ভুনাথ পালিত ও গীতা পালিতের মতো সহৃদয় বিভূতি ভূষণের দেবযান থেকে উঠে আসা দেবপ্রতিম মানুষেরা। কিন্তু ওরই ভেতর ক্ষুধা ছিল। দিনে একবার খেলে রাত্রে উপোস। চব্বিশ ঘন্টার জন্য কখনও কখনও বরাদ্দ চার আনা। তো, গল্প খাওয়া যেত। ক্লাসে অর্থনীতি চিবোতে মজা লাগত। ক্ষিদেটা ভয়ঙ্কর হতে পারত না কোনদিনও।

১৯৭৫-৭৬ সালের এক সন্ধ্যায় কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে আমার মত সামান্যরাও দেখা করতে এবং কথা বলতে পারি। ততদিনে অর্থনীতি থেকে আমি সাহিত্যের দোরগোড়ায়। সাহসী হলাম এবং আতিথেয়তায় ও যত্নে উৎফুল্ল। কলকাতায় এখনও টুকরো টাকরা স্বর্গভূমি আছে তাহলে! আছেন রাধারানী দেবী—আমার মত অভাজনের একটা ছোট কবিতা যিনি শুধু স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করতে পারেন। অমর্ত্য সেন সম্পর্কেও কিছু কথা হল তাঁর সঙ্গে। কিছু পুরানো লেখা ও বই যোগাড় হল। অল্পস্বল্প চেনা জানা ঘটতে লাগল তাঁর অর্থনীতি চিন্তার সঙ্গে।

সত্তর দশকের গোড়ায় অর্থনীতির সাম্মানিক পাঠক্রমে একটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়, উন্নয়নের অর্থনীতি। ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, ওই বিষয়ের উপর তাদের উপযোগী বই নেই। যা আছে সেগুলি বৃহদায়তন অথবা আয়তনে ছোট হলে ভাষা দুরূহ। চ্যালেঞ্জটা নেওয়া গেল। 'The Economics of Under Development' লিখতে গিয়ে শুরু হল অমর্ত্য সেন সম্পর্কে কথা বলা। কারণ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের ভেতর ভবতোষ দত্তের The Economicals of Industrialisation-এর পর উন্নয়নের অর্থনীতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় বই-ই হল অমর্ত্য সেনের Choice of Techniques ; সাদা কথায়, উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তি নির্বাচনের ব্যাপারটা এরকম। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অভাব প্রচণ্ড। কাজেই উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনায় তাদের ভাবতে হয় ওই দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সর্বোত্তম বিনিয়োগ কিভাবে করা যায়। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মাপকাঠির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন, বিনিয়োগ এমন ভাবে করতে হবে যাতে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়। কেউ বলেছিলেন, তক্ষুনি তক্ষুনি সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপাদন থেকে বেশি জরুরি ভবিষ্যতে অধিক হারে দেশের অগ্রগতি। এজন্য আবার দরকার সর্বাপেক্ষা বেশি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি। এই বিনিয়োগের বিভিন্ন মাপকাঠির (Investment criteria) প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বললেন সঠিক উৎপাদন কৌশল নির্বাচনের কথা। তাঁর মতে, কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা আনুপাতিক ভাবে বেশি শ্রম ব্যবহার করব, না বেশি মূলধন (প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন কৌশলটিকে বলা হবে শ্রম নিবিড়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূলধন নিবিড়) তা নির্ভর করবে প্রকৃতপক্ষে আমরা সমষ্টিগত ভাবে কী চাই তার উপর। আমরা যদি চাই স্বল্পকালে বেশি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান, তাহলে আমাদের বেছে নিতে হবে শ্রমনিবিড় কৌশল (Labour-intensive Technique) ; অন্যদিকে, যদি আমরা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা করি তাহলে আমাদের জোর দিতে হবে মূলধন নিবিড় কৌশলের (Capital-intensive Technique) উপর। কাজেই ভারতের মত যে সব দেশে শ্রমের যোগান অসীম, সেখানে যে শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তিই সর্বতোভাবে কাম্য একথা ঠিক নয়।

তবু, সমাজের পক্ষে সর্বতো ভাবে কাম্য অবস্থার কথা আমরা কি সত্যি সত্যিই ভাবতে পারি ? এই জিজ্ঞাসাটি অর্থনীতিবিদদের অনেক আগে থেকেই ভাবিয়েছিল। বস্তুত, সমষ্টিগত কল্যাণ সম্পর্কে এধরণের প্রশ্ন থেকেই 'জনকল্যাণ অর্থনীতি' (Welfare Economics) অর্থশাস্ত্র চর্চার একটি নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটে। সহজ কথায় জনকল্যাণ অর্থনীতি হল অর্থশাস্ত্রের এক আদর্শবাদী বা নীতিভিত্তিক (Normative) আলোচনা যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতম ব্যবহার এবং উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের সর্বাপেক্ষা কাম্য বণ্টন সম্পর্কে কতগুলি নিয়ম-নীতি তৈরি করা হয়। অধ্যাপক প্যারেটো ছিলেন (১৮৪৮-১৯২৩) এই জনকল্যাণ অর্থনীতির প্রথম প্রবক্তা। তাঁর মতে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ভালোমন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সমাজের ভালোমন্দ নির্ভর করে তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ভালোমন্দের উপর। তবে সঙ্গে সঙ্গে প্যারেটো মনে করেন যে দুজন ব্যক্তির কোন দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণগত পরিমাপ সম্ভব নয়। তাদের তৃপ্তির তুলনাও আমরা কেবল বিশেষ পদ্ধতিতে করতে পারি। এই ভাবে প্যারেটো সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সেই অবস্থাই হল কোন সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্য অবস্থা (Pareto Optimal) যেখানে কোন একজন ব্যক্তির কল্যাণের বা তৃপ্তির হ্রাস না ঘটিয়ে অপর কোন ব্যক্তির কল্যাণ বা তৃপ্তির বৃদ্ধি ঘটানো যায় না। তিনি এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য কতগুলি শর্ত পূরণের কথা বলেন। পরবর্তীকালে কেনেথ অ্যারো নামে একজন অর্থনীতিবিদ প্রমাণ করেন যে, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্যারেটো বর্ণিত সর্বাপেক্ষা কাম্য অবস্থার কথা আমরা ভাবতে পারি না, কারণ যুক্তি সঙ্গত ভাবে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দ তালিকা থেকে কোন সর্বজন গ্রাহ্য সামাজিক পছন্দের অবস্থা বের করানোই সম্ভব নয়। অ্যারোর এই তত্ত্বকেই এক কথায় অসম্ভাব্যতার তত্ত্ব (Impossbility Theorem) বলে। জনকল্যাণ অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের অবদান হল অ্যারো-র এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি প্রমাণ করা এবং জনকল্যাণের উপাদান হিসেবে কেবল দ্রব্য ভোগ থেকে ব্যক্তির তৃপ্তির কথা না বলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কথা বলা।

৪.

স্বাভাবিক ভাবেই অমর্ত্য সেনের সামাজিক চয়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব (Collective

Choice and Social Welfare) জনকল্যাণ অর্থনীতিতে নতুন দিগ্‌দর্শন ঘটাল। আমরা অবশ্য এই বইটি প্রসঙ্গে দূর থেকে শুনলাম (জনকল্যাণ অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই ষাট দশকের গোড়ায় স্নাতকোত্তর স্তরে যেটুকু) কিন্তু এই জনকল্যাণের সূত্র ধরেই অমর্ত্য সেন সত্তর দশকে আরো অনেকগুলি কাজ করলেন। এগুলির ভেতর সব থেকে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তন। এর আগে অবধি (এমন কি আমি যখন The Economics of Under Development লিখছি তখনও) আর্থিক উন্নয়ন বলতে বোঝাত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি+কাঠামোগত পরিবর্তন। স্বভাবতই এরকম সংজ্ঞায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি (?) ও দারিদ্র বৃদ্ধি দুই একসঙ্গে ঘটতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদই সেজন্য উন্নয়নের এই সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক সংজ্ঞার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছিলেন। অমর্ত্য সেনও তাদের অন্যতম হয়ে শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু আয় ভিত্তিক বিশ্বব্যাঙ্কের সূচকের বদলে মানবিক উন্নয়ন সূচকের (Human Development Index HDI) ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্ণয়ের বিষয়টিকে চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হলেন।

৫.

১৯৮১ সালে অমর্ত্য সেনের 'Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation' প্রকাশিত হল। সৌভাগ্যবশত বইটি আমরা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিনতে পারলাম (সবিনয়ে স্বীকার করছি যে, নিতান্ত অর্থাভাবে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, কোনদিক থেকেই আমরা ওঁর সব বই কিনতে পারিনি)। দেখলাম, অমর্ত্য সেন এখানে দুর্ভিক্ষের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ এই দুটি ব্যাপারের সঙ্গেই যে জিনিষটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহল স্বত্বাধিকার (Entitlement)। অমর্ত্য সেনের নিজস্ব সংজ্ঞায়, স্বত্বাধিকার হল পণ্যসমষ্টির উপর যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আমরা খাই পরি (অর্থাৎ বেঁচে থাকি)। এই স্বত্বাধিকার থেকেই আসে সক্ষমতা (Capability) অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় নানা জিনিষের উপর স্বত্বাধিকার কায়েম করার সামর্থ্য। অমর্ত্য সেন দেখান যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একালে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার পিছনে 'খাদ্য যোগানের হ্রাস' (Food Availability Decline বা FAD) থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বিনিময় অধিকারের অভাব (Failure of Exchange Entitlement বা FEE)।

কবুল করতে দ্বিধা নেই যে, অমর্ত্য সেনের উপরোক্ত বইটিতে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তিনি যে পরিমাণ তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন (আমাদের মত বেশির ভাগ বাঙালি মধ্যবিত্তের এক জন্মের কাজ !) তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো জ্ঞানগম্যি আমাদের ছিল না। কিন্তু বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমাদের পত্রিকায় সেজন্যই ওই বই এবং তার বক্তব্য সম্পর্কে আমরা অভিমত চেয়েছিলাম একজন বিশেষজ্ঞর কাছে। অধ্যাপক অসিতকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী। তাঁর নামও উল্লেখ আছে অমর্ত্য সেনের বইটিতে। কাজেই আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং তিনি অমর্ত্য সেনের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন। বাস্তবিক, আমরা এপর্যন্ত জানিনা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের তোলা প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের অভিমত কি রকম।

আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে লক্ষ্য করতে ভুলিনি যে, বাঙলা ভাষা এবং বাঙালি অমর্ত্য সেনকে অনেক দিন আগেই তার নিজস্ব চিন্তা চেতনাকে নির্বাসিত করে রেখেছে। ১৯৩৩ (অমর্ত্য সেনের জন্ম) থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় লেখক লেখিকাদের বর্ণানুক্রমিক সূচিতে তাই অমর্ত্য সেন ছাড়া সম্ভবত সকল মর্ত্যবাসী বাঙালিরই জায়গা আছে। কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা গেল, ওই 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই অমর্ত্য সেনের একটি অসামান্য সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। (শুভরঞ্জন দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার ১২ জুলাই, ১৯৮৬)। আমাদের ধারণায়, অমর্ত্য সেনের অর্থনৈতিক দর্শন ও ভাবনা-চিন্তা বোঝার জন্য এই সাক্ষাৎকারমূলক রচনাটির মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সাম্প্রতিক জীবনানন্দ প্রীতি ও অমর্ত্য প্রীতির ভেতর সত্যি সত্যিই 'তুমুল সমাচার' আছে !

৬.

'The Economics of Underdevelopment বইটির সুবাদে ভবতোষ দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সরাসরি ওঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেনি)। পরবর্তীকালে আনন্দ পাবলিশার্স-এর অর্থনীতি গ্রন্থমালার অন্যতম সম্পাদক অশোক রুদ্র (যদি আজও কেউ তাঁর 'জাসমিন' পড়েন !) আমাকে একান্ত 'আপনজন' করে নেন। অশোক রুদ্র কিভাবে অমর্ত্য সেনের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত একগুচ্ছ ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়ে 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' নামে তাঁর একটি মাত্র বাঙলা বই তৈরির ব্যবস্থা করেন সে সম্পর্কে

রুদ্র নিজেই ওই বইয়ের সম্পাদকের ভূমিকা-ও লিখেছেন। নিঃসংশয়ে বলা যায়, অমর্ত্য সেনের অর্থনীতি ভাবনা জেনে ও বুঝে নিতে একজন সাধারণ বাঙলা ভাষী পাঠকের কাছে এই বইটিও অপরিহার্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একদিন শুধালেন, অমর্ত্য সেনের 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' বইটা আমার পড়া আছে কিনা। 'হ্যাঁ' বলতে তিনি একটি পত্রিকা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, দেখ তো 'Review'টা কেমন হয়েছে। দেখলাম, সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া আছে বইটির। আমাদের হাতে তখন একটি ছোট পত্রিকা 'সক্রেটিস সাহিত্যপত্র'। ওই পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা ছাপা হল কিছু দিনের ভেতর। ভবতোষ দত্ত ও অশোক রুদ্র দু'জনেই খুশি হলেন ওই আলোচনা দেখে। ঠিকানা দিলেন অমর্ত্য সেনের। কোন প্রত্যাশা না রেখে কেবল লেখকের অবগতির জন্য পত্রিকা পাঠানো হল তাঁর কাছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তর এলো—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২৯শে জানুয়ারীর চিঠি এবং 'সক্রেটিস' পত্রিকাটির একটি কপি পেয়ে খুবই ভাল লেগেছিল। জবাব দিতে দেরি হল—মার্জনা করবেন। আপনার চিঠি যখন এলো, তখন আমি নিমোনিয়াতে বিশেষ ভুগছিলাম। 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি : অমর্ত্য সেনের বাংলা বই সম্পর্কিত আলোচনা' পড়ে খুব খুশী হলাম। প্রতিভাষা বিষয়ে যে সমালোচনাগুলি করেছেন তার যুক্তিযুক্ততা দেখতে পাচ্ছি। আমার করা পরিভাষা গুলির সপক্ষেও কিছু বলা যায়। কিন্তু আপনার বক্তব্যগুলিতে খুব সুন্দরভাবে অনেক ক'টি ভাল প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এবিষয়ে আপনার কাজকর্ম ভালভাবে এগোচ্ছে আশা করি।

নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থাকি বলে ইচ্ছে থাকলেও বাংলায় বিশেষ কিছু লেখা হয়ে ওঠে না। যা-ও হয়, তা-ও লোকে বিশেষ পড়েন বলে বোধ হয় না। 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' বিষয়ক আলোচনা তো খুবই কম হয়েছে—যে জন্যও আপনার লেখাটি পড়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করেছিলাম।

যোগাযোগ রাখবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে

অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেনের এই চিঠির তারিখ ছিল ২১.৬.৯১। ওই সময় আমি 'বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি' নিয়ে কাজ করছিলাম। পরবর্তী সময়েও সাহিত্য,

বিশেষত কবিতা আমার এখনই আসক্তির কেন্দ্রবিন্দু, যে তাকে ছেড়ে পুরোপুরি অর্থনীতির রুক্ষ বাস্তবতায় আমি সত্তা অর্পণের কথা ভাবতে পারি না। অমর্ত্য সেন কথিত সক্ষমতার অভাবও বাধা সৃষ্টি করেছে যথেষ্ট।

৭.

অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রভাত পটনায়ক বলেছেন যে তার পরিধি সম্ভবত অন্য সকল সমকালীন অর্থনীতি বিদদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক (Amartya Sen and the Theory of Public Action : EPW NOV. 7-13, 1998)। তিনি অন্তত ছ'টি ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের উজ্জ্বল উপস্থিতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল— ১) পরিকল্পনার তত্ত্ব, ২) কৃষি অর্থনীতি, (৩) সামাজিক চয়ন তত্ত্ব, (৪) অর্থ নৈতিক দর্শন, (৫) দারিদ্র, অসাম্য ও বেকারত্ব প্রভৃতি ধারণা ও সেগুলির পরিমাপ, এবং (৬) দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ। পরিকল্পনার তত্ত্বে অমর্ত্য সেনের অবদান রয়েছে বিখ্যাত 'মহলা নবিশ মডেল' প্রসঙ্গে। কৃষি অর্থনীতিতে জোতের আয়তন ও উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধান এই মুহূর্তে অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ যারা নেয় তাদেরও জানতে হয়। অর্থ-নৈতিক দর্শনে তিনি উপযোগবাদের পরিবর্তে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সক্ষমতার তত্ত্ব। অমর্ত্য সেন কৃত দরিদ্রের পরিমাপ আজ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত। বেকারত্ব সম্পর্কে তিনি ইউরোপকে সচেতন করে দেন তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে। তাঁর পরিমাপ কাজে লাগানো হয় আমাদের দেশেও। কিন্তু এই সব কিছু থেকে অমর্ত্য সেন যে কারণে আমাদের কাছের মানুষ তা হল ইদানিং-কালে এরকম উচ্চারণ শুনতে পাই 'The real problem is not that the world will turn beastly, but that it is beastly already, and it has been so throughout history, with human life being nasty,, brutish, short.' (শুভরঞ্জন দাশগুপ্তর প্রশ্ন থেকে : দেশ ১২ জুলাই ১৯৮৬)।

৮.

অমর্ত্য সেনের ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি সম্পর্কে বক্তব্য এই মুহূর্তে প্রায় সকলের কাছেই সুপরিচিত। তিনি ভারতের কথা বলতে গিয়ে বারংবার জোর দেন দেশের এক বিশাল জনসমষ্টির অটল অপুষ্ট ও অর্ধাহারের প্রতি আমাদের নীরব সমর্থনের উপর। তাঁর ভাষায়, আমরা সত্যি এক অদ্ভুত

পরিস্থিতিতে বাস করছি যেখানে এক দিকে সরকার লাখ লাখ টন খাদ্যসম্ভার মজুত রেখেছে, অন্যদিকে দেশেরই এক বিরাট অংশ ক্ষুধার্ত থাকছে। এই অবস্থাকে দিনের পর দিন সহ্য করা বা মেনে নেওয়া এক ধরণের রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিফলন। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে আমরা যথোপযুক্ত মূল্য দিতে পারিনি পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার)।

বাস্তবিক, ভারতের স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা যতখানি উৎসব মনস্ক, ততটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পুষ্টি সচেতন নই। অথবা যে আমাদের কথা ছিল সক্রিয় হওয়ার এই সব বিষয়ে তারা হাতে পাতে 'লাড্ডু' পেয়ে বসে যাচ্ছি পিকনিকে (মৃত আগ্নেয় গিরির শিখরে পিকনিক!)—অন্যদিকে, 'পৃথিবীকে বহুবার খতম করার ক্ষমতা এখন বহু হাতে, আমরা আজ একটি সম্পূর্ণ বিপজ্জনক বিশ্বে বাস করি' (পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার)। চল্লিশ বছর আগের স্বপ্নের রঙ আজকের দিনে আমাদের অনেকের কাছেই ধূসর, কিংবা কালো। প্রতিবেশি চীন ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবন-মান আমাদের দেশে নিচু। ব্রাজিল ও মেক্সিকোর থেকে আমাদের মাথাপিছু আয়ও অনেক কম। অমর্ত্য সেনের মতে, ভারতের কোন কোন অঞ্চল আজও আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের মতই ছায়াচ্ছন্ন। তবে পশ্চিম বাঙলার বামফ্রন্ট সরকারকে তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন—ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রসারের দিক থেকে। কিন্তু কেরলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেকথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি।

৯.

অমর্ত্য সেনের অর্থনীতি ভাবনায় আমরা এক ধরণের সমন্বয় প্রয়াস সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। তিনি ভারতের বিশ্বায়ন ও উদারিকরণ চান প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। চান যে বেসরকারী উদ্যোগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাক। কিন্তু এর মানে নয় যে অবাধ অর্থনীতির তিনি সমর্থক। বরং রেগন-থ্যাচার আমলের সরকারী উদ্যোগ হ্রাসের প্রচেষ্টার তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে উদারনীতির জয় ঘটেনি। বরং সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। কাজেই ভারতেও অতীতের মহলানবিশ মডেল ত্রুটিপূর্ণ ছিল না। ত্রুটি যা ঘটেছে তাহল সরকারের জনকল্যাণ বিষয়ে গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য। অমর্ত্য সেন ভারতের

মত পৃথিবীর সব দেশেই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলেন। কিন্তু গণতন্ত্র মানেই সরকারের অদক্ষতা নয়। তার দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়।

১০.

নিঃসন্দেহে, অমর্ত্য সেনের অসংখ্য অনুরাগীদের ভেতর আমি একজন। আমার অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পায় যখন শুভরঞ্জন দাশগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পড়ি, 'আমার সাহিত্যের জ্ঞান বেশি নয়। কিন্তু যতটুকু জানি তার প্রতি আমার আগ্রহ খুবই। যত বয়স বাড়ছে ততই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি যখন সাহিত্যিকদের কথা ব্যবহার করি তখন তার মধ্যে মতামতের গুরুতর কোন সমর্থন খুব একটা খুঁজি না। কিন্তু কঠিন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা সাহিত্যে খুবই চোখে পড়ে। সাহিত্যিকদের মাত্র কয়েকটি কথায় আমাদের ফলাও করে বলা অনেক বক্তব্য স্পষ্টরূপ নিতে পারে। যা বলতে চাইছি তারই সার্থক প্রকাশ সম্যক সাহিত্য থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি কার্যকরী বাক্যে। সংযোগ স্থাপনের জন্য, বক্তব্যকে স্বচ্ছ করে তুলবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যের ব্যবহার আমার কাছে লোভনীয়। একথা মানতেই হবে যে শেক্সপীয়র বা টলস্টয় সামাজিক সত্যগুলিকে অনেক সময়ই সমাজ বিজ্ঞানীদের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার ভাবে দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। আমরা অর্থনীতিবিদেরা যতই বড়াই করি না কেন যে আমাদের বিষয় দারুণ যথাযথ, নির্দিষ্ট, বাহুল্য-বর্জিত, আসলে কিন্তু অর্থনীতির প্রকাশভঙ্গি অস্পষ্ট, অকারণে জটিল। সুনির্দিষ্ট বৃক্ষের খোঁজে গিয়ে আমরা প্রায়ই অরণ্যের ঠিকানা হারিয়ে ফেলি। এহেন বিভ্রান্তিকর অবস্থায়,সাহিত্যিকদের রচনা আমাদের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলিতে এক নিমেষে ফিরিয়ে আনে। সাহিত্য শুধুমাত্র আমার সমস্যা ব্যক্ত করতে সাহায্য করেনি, সমস্যা নিয়ে ভাবতে প্রভূত সাহায্য করেছে।'

১১.

ভোর ছ'টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত খেটে বুধবার ১৪ই নভেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় তন্দ্রা এসেছিল একটু। আকাশবানী খবরটা জানাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রাপ্তি আমার, আমাদের মত অভিজাততন্ত্রের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত সকলের। একটি কবিতার জন্ম হল—

গ্রাম-বালকের কাছে রূপকথা
তুমি ছিলে একদিন

ছিল সাত-সমুদ্দুর, তেরনদী
শহর কলকাতা

ক্ষুধার ভেতর স্বপ্ন
ক্ষুধার ভেতর দেবতারা
রাজপুত্র তোমাকে দেখতাম

চল্লিশ বছর পরে আজ
কমলালেবুর রঙ কালো হতে হতে
ক্রমশ তা পচা ফল
চোখে পড়তে হৃৎপিণ্ডে কাঁটা

ছোট ঘরে ছোট পোকা
টেনে হিঁচড়ে হা-ক্লান্ত আত্মাকে বয়ে চলি
মৃত এক মুহূর্তের প্রান্ত থেকে
অন্য আরো অর্ধমৃত মুহূর্ত সীমায়

মাঝে মাঝে মনে পড়ে
অক্লান্ত ডানায়
তুমি আমাদের সেই স্বপ্ন-পাখি
এখনও উড়ে যাচ্ছ
ক্ষুধার্তের জন্য শস্যবীজ
মন্বন্তরে মৃত সব পিতৃ পুরুষের
এনে দিলে নতুন উত্থান
অমৃতের খোঁজে

বেতার তরঙ্গে অকস্মাৎ
আমাদের ছোট ঘরে, আমাদের লোহার খাঁচায়
তোমার সোনার কাঠি
ছোঁয়ানোর বার্তা ভেসে এলো

আবার কমলা-রঙ রোদ
আবার অনেক কাকাতুয়া
মেহগনি পল্লবের ছায়া

আমাদের অন্ধ ঘরে, আক্রান্ত সত্তায়
আবার নতুন গান
আবার নতুন অনুভব

তুমি সূর্য ছুঁয়ে ফিরলে
রাজপুত্র গ্রাম-বালকের
সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম, দুর্ভিক্ষ ও খরা
সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রাম, বন্যা মহামারী
সব মৃত্যু মরে গেলো, সমস্ত দহন

নতুন জীবনবোধে জেগে উঠলো
গ্রাম বাঙলা
দেশ থেকে মহাদেশে অনুর্বর হলুদ প্রান্তর।

কবিতাটি লেখার পর মনে হল, ভালো লিখেছি। কিন্তু তারও পর গ্রীবান্ধকারে জেগে থাকতে থাকতে ভাবলাম, সত্যি কী কবিতাটি ভালো? মধ্যবিত্ত বাঙালির রোম্যান্টিক এই উচ্ছাস—এর কী সত্যিই কোন মূল্য আছে বস্তির নোংরা ঘরে ধুঁকতে থাকা ক্ষুৎপীড়িত একজন ভারতীয় বা আফ্রিকানের কাছে! অথবা অমর্ত্য সেন বললেই কী বিশ্বের কোন দেশে ক্ষমতার অধীশ্বর মুষ্টিমেয় বেরিয়ে আসবে তাদের খোলস ও স্বার্থবুদ্ধির খোঁদড় ছেড়ে? কিংবা এও হয়তো এলিয়টের সেই শেষ চীৎকার—'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'—জীবনানন্দের····

'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিক্ নির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে' [মানুষের মৃত্যু হ'লে] □

সৌরকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ

উদয়ন ঘোষ

যত এই শতাব্দীর সমাপ্তি এগিয়ে আসছে, যতই জীবনানন্দের শতবর্ষ বয়স আসন্ন, ততই তিনি সৌরকরোজ্জ্বল হয়ে উঠছেন।

হয়ে উঠবার কথা ছিল না। কেননা তাঁর ও এখনকার সময়ের নগরীর মহৎ রাত্রিও লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। আবাসী জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতি-বৈতনিক, বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত। তদুপরি চোখে তাদের কালোশিরার অসুখ। কানে বধিরতা। পিঠে কুঁজ। গলগণ্ড মাংসে যেন নষ্ট শশা। পচা চালকুমড়োর ছাঁচে তাদের হৃদয় যেন। পরন্তু সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে মুখ দেখে, যতদিন মুখ দেখা চলে। অর্থাৎ অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে পৃথিবীতে আজ। তবু তিনি আমাদের কাছে সৌরকরোজ্জ্বল হয়ে উঠছেন ক্রমে।

উত্তর তিরিশে, অর্থাৎ ১৯৩০ এর পরবর্তী সময়ে বাঙলাভাষায় এই জীবনানন্দের আবির্ভাব। এই সময়কে বড় সহজ দুটো টাইটেলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ এখনো আছে—এক রবীন্দ্রোত্তর যুগ, দুই কল্লোল যুগ। এই দুই টাইটেলে উত্তর তিরিশের কোন কিছুই অবশ্য বোঝানো যায় না। অন্তত এই দুই টাইটেলে জীবনানন্দকে তো মোটেই বোঝানো যায় না। আসলে রবীন্দ্রোত্তর যুগ একটি কালকে বোঝায়, যা কমবেশি ১৯৪০ এর উত্তরকাল। ঐ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মানসিক জীবন-যাপন। তারপর তাঁর ক্লিনিকাল ডেথ হয়। কিন্তু তারপরই রবীন্দ্রনাথের মনন ব্যাপ্ত হতে থাকে বাঙালি মানসিকতায়। তাঁর পার্টিকুলার যে বাস্তবিক ইউনিভার্সাল, এবং শিল্প সাহিত্য যে বিশ্বমননের ব্যঞ্জনায় ধ্বনিপ্রসন্ন, এই ব্যাপারটা ক্রমে বঙ্গমননে স্পষ্ট হতে থাকে। রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলতে টেকনিক্যালি যা বোঝায়, তা কেবল এই বাঙলায়, হার্ংরি জেনারেশন (১৯৬০-১৯৭০) কালেই ব্যাহত হয়। এবং অধুনা বাঙলা গানের অ্যাংরি-জেনারেশন (তথাকথিত জীবনমুখী গান) এবং বাঙলা সাহিত্যের পোস্টমডার্ণ তথা ম্যাজিক রিয়ালিটির (১৯৫৫-অদ্যাপি) কালেই তা ছিন্ন হয়। জীবনানন্দ কমবেশি রবীন্দ্রনাথ বাহিত পথেই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যান। সেই অর্থে জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর বটে।

কল্লোল যুগেই (১৯৩০-১৯৩৫) জীবনানন্দের আবির্ভাব যদিও—তবে কল্লোল যুগের মানসিকতার মানুষ জীবনানন্দ নন। কল্লোল যুগ সচেতন ভাবে প্রবৃত্তি মুক্তির যুগ এবং বাহ্যত রবীন্দ্র বিরোধী তথা নিও-রিয়ালিজমের যুগ। এর কোন কোঠাতেই জীবনানন্দ পড়েন না। কেননা রবীন্দ্রনাথ বাহিত হয়ে জীবনানন্দ আসলে প্রো-পিপল এবং পোস্ট মডার্ণ ম্যাজিক রিয়ালিটির লেখক। 'সৌরকরোজ্জ্বল' নামে জীবনানন্দ যে কবিতা লিখেছিলেন ১৯৩০ এর কাছাকাছি সময়, সেই কবিতা পাঠেই সব কথা বোধগম্য হয়।
যেমন,

পরের খেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থকাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এ-সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে—ফসল ফলায়ে—তবু যুগে যুগে উড়ায়ে নিয়াছে
পঙ্গপাল।
কাল তবু—হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত
জাতক মানব ॥

স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি এমন প্রো-পিপল বাঙলা কবিতা আর পড়িনি। দেখেছি যেখানেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে 'ডায়লেকটিকসের প্রকাশ্য মেলবন্ধন হয়, সেখানেই গড়া-ভাঙা-গড়ার 'প্রোসেস' অগ্রগামী হতে থাকে।

প্রকৃতই, মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয় শেষ হবে আরো সব তৃতীয়-চতুর্থাদি আন্তর্জাতিক গ'ড়ে, ভেঙে, গ'ড়ে। আর এই দেশে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানবই হবে অগ্রগামী। এই ঐতিহাসিক সত্য জীবনানন্দ পেয়েছিলেন উত্তর তিরিশে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই।

বুঝতে বুঝতে, আমাকে, ১৯৭০ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

অথচ, ঐ সময়, এই ভাবনাও, জানবেন, জীবনানন্দের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। চরাচরের নানান সম্পর্কে এসে তার ঐ ভবিষ্যৎ বার্তা।

কিন্তু এই বার্তা পেয়েছিলেন কোনরূপ পোলিটিকাল ক্লাস না ক'রে। খোঁজ না নিয়েই বলতে পারি কোনো মার্কসীয় পাঠচক্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তবু ঐ বার্তা পেলেন।

এটা কোনো ম্যাজিকের ব্যাপার না। এটা রিয়ালিটিরই ব্যাপার।

জগৎ ও জীবনকে বুঝেই কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। চরাচরের নানান সম্পর্কে এসে যিনি ঐ কল্পনা করেছেন। যে কল্পনা ক্রিয়েটিভ ও অবজেকটিভ। কেননা আমরা কল্পনা করি, কল্পনাও বাস্তব। এবং মার্কসের ঐ কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য সারবত্তাও ছিল। যে স্বাতন্ত্র্য এসে গিয়েছিল, স্টাডি ও বিশ্লেষণের অলটারনেটিভ বিবর্তনে। এবং সৃজনধর্মে। জীবনানন্দও সেই মতো, কার্ল মার্কসের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেই, সত্যদর্শনের বস্তুবাদে আয়ত্ত করলেন সেই সত্যবিজ্ঞান, যা কিনা মার্কসীয় বস্তুবিজ্ঞান। এবং অবশ্যই ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক।

তদুপরি দেখুন, "পরের খেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো সুকঠিন নয় আজ"—এই অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের নিজস্ব।

যারা এই অ্যান্টিপিপল কাজ করেন, জীবনানন্দ দেখেছেন, "তাদের সমাজ —যে কোন পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে"।

এখানে 'পরের খেতের ধানে মই' এক কাল্পিট-স্টক ক্লেজ অথবা প্রবর্তন—তাকে ম্যাজিকের তুল্য রহস্যময় করলেন তিনি 'উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো'—এবং রিয়ালিটি এই যে 'সুকঠিন নয় আজ ঐ পরের খেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো।" অর্থাৎ সব ধান নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং "ভাঙনের নদীর শিয়রে" সেই ম্যাজিক, যা রিয়ালিটিতে, "ঐ পথের বাঁকে···· তাদের সমাজ" হয়।

সেই ধারা বা প্রোসেস কবির চোখে "তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—কিংবা এসব থেকে আসন্ন বিপ্লব ঘনায়ে ফসল ফলায়ে—তবু যুগে যুগে উড়ায়ে গিয়াছে পঙ্গপাল।" এখানে পঙ্গপাল সেই ব্যর্থতা, যা ডগমাটিজম থেকে উঠে আসা।

সব ম্যাজিক ছেড়ে, রিয়ালিটিতে, যে প্রত্যয় জাগে, তা হল, "তবুও নক্ষত্র-নদী-সূর্য-নারী—সোনার ফসল মিথ্যা নয়।" এবং এই বিশ্বাসও আসে, "মানুষের কাছ থেকে মনুষের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয় শেষ হবে।"

এখানে প্রথম 'মানুষ' ও দ্বিতীয়ে 'মানব' একদিকে পার্টিকুলার ও অন্যদিকে ইউনিভার্সাল-কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করে।

পরবর্তীতে সেই আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। পাঠক খেয়াল করুন, জীবনানন্দ তৃতীয়-চতুর্থ সব আন্তর্জাতিকের প্রসঙ্গ আনছেন। আমরা তো ভালোই জানি, কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল বার বার বসেও আজও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বলে সোবিয়েতের ম্যাপ বদলায়। তার পতাকাও বদলায়। এবং চীন শেয়ার মার্কেটে ঢোকে, কোকাকোলা খায়, গ্রাম পত্তনের শব্দ বাড়ে।

তাই জীবনানন্দ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অবলীলায় তাই ভাবতে পারেন—দীপ্তিমান রুষিজাত জাতক মানবের ভ্যানগার্ড অগ্রসরতা।

পাঠক, আপনি আরেকবার 'সৌরকরোজ্জ্বল' পড়ুন। বুঝুন যত এই শতাব্দীর সমাপ্তি এগিয়ে আসছে, যতই জীবনানন্দের শতবর্ষ—বয়স আসন্ন, ততই তিনি সৌরকরোজ্জ্বল হয়ে উঠছেন কেন।

তুলনীয়ঃ তিমির হনণে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী ॥ □

একুশ শতাব্দী নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়

কবি ঃ কাব্যে ও জীবনচরিতে

অরবিন্দ পুরকাইত

কবিরে তার জীবনচরিতে পাবে না—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি রবীন্দ্র তথা অন্যান্য কবিজীবন পর্যালোচনায় বারবার উঠে এসেছে। 'দেশ' শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যায় (২০ মে ১৯৯৫) শরৎকুমার এটিকে 'জামাই-ঠকানো কথা' বলেছেন। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এলে তিনি একটু ঠুকে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। যাইহোক, এটিকে শুধুমাত্র জামাই-ঠকানো কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

শরৎকুমার বলেছেন, পঞ্চাশের কবিদের ক্ষেত্রে উক্তিটি খাটে না। তাঁদের মধ্যে আবার কৃত্তিবাসীরা 'একটু বেশি খোলামেলা, লজ্জা-শরম ওদের কম। তাই ভান-ভণ্ডামিও কম।' ভাল কথা। তাই বলে কবির একটা গভীর অন্তঃপ্রদেশ থাকতে পারে না একথাও তো বুকে হাত রেখে বলা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে যে লোকটি সবচেয়ে বেশি কথা বলছে আসলে সেইই সবচেয়ে বেশি একা। বেশি কথা বলাটা আসলে নিদারুণ একাকিত্ব থেকে বেরিয়ে আসার প্রানপণ প্রয়াস মাত্র।

একথা ঠিক যে কবির এখন গোপন করার অবকাশ কম। কবি একটু নাম করলে বড় থেকে ছোট পত্রিকা, পুস্তকের প্রকাশক, প্রচার মাধ্যম কেবলই তাঁর কথা টেনে বার করে নিতে থাকে (তবুও, সকলের ভাগ্যে সে শিঁকে ছেঁড়ে না অবশ্য)। সেই টানে পড়ে অনেক সময় তাঁর নিজের জন্য রাখা অংশটুকুও বিতরণ করে বসতে হয়। কিন্তু তিনি কি সবটুকু বিতরণ করতে পারেন? পারেন, আবার পারেন না-ও। পারলেও, পরমুহূর্তেই কবি বিস্মিত হন এই দেখে যে সেখানে তখনি তখনও কিছু আছে এবং আরও বড় কথা হল কোন অদৃশ্য উৎস থেকে সেখানে জমাও হচ্ছে ক্রমশ (দেখা বা শোনা সেখানে অভিঘাত হিসাবে কাজ করতে বাধা নেই)। তাই একটা 'তবু' থেকে যায়।

এই তবু-র অনেকখানি নিহিত শব্দের সীমাবদ্ধতার মধ্যে। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মপোলব্ধি যেমন সারা জীবনে সম্পূর্ণ হবার নয়, শব্দের

শব্দের সাধনার ক্ষেত্রেও তাই। নিজেকে প্রকাশ করার, নিজেকে উপযুক্ত মেলে ধরার একটা বড় মাধ্যম শব্দ। সেই হিসাবে শব্দের ক্ষমতা অশেষ। কিন্তু সেই শব্দের সীমাবদ্ধতাও কবি সাহিত্যিককে নিয়ত পীড়া দেয়। কোনও বড় শিল্পী যেমন তাঁর শিল্প কর্মটি সম্পূর্ণ করার পরও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন না, বড় কবির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। সামান্যতম হলেও, এক অসম্পূর্ণতা তখনও তাঁকে পীড়া দিতে থাকে। আবার এমনও হতে পারে, নিজের সৃষ্টির দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠতে পারেন—একি আমার রচনা! কিংবা, আমি কি ঠিক এমনটিই চেয়েছিলাম!

বড় কবি-সাহিত্যিক শব্দ-সাধনার ক্ষেত্রে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারেন এই যা। সম্পূর্ণ তা হয় না কখনই। তবে সাধারণের থেকে তাঁরা অনুভূতিকে আরও গভীর বিস্তৃত এবং সুষ্ঠুভাবে ভাষার খাঁচায় ধরতে পারেন। যতটা ধরতে পারেন না তার অনেকখানি অনুভব করে নেন প্রকৃত পাঠক—নিবিড় পাঠের মাধ্যমে। কবি যতটুকু লেখেন প্রকৃত পাঠক করেন তার থেকে অনেক বেশি। কবিকে যতটুকু পাওয়া যাবে তা অনেকখানিই নির্ভর করে পাঠক পাঠের বাইরেও কতখানি পাঠ করলেন তার উপর।

পরের মন নাকি স্বয়ং নারায়ণও জানেন না। সাধারণ একটি মানুষকে বুঝতে আমাদের অনেক সময় সারা জীবনই কেটে যায়। সেখানে কবি আর একটু দুরধিগম্য বইকি! বিশেষত, কবি নিজে যখন নিজেকে প্রকাশের দীনতায় নিরন্তর ব্যথিত হন। 'বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না'—এমন কথা রবীন্দ্রনাথের মত কবি-সাহিত্যিক বার বার বলেছেন। এই বলার মধ্যে শুধু বিনয় দেখলে ভুল করা হবে। এ এক অনিবার্য সৎ স্বীকারোক্তি মাত্র।

কবিকে বিস্ময়-বালক বলাটা অত্যুক্তি হবে না। অন্য ভাবে বললে বলা যায় যে বিস্ময় হল কবির মূল এবং তা মূলধনও। একমাত্র এই বিস্ময়ের কাছে এসে মিলতে পারেন আস্তিক বা নাস্তিক। আর শব্দ দিয়ে বিস্ময়কে ধরার মত কঠিন কাজ আর কী আছে! '—শব্দ এত কম—শব্দ এত ঠকায় জানা ছিল না। একটা গাঢ় অনুভব ফ্যাকাশে শব্দ দিয়ে ধরতে কে চায় বলো?....' শক্তির এই আর্তি কি আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি না? অথবা সুনীলের এই স্বীকৃতি: এখনো কিছুই লেখা হয়নি। দৃষ্টি বিভ্রমের মতন মুহূর্মুহু

সত্যভ্রম হয়, ভাষা কিংবা রূপও আলেয়ার মতন। যা লিখতে চাই, তা এখনো কিছুই লিখতে পারি নি।

বিষ্ণু দে বলছেন, লিখব ইচ্ছা করলেই লেখা যায় না, অথবা যা লিখব মনে ছিল তা লেখায় হয়ে ওঠে অন্য রকম। প্রেমেন্দ্রর ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস আমাদের মধ্যেও বাজে, 'কি কথা বলতে চাই বলতে পারছি না। বুকের ভিতর কি কথার ভিড় বন্ধ ঘরে মৃগনাভির তীব্র ঘ্রাণের মত নিবিড় হয়ে উঠেছে, তবু বলতে পারছি না। কত রকমের কত কথা—তার না পাই খেই না পাই ফাঁক। হাম্মাহানার বন্ধ কুঁড়ির মত টনটন করছে সমস্ত প্রাণ—কিন্তু পারছি না বলতে।....কত কথা ভাই—যদি বলতে পারতুম!' এখানে 'ভাই' তথা পত্রপ্রাপক বন্ধু অচিন্ত্যকুমার। এখন এমনটি কেন হয় তা দেখার।

বাউল বলেছিল, আপনারে আপনি চিনি নে। কবি তাঁর কথা একেবারে খোলসা করে বলবেন কি, তিনি নিজেই কি ঠিকমত সব সময় বুঝতে পারেন নিজেকে! কবির মধ্যে একাধিক সত্তা দুর্লক্ষ্য নয়। তাছাড়া যে কোনও ভাবনা কবিকে তার সম্পূর্ণ রূপ না-ও দেখাতে পারে। ভিন্ন ভাবনা এসে সরিয়ে দিতে পারে পূর্ব ভাবনাকে। অনেক সময় মাথা কুটে মরলেও কবি আর পূর্বের তাকে পান না। কখনও অনায়াসে কোনও পঙক্তি আবিষ্কার করে ফেলেন কবি। তারপরে অনেক চেষ্টা করেও তাকে সেই ভাবে আর বাড়াতে পারেন না কিছুতেই। আবার অনায়াসে আসা পঙক্তি অজান্তেই হারিয়ে যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র একস্থানে বলছেন, "মনের মধ্যে একটা বিরাট ভাবের উদয় হয়েছিল, কিন্তু সব ভাষা ওই গুরুগম্ভীর 'নমো নমো নমো'র মধ্যে এমন একাকার হয়ে গেল যে কবিতাটা বাড়তেই পেল না। কবিতার সমস্ত কথা ওই 'নমো নমো নমো'র মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে রইল।"—এমনও হয়। কোনও কবিতার তৃতীয় লাইনটা লেখা নাকি সবচেয়ে শক্ত।

জীবনচরিত কবি নিজে লিখতে পারেন। অথবা অন্য কেউ। কবি যদি লেখেনও, নিজেকে সম্পূর্ণ করে তাতে তুলে ধরতে পারেন কি? সাধারণত জীবনচরিতের ভাষা অকপট গদ্য। কোথাও তা কাব্যময় হতে পারে এই যা। কিন্তু কবির অন্তর্গতকে গদ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া মুসকিল। বরং কবিতার মহৎ কপটতার মধ্যে, রহস্যময়তার আবডালে অনেক বেশি বলা যায়। কারণ সেখানে কল্পনাকে উস্কে দেওয়া যায় অনেক বেশি। অনেক বেশি খাটিয়ে নেওয়া যায় সেখানে পাঠককে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না

তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ।...এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর এক দিকে অস্পষ্ট কথারও।' বলছেন, সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।

আর কবির জীবনী অন্যে রচনা করার কাজটা আরও বেশি শক্ত। বলা হয়ে থাকে যে কোনও বড় কবির জীবনী অন্য কোনও বড় কবি ছাড়া রচনা করতে পারেন না সুচারু ভাবে। তেমন সংযোগ জগতে অত্যন্ত কম। বিখ্যাত কবিদের বাজারচলতি জীবনী পড়লেই এসব কথা বেশ ভালভাবেই টের পাওয়া যায়। "যে কোনও রবীন্দ্র গবেষকের কাছে 'রবিজীবনী' তাই আজ অপরিহার্য"—একথা এবং একই সঙ্গে 'রবিজীবনী'কে 'চিরস্মরণীয় চিরস্থায়ী' বললেও সুতপা ভট্টাচার্য প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী সম্বন্ধে এ প্রশ্নও তোলেন, 'জানা যায় অনেক—রবীন্দ্রজীবন এবং রবীন্দ্র রচনা বিষয়ে। কিন্তু রবীন্দ্র নাথকে জানা যায় কতটা?' এখানে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে বলা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বলছেন: যারা আমার জীবনী লিখতে শুরু করে, আমার এত খারাপ লাগে, কে জানে আমার জীবনের কি? এই সুদীর্ঘ জীবন কি করে কাটিয়েছি, কি ভেবেছি, কি পেয়েছি, কি বেদনা, কি আনন্দ কত রকম experience তার কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ কত শত শত দিক, কে তা জানে বল? কে আমার জীবনী লিখবে? কেউ আমাকে এতটুকু দেখেছে, কেউ বা আর এতটুকু, কিন্তু না দেখা অংশটা যে অনেক বেশি। তাই আমার খারাপ লাগে কেউ যখন ফস করে লিখে বসে,—মানুষ রবীন্দ্রনাথের খবর? কতটুকু তার তোমরা দেখেছ? তিনি নিজে কেন লিখবেন না?—মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: সে হয় না, সে হয় না। যে পর্যন্ত হয়, সে পর্যন্ত ছবি মাত্র, সে পর্যন্ত তো লিখেছি, কিন্তু যখন সত্যিকারের জীবন শুরু হলো, সে আর লেখা হয় না। লিখতে গেলে আবার সেই experience-এর মধ্যে চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়,—সে বড় বেদনা! আর দেখো ঐ ডায়েরি; সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হলো না; emotion-এর একটি গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়। অভিজ্ঞতা বলে যে কোনও কবি যদি তাঁর যৌন জীবনকে, অন্তত খানিকটাও, সর্বসমক্ষে আনেন তবে সেই জীবনচরিত 'সাহসী' এবং 'অকপট' হওয়ার দিকে দশ পা এগিয়ে থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি অনেক অপ্রিয় তথ্য রূঢ় সত্য গোপন করে যেতে পারেন, কত অনেক অন্যায়কে জীবনচরিতে ঠাঁই না-ও দিতে পারেন, কত মানুষের কাছে তিনি অজস্র ছোট-বড়

দুঃখের কারণ হয়েছেন সে সব অনুল্লেখ রেখে যেতে পারেন জীবনচরিতে। তবে তাকে 'সৎ' তো দূরের কথা, সত্যিকারের 'সাহসী' এবং 'অকপট'ও বলতে পারব কি ?

শক্তি সম্বন্ধে, শরতের উক্ত রবীন্দ্রোক্তিকে অসার মনে হতে পারে, কারণ শক্তি তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু এক দিক থেকে বলতে গেলে কাছের মানুষের আন্তর-উন্মোচন তুলনামূলক ভাবে বেশি শক্ত। কেন না সেই মানুষের যাবতীয় দ্বন্দ্ব বড় বেশি দোলাচল সৃষ্টি করে উন্মোচনকারীর মধ্যে। শঙ্খ লিখেছেন, 'অপূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে চলমান সেই দ্বন্দ্বের ইতিহাসই একজন কবির মনের ইতিহাস। কবির পক্ষে সেটা তাঁর মনের ইতিহাসও বটে ; অন্তত সেই রকমই ভাবতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।' এই ইতিহাস রচনা বড় সহজ কাজ নয়। এটা শরৎ নিজেও টের পাবেন যদি কোনও দিন তিনি শক্তির জীবনী লেখাতে হাত দেন। আমাদের তা পাওয়ার সৌভাগ্য হবে না বোধহয়।

কৃত্তিবাসীদের সম্বন্ধে শরৎ কুমার যে অভিজ্ঞানপত্র দিয়েছেন তা স্বীকার করেও কিছু বলার থাকে। শক্তির দিকে একটু তাকালেই তা আমাদের কাছে ধরা পড়ে। মীনাক্ষী বলেছেন, ওর মধ্যে অনেকগুলো ব্যক্তিত্ব ছিল। শক্তি বলেছেন, কবিতা লেখে যে সে অন্য শক্তি চট্টোপাধ্যায় (একটু অন্যভাবে প্রায় একই সুর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও)।

শক্তি নিজেকে বলেছেন 'সংসারে সন্ন্যাসী'। মীনাক্ষীকে লিখেছেন, 'মাঝে মধ্যে পাগলামি ভর করে। কেন করে, কে জানে। আমি তো অসুখী নই। অভাব বলতে কিছুই নেই আমার।' 'আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা' করতে থাকা এই 'বিপন্ন বিস্ময়'কে কি সব সময় প্রকাশ করা যায় ?

শক্তি লিখেছেন, 'সমস্ত যন্ত্রণার থেকে বড়ো ধরণের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না ॥'

লিখেছেন, 'আমি আগাগোড়াই ভীষণ একা।' 'শুকনো প্রাণ নিয়ে আমি বহুদিন জীবন্ত ভিক্ষুক !' আরও লিখেছেন, 'আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন / পেতে থাকি রক্তে ঐ আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের / উচ্চারণ : অন্ধ আমি [হায় অন্ধ] অন্তরে-বাহিরে !' এ-সবের বিস্তৃত সহজ-সরল ব্যাখ্যা

কি সম্ভব জীবনচরিতে ?

কথা হল, কবির জীবনীতে, 'না এলেই ভাল হ'ত অনুভব করে'ও, 'এসে যে গভীরতর লাভ হল' তার হিসাব কতটুকু পাওয়া যায়! এ হিসাব তো বড় জটিল—সাধারণ কোনও হিসাব পদ্ধতিতে যে একে কুলায় না। আসলে সব আনন্দ-বেদনা, সব মানস-জটিলতার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় না।

আমার সবটাই আলো আমার সবটাই অন্ধকার

আমার সবটাই জন্ম আমার সবটাই মৃত্যু-দ্বার (শঙ্খ)। শেষ পর্যন্ত না বলা বাণীর আকুলতা নিয়েই যেতে হয় কবিকে।

অচিন্ত্যকুমার বলছেন, '…কথা আছে, যার লেখার তুমি ভক্ত কদাচ তাকে তুমি দেখতে চেও না। দেখেছ কি তোমার ভক্তি চটে গিয়েছে। দেখে যদি না চটো, চটবে কথা শুনে। নির্জন ঘরে নিঃশব্দ মূর্তিতে আছেন, তাই থাকুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় উলটো। সংসারে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যতিক্রম, যাঁর বেলায় তোমার কল্পনাই পরাস্ত হবে, চূড়ান্ততম চূড়ায় উঠেও তাঁর নাগাল পাবে না। আর কথা—কণ্ঠস্বর ? এমন কণ্ঠস্বর আর কোথায় শুনবে ?' সেই অচিন্ত্যকুমার যিনি 'যথার্থ অহংকার'-এ সম্মুখে পথ রোধ করে থাকা রবীন্দ্রনাথকে ভয় না করার 'দুর্দান্ত সাহস' দেখিয়েছিলেন। তিনি আরও বলছেন, নিভৃত ঘরের জানালা থেকে দেখা অচেনা আকাশের নিঃসঙ্গ একটি তারার মতই দূর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমারের উক্ত উপলব্ধির সাক্ষর ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যধন্য আরও অনেকের লেখায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, অন্তত খানিকটা হলেও, বলতে পারেন, 'তুমি যারে জান সে যে কেহ নয় কেহ নয়।'

কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে—উক্তিটির উল্লেখ করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, 'খুব খাঁটি কথাই বলেছেন। পাবে না এই কারণে যে জীবন আর জীবনচরিত এক নয়। গোটা জীবনটা জীবনচরিতে ধরে না, অনেকটাই বাদ পড়ে যায়।…যতখানি বলেন না বলা থেকে যায় ততখানি। মনে রাখতে হবে যে কীর্তির চাইতে কর্তা বড়। কৃতিত্বের বাইরে ব্যক্তিত্বের যে অংশটা পরিমাণে এবং গুণমানে কিছু কম নয়। দোষে গুনে মিলিয়ে মানুষটা সেখানে জীবন-চরিত বা রচনাবলীর মানুষটির চাইতে ঢের বেশি জীবন্ত।….' একথা শুধু হীরেন্দ্রনাথের নয়, অনেকেরই।

আমরা শেষ পর্যন্ত এই-ই বলতে পারি যে জীবনচরিতে কবিকে অবশ্যই পাওয়া যায় আবার যায়ও না। আসলে সে পাওয়া অসম্পূর্ণ পাওয়া। পাওয়ার স্বভাবই তাই। □

এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিনয়তোষ

জগৎপতি সরকার

ভারততত্ত্ব গবেষণা ও পঠন পাঠনের জন্য সারা বিশ্বের প্রাচীন যে কেন্দ্রগুলো আজ চোখে পড়ার মতন সেগুলোর মধ্যে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অন্যতম। শুরুতে এর উদ্দেশ্য সারা এশিয়ার নানা বিষয়ের গবেষণা, পঠন-পাঠন হলেও মূলতঃ ভারততত্ত্ব অনুশীলনের মধ্যেই সে তার কর্মপরিধিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পেছনে যে দুটি মূল কারণ কাজ করেছিল তা হচ্ছে তখনকার দিনে ইংরেজ কর্মচারীরা যে সমস্ত পুরা ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ নানাদিক থেকে সংগ্রহ করতেন সেগুলোকে একটি জায়গায় সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ এবং অপরটি হচ্ছে গবেষণার জন্য একটি সংস্থা নির্মাণ যেখানে পণ্ডিতবর্গ এসে তাঁদের মত বিনিময় করতে পারেন। আজও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী স্যার উইলিয়ম জোনস্ যার প্রতিষ্ঠাতা তার সঙ্গে আজ সারা বিশ্বের নানা জ্ঞানী গুণী ওবিদগ্ধ মানুষের যোগসূত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হয়েছেন আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে সোসাইটির প্রথম ৩০ বছরের ইতিহাসে কোন ভারতীয়ের সোসাইটিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। যাই হোক, এশিয়াটিক সোসাইটির ২১৫ বছরের ইতিহাসে তার অগ্রগতি ঘটেছে নানা বিষয়ে গবেষণার সমৃদ্ধিতে। আজ বহু স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানবিদ, ভাষাবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এখানে নানাবিষয়ের গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে নানান দিগন্ত, যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাস, পুঁথিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব যার সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ইতিহাসের নানা দিক, রবীন্দ্রগবেষণা, দর্শনচর্চা, লোক সংস্কৃতি, লোকচর্চা প্রভৃতি বিষয়।

এশিয়াটিকের বিশাল বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে আর একটি নাম চির অম্লান যাঁর জন্ম শতবর্ষ প্রায় নিঃশব্দে চলে গেল গতবছর। তিনি হচ্ছেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের ৬ই জানুয়ারী বর্ধমান জেলার দেরাসিন গ্রামে। পিতা সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (১৮৫৩-১৯৩১) মাতা হেমন্তকুমারী দেবী। বিনয়তোষ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার স্কটিশচার্চ

কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক নিয়ে এম. এ পাশ করেন, আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রথম পি এইচ ডি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁর পি এইচ ডির বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় বৌদ্ধমূর্তি তত্ত্বের উপাদান। (Elements of Indian Buddhist Iconography) সারস্বত জগতে এই প্রবন্ধ পুস্তকটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে দেখি তিনি আরও নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানচর্চাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত করেছেন। নানা সামান্য বিষয়ের সমন্বয়ে নিজে হয়েছেন অসামান্য। তিনি বিচরণ করেছেন মূর্তিতত্ত্ব, ধর্ম, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, তন্ত্রশাস্ত্র এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রেও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী ও পারঙ্গম। বিনয়-তোষের কর্মজীবনের বেশিরভাগ অংশটাই কেটেছিল বরোদায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বরোদা মহারাজের আহ্বানে গাইকোয়ার ওরিয়েন্টাল সিরিজের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। বরোদায় থাকাকালীন তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত করেছিলেন বিদগ্ধ সমাজে। বরোদার রাজা বিনয়তোষের পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'রাজরত্ন' এবং 'জ্ঞানজ্যোতি 'উপাধি প্রদান করেন। তাঁকে 'গোল্ডেন জুবিলি' পদকও উপহার দেওয়া হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে বিনয়তোষ নিজেকে সংযুক্ত করেন ১৯২৪ সালে ৭ই মে তার আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করে। তখন অবশ্য আজকের কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির নাম ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। মিঃ জোহান ভ্যান মেনন তখন তার সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনটি ফাইল দেখা যায় বিনয় তোষের নামে। সংখ্যা-গুলো যথাক্রমে ১৪৬৭, ১৮৭৫ ও ১৮৮৭। উক্ত ফাইলগুলিতে বিনয়তোষের ৩৬টি চিঠি পাওয়া যায় নানা সময়ে সোসাইটিকে লেখা নানা বিষয়ে এবং অনেক সময় সোসাইটি থেকে তাঁকে পাঠানো চিঠির উত্তর। উক্ত চিঠিগুলি আজ সোসাইটির নিকট এক অমূল্য তথ্য। নানা পত্র-পত্রিকায় দুশোর বেশি মৌলিক প্রবন্ধ সম্ভারের লেখক বিনয়তোষের প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল. Elements of Buddhist Iconography (1924, 1958), An Introduction to Buddhist Esoterism (1932), Sadhanamala (2 vols—1925, 1928), Guhya Samajatantra (1931), Two Vadrasana works (1929), Nispanna yogavali (1949), Sakti-sangama tantra (3 vols—1932, 1941, 1947) প্রভৃতি। উক্ত গ্রন্থগুলি সবই ইংরেজি ভাষায় লেখা আর বাঙলায় লেখা গ্রন্থটি হচ্ছে 'বৌদ্ধদের

দেবদেবী' (বিশ্বভারতী, ১৯৫৪)। 'সাধনমালা' গ্রন্থটি বিনয়তোষ যখন প্রকাশ করেন তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথির সাহায্য যে নিয়েছিলেন একথা আজ আমরা তাঁর চিঠিপত্রের আদান প্রদান থেকেই জানতে পারি। এছাড়া আমরা জানতে পারি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদককে আলাদা একটি পত্রে বিনয়তোষ সোসাইটির সংগ্রহে থাকা 'প্রজ্ঞাপয়োবিনিশ্চয় সিদ্ধি' পুঁথিটি সংগ্রহ করতে চাইছেন। পুঁথিটি মহাযান বৌদ্ধদের একটি মূল্যবান সম্পদ।

১৯২৫ সালের ২৭শে মার্চের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে বিনয়তোষ সোসাইটির সংগ্রহে থাকা 'মানসোল্লাস' পুঁথিটি খোঁজ করছেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি সেটি সম্পাদনাও করেন। ১৯২৬ সালের ১০ই জুন বিনয়তোষ সোসাইটির সম্পাদককে একটি চিঠি লিখেছেন 'তথাগতগুহ্যক' পুঁথিটি তাঁকে পাঠানোর জন্য। 'তথাগতগুহ্যক' গ্রন্থটি বৌদ্ধ তন্ত্র বিষয়ক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ এবং এর কাল সম্ভবতঃ ৫ম শতাব্দী। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটিও বিনয়তোষ সম্পাদনা করেছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্র পুঁথি সংগ্রহের ও গবেষণার পেছনে বিনয়তোষের একটা উদ্দেশ্য হয়তো কাজ করেছিল হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে আসল সাদৃশ্যটাকে তুলে ধরা এবং তার সম্পর্ক স্থাপনকে দৃঢ় করা। যেটা প্রমাণিতও হয় পরে। যাইহোক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মের একটি চিঠি থেকে জানতে পারি যে বিনয়তোষ সোসাইটির সংগ্রহে থাকা দুটি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে চাইছেন। একটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'শকুন্তলা' এবং অপরটি হচ্ছে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের 'শকুন্তলা'। অবশ্য সোসাইটির তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বিনয়তোষকে তখন ঈশ্বরচন্দ্রের 'শকুন্তলা' গ্রন্থটি দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়টি দিয়েছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিনয়তোষ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং তার পরিবর্দ্ধন করেছিলেন নানাভাবে। এর দ্বারা তিনি যেমন উপকৃত হয়েছিলেন তেমনি সোসাইটির গবেষণার সম্ভারও সমৃদ্ধ হয়েছিল প্রচুর। সেই সম্ভার আজ আমাদের দিতে পারে নূতন দিগ্‌দর্শন এবং তা হয়ে উঠতে পারে উত্তর কালের নূতন গবেষণার আলোর দিশারী।

বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্য এবং একাধিক প্রাদেশিক ভাষার উপর তাঁর কর্তৃত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। একদিকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, আর অন্যদিকে হোমিওপ্যাথি এবং বিকল্প চিকিৎসায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা এবং প্রতিভা তাঁকে দান করেছিল মহত্ত্ব। তাঁর বদান্যতা, দীন-দরিদ্র্যের প্রতি মমতা, বন্ধুবাৎসল্য, ছাত্রপ্রীতি, কর্তব্যবোধ ও স্নেহপরায়ণতা তাঁকে আরও গুণান্বিত করেছিল সন্দেহ নেই। অবশ্য সেই বিচারে তিনি কখনও প্রচারের পাত্র হয়ে ওঠেন নি। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাই আজও প্রচার বহির্ভূত। □

মেয়েদের কিছু একটা হয়েছে

যশোধরা রায়চৌধুরী

কি খাবে তোমরা ? আ, সন্তু, কি খাবি ? আগে মোমোটাই নিয়ে নিই, কি বলিস্ ?

বলে তপোব্রত সন্তুর দিকে তাকালো। সন্তু, একবার অপরা একবার তপোব্রতর দিকে তাকিয়ে, রঙিন প্লাস্টিকের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'যা তোর খুশি।'

চাণক্যপুরীর এই রেস্তোরাঁগুলো দারুণ। ওপেন এয়ার। ছোট ছোট ঝুলন্ত বাতির তলায় লালনীল চেয়ার। দিব্যি ঘরোয়া।

সন্তু দোকানের সামনের দেওয়ালে লেখা বিভিন্ন ভাষার আঁকিবুঁকিগুলো পড়ছিল। এখানে সব রেস্তোরাঁর দেওয়ালেই ইংরিজি ছাড়াও আরও কোন একটা ভাষায় লিখিত বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়বে। অধিকাংশই রুশভাষা। ট্যুরিস্টরাই বেশি আসে চাণক্যপুরীর এই সস্তার তিব্বতি খাবারগুলোর ঠেকে। ওদের পাশের টেবিলেই দুতিনটে ঘোড়ামুখো সাদাচামড়া। রাশিয়ানই হবে। কাছেই একটা এস টি ডি-র হলুদরঙা বুথ। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার পরে এখন হাফ রেটের ভিড় তার সামনে।

তপোব্রত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেনুকার্ড পড়ছিল। চিকেন মোমো পঁচিশ, পর্ক মোমো কুড়ি। পর্কটা অর্ডার দিতে গিয়েও কিছু একটা মনে হওয়ায় থমকে গেল, আর সন্তুর দিকে তাকিয়ে, গেলাসের গায়ে আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটায় ব্যস্ত অপরার দিকে তাকিয়ে, তারপর শূন্যে ছুঁড়ে দিল কথাটা : পর্ক মোমোই নেবো তো ?

আসলে সন্তু পর্ক খায় কি না সেটা তপোব্রতর মনে পড়ছিল না এই মুহূর্তে। বহুবছর পরে সন্তুর সঙ্গে এরকম কোথাও খেতে আসা। কলকাতায় গেলে ওর সঙ্গে খেতেটেতে যাওয়া হয়ই না বড় একটা, আর দিল্লি তো সন্তু এল বলা চলে সেভাবে এই প্রথম, তপোব্রত চাকরি পাওয়ার পরে, তাও আবার একা

অপরাকে নিয়ে, এইটি নাইন-টাইনে হবে, তখন তপোব্রত দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে···

তপোব্রত সন্তুর উত্তরের জন্য সন্তুর দিকে তাকালো। অপরা, সন্তুর বান্ধবী, পাশের টেবিলের কীর্তিকলাপ দেখতে ব্যস্ত। সন্তুর মুখ ভাবলেশহীন। ব্যাটা বামুনের ছেলে, অন্তত টাইটেল তাই বলে। পৈতেটা বহুবছর আগেই বিদেয় হয়েছিল। পর্ক? বীফ খেয়েছিল একবার কলুটোলায় আলির দোকানে। সন্তু এমনিই কথা কম বলে। কাজের কথা আরও কম। সুতরাং উত্তরটা এল না।

তপোব্রত বলল: 'তুই তো পর্ক খাস, মনে পড়ছে বন্দুরে। আর ও? ও পর্কটক খায় তো, নাকি? অপরার দিকে তর্জনী তুলে দেখাল।

সন্তু আবার নিরুত্তর। অপরা গেলাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। ধুসর হয়ে আসা টেবিল ম্যাটে নৃত্যরত জাপানি মেয়ের ছবির উপরে গেলাসের গোল দাগটার উপরে। তারপর তপোব্রতর দিকে প্রায় না তাকিয়ে, খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে, প্রায় উড়ো মন্তব্যের মত করে বলল, আমি পর্ক খাই কিনা তা ও কি করে জানবে? ও আমার মালিক নাকি?

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে, হেসে বলল—কি, তুমি জানো নাকি, আমি পর্ক খাই কি না? এনিয়ে কোনো কথা হয়েছে বলে আমার তো মনেই পড়ছে না।

ওর চোখা চোখের তলায় ছিলবিল করছিল ব্যঙ্গ। সন্তুর শান্ত চোখেও এবার হাসি ছড়াচ্ছে, মৃদু, খুব মৃদু। তপোব্রত অপ্রস্তুতের মত, সামান্য। অপরাকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু দিল্লি এসেছে, এটা ঠিক সন্তুই বেসিক্যালি তপোব্রতর বন্ধু, আর অপরাকে ও প্রায় চেনেই না, এটাও ঠিক। তাহলে? প্রশ্নটা সন্তুকে করায় কি দোষ হয়েছে কিছু? অপরার কি খারাপ লাগল ব্যাপারটায়? না এমনি, ফচকেমি করছে শুধু? মুখ দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না, অথচ কথাটা আলটপকা বললেও তার মধ্যে একধরণের ঠেশ আছে। সামান্য ঝাঁকালো। 'আমির' উপর একটু বেশি জোর।

তপোব্রত একটু অফ হয়ে গেল, একটু অন্যমনস্ক। আমি টা বেশি এই মেয়েটার। কেমন, মেয়েটা? এই অপরা? একটু কৈফিয়ত দেবার মত করে তপোব্রত বলল: আসলে প্যাট্রিয়ারকাল সোসাইটি তো। তাছাড়া তুমি ওর সঙ্গে এসেছো। তাই ওকেই জিজ্ঞেস করা সমীচীন হবে ভাবলাম, বুঝলে না?

হাসি মেলালো না মুখ থেকে, কিন্তু অপরা যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও

মুখ বন্ধ করে নিল। কি বলতে যাচ্ছিল সেটা বুঝল তিনজনেই। একটু অস্বস্তিকর নীরবতা এখন খেলা করছে তিনজনের মধ্যবর্তী শূন্যতাটুকুতে। সন্তু এতক্ষণ কিছু না বললেও এখন আরো একটু বেশি চুপ যেন, তার কথা ঘুরে গেল, কথা ঘুরে যাচ্ছে, কথা ঘুরে গেল তপোব্রতর মায়ের দিকে : 'আমার মা, বুঝলি তো, বাড়িতে পর্ক ঢুকতে দেয় না'....

'চাউমিনটা অসামান্য' গোগ্রাসে খেতে খেতে অপরা বলল।

'মোমোটা চমৎকার।' সন্তু ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছল। তপোব্রতর একা লাগছিল। সামান্য একা। পুরনো বন্ধুকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। এমনিতেই শান্ত সন্তুকে একটা জবরদস্ত নিষ্ক্রিয়তা যেন পেয়ে বসেছে। অপরাকে ডিটো দেওয়া ছাড়া যেন ওর কোনো কাজ নেই। কেন এমন হয়? প্রেম করে কি সন্তুটা ভেড়ুয়া বনে গেল নাকি? অপরার সঙ্গে কেমন সারাক্ষণ লটকে রয়েছে দেখো...

সকালে যখন তপোব্রতকে প্রায় ঘুম থেকে তুলে চমকে দিয়েছে আচমকা দুজনে, তখনই আশ্চর্যভাবে চোখের উপর ফুটে উঠেছে ব্যাপারটা। কি ব্যাপার, এক্ষুণি রাজধানী থেকে নামলি নাকি? কোনো খবর না দিয়ে...হেসেছিল তপোব্রত, সন্তুটা এমন আনপ্রেডিক্টেবল—কাজকম্মোগুলো এতো অদ্ভুত ওর! কিন্তু ওরা যে সেদিনই ট্রেন থেকে নামেনি সেটা বুঝতেও বেশি দেরি লাগেনি ওর, দুজনেই স্নান করে এসেছে, পাটভাঙা জামাকাপড় পরে, তার মানে, তার মানে...

অপরার সঙ্গে তপোব্রতর আলাপ খুব বেশিদিনের নয়, তবু ঠোঁট কাটার মত অপরাই বলল, রাজধানী থেকে নামতে যাবো কেন, আমরা তো দুদিন আগেই দিল্লি এসে গেছি....

সন্তু ঠান্ডাভাবে বলল : আসলে তোকে করব করব করেও ফোনটা করা হয়নি।...পরশু থেকে ভাবছি...তারপর ভাবলাম সারপ্রাইজ দেওয়াই ভালো।

—ছিলি কোথায়? তপোব্রতর রাগ হয়েছে সামান্য কিন্তু প্রেমে-পড়ে-পাল্টে-যাওয়া বন্ধুকে নিয়ে রাগ করেই বা কি লাভ, ও বুঝে নিয়েছে যে ওরা কোনো একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছে...হ্যাঁ, বন্ধুর বাড়ির থেকে বেশি প্রেফার করেছে ওরা হোটেল...সন্তু পারল এটা তাহলে...কি করে পারল...

—এই তো, ওখলায়, একটা গেস্ট হাউসে, অপরা অ্যারেঞ্জ করেছিল।

—ভালো?

—হেব্‌বী। এ. সি রুম। বত্রিশ পাটি বের করে হাসল সন্তু।

দুপুরে খেতে বসেছে যখন ওরা, তপোব্রতর মা আসল কথাটা না বলে আর থাকতে পারেন নি ঃ সন্তু, এত বছর ধরে তোমাকে বলছি এসো, একবার ঘুরে যাও, এতদিনে তোমার সময় হল বন্ধুর বাড়িতে আসার···

তপোব্রতর আঙুল ঘুরছে ভাতের উপর, ডাল শেষ হয়ে গেছে কখন, মা মাছের ঝোল দিতে ভুলে গেছে, ঈষৎ অধৈর্য, তপোব্রত তাকালো মায়ের দিকে—'ছাড়ো তো মা, অপরা এসেছে তাই ও এসেছে, নইলে থোড়ী না ওর দায় পড়েছে দেখি, ঝোলটা দাও···'

সকালে চা খেতে খেতে বলা অপরার সেই ধাক্কাদেওয়া শব্দগুলো কানু থেকে মুছে যাচ্ছে না কিছুতেই, আর তাই, তেতো গিলে ফেলার মত প্রসঙ্গটা শেষ করতে চায় তপোব্রত। 'আরে, আমি আবার কখন সন্তুর সঙ্গে এলাম—সন্তুই তো আমার সঙ্গে এসেছে—একটা সেমিনার পড়ে গেল, তাই'—কি ক্যাজুয়াল ভঙ্গি, কি চোখে আঙুল দেওয়া নাক উঁচুমি অপরার কথায়, বিশ্রি লেগেছিল তপোব্রতর। সাময়িকভাবে সন্তুর জন্য মায়া হয়েছিল। এ কোন্ মেয়ের পাল্লায় পড়ল ?

দুপুরে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল। অনেকগুলো রাস্তা হাঁটা হল। আজকাল তপোব্রতর একা একা সিনেমা দেখা, একা একা নাটকে যাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু বাইরে খেতে যাওয়ার সময়ে একা একা যাওয়া যায় না। কতদিন পরে এভাবে বন্ধুদের নিয়ে বেরোনো, গোটা রবিবার জুড়ে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি, আজকের দিনটাই শুধু, আগামীকাল ওরা ফিরছে। ঝটিকাসফর····

খেতে যাওয়ার আগে সরোজিনীনগরে যাওয়া হয়েছিল। মার্কেটিং করবে অপরা। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল তপোব্রত—পেছনে অপরারা সের দরে বিক্রি হওয়া শার্ট পেন্টুলুনের হাঁকাডাকির মধ্যে আস্তে আস্তে আসছিল। তপোব্রতর ভেতরে এখন একটু একটু ফাঁকাভাব। দীর্ঘদিন একটিও মেয়ের সঙ্গ না করার জ্বলন। ঈর্ষার ছোট্ট শিখা বুকের মধ্যে ছোট্ট জিভ বুলোচ্ছে, গরম। আচমকা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে মোমবাতির শিখা। তৃষা চলে গেছে বছর খানেকের উপর হয়ে গেছে। শেয়ালদা কোর্টে এখন ঝুলছে দুটি দেওয়ানি একটি ফৌজদারি। দুটো মানুষের তৈরি একটা সম্পর্কের মধ্যে আচমকা তার একার উপর একতরফা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তৃষা চলে গেল কলকাতায়। আর চমৎকার প্রশাসনিক দ্রুততায় দিল্লিতে তার বাড়িতে চলে এল একপ্রস্থ উকিলের

চিঠি। ভারি সুন্দর বন্দোবস্ত। আরো কিছু জিনিষ দেখা গেল, পরে, অনেক পরে, যখন উকিল নিয়োগ করা আর টাকাকড়ির সংস্থান করার ঝামেলায় জেরবার সে, বোঝা গেল আইনগুলো সবই এখন মেয়েদের দিকে···

সুলগ্না নামের সেই কলেজবান্ধবীকে আজ আর মনে পড়ে না। মাস চারেক প্রেম করার পর সুলগ্না একদিন বলেছিল, তপোব্রত, আমার আর পোষাচ্ছে না সেও কিন্তু কোন এক্সপ্ল্যানেশন দেয়নি যাবার সময়ে···মেয়েরা দেয় না।

তপোব্রত যখন বার বার ফোন করে সাড়া না পেয়ে শেষপর্যন্ত একদিন সকাল সকাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুলগ্নাকে ধরেছিল, দাবি করেছিল কি হয়েছে বলতে হবে, সুলগ্না বলেছিল, তোরা ছেলেরা সবাই একরকম। সমাজে যত পরিবর্তন আসছে, আমরা দ্রুত তার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি, তোরা ছেলেরা ততটাই পিছিয়ে রয়ে যাচ্ছিস। এভাবে হয় না। এই সম্পর্কে সব অ্যাডজাস্ট-মেন্টের দায় আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিস কেন? তোরও কিছু করা দরকার। তোকেও ছাড়তে হবে। আমি একলা ছাড়ব না···

—কি ছাড়তে হচ্ছে তোকে? তপোব্রত বিস্ময়ে আকুল তখন···সুলগ্না যে ভুল বুঝছে কোথাও সেটা স্পষ্ট ওর কাছে।

—সবকিছুই। তুই কেড়োরীমল কলেজে চাকরি পেলি, দিল্লিতে সেটল করছিস—তাই আমাকেও এখানেই থাকতে হবে। ইকনমিক টাইমসের গোয়ালিয়র করেসপণ্ডেন্টের পোস্টটা ছাড়তে হবে। ছাড়লাম। বাবার বয়স হচ্ছে, দেখভাল করার লোক নেই, তবু আমার বাবাকেও ছাড়তে হবে। তোর সঙ্গে তোর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে····

—এগুলোকে তুই 'ছাড়া' বলছিস? কি এমন ছাড়া। আমরা একসঙ্গে থাকতে চাইলে এটুকু তো করতে হবেই! বিয়ের জন্য তুই কি এগুলো পারিস না?

—কই, তোকে তো চাকরি ছাড়তে হচ্ছে না? তোকে তো নিজের মাকে ছাড়তে হচ্ছে না?

—কি ছেলেমানুষি এসব! এটা একটা কমপেয়ার করার বিষয় হল? হাসতে থাকে তপোব্রত, বিরাট দুশ্চিন্তা আর চাপের মধ্যেও তার অদ্ভুত হাস্যকর লাগে কথাগুলো। এই প্রশ্নগুলো ওঠে কোথা থেকে?

সুলগ্না হাসে না। খুব শান্ত, প্রায় ছুরির মত শীতল ধারালো গলায় বলে:

তাহলেই দ্যাখ। এগুলো যে ইস্যু হতে পারে এটাও তোর বোধে আসছে না। তোর কাছে এভরিথিং ইজ টেকেন ফর গ্রান্টেড। এই জন্যেই তো আমার পোষাল না তোর সঙ্গে, তপো। এভাবে প্রেম হয় না।

রাগ, রাগ, অক্ষমের মত রাগ হয়েছিল সুলগ্নার উপরে তখন। মেয়েটা ভাবে কি? তার আটবছর পর, দ্রুততায় সম্বন্ধ করে বিয়ে করার পর, সুশীলা, গৃহকর্মনিপুণা তৃষাকে অধিকার করার পর, একটি সন্তানের বাবা হওয়ার পর, উকিলের পত্রাঘাত শ্বশুরবাড়ির বানানো দোষারোপ সবকিছুর পর, রাগটাও আর হয় না তপোব্রতর···মাঝে মাঝে বিশ্রি জ্বালা হয় শুধু। মেয়েদের কিছু একটা হয়েছে।

সন্তু গেছে ওর সঙ্গে কয়েকবার, কোর্টের হিয়ারিঙে। ও তো সব জানে। অপরা কি জানে? অপরা সত্যি কেমন মেয়ে? সন্তুটা ঠান্ডা, মাঝে মাঝে ফিচলেমো করে। আদারওয়াইজ দারুণ বুদ্ধিমান। যেটুকু দেখছে তপোব্রত, অপরার খুব চাকরির গরম। সন্তুর নির্বিরোধ পিসফুল অধ্যাপক জীবনযাপনের সঙ্গে তো প্রথমত সেটাই মেলে না, তারপর···

কে জানে, ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক। তপোব্রতর এখন মনে হয় সবকিছুই ধোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িধোড়। প্রেমট্রেম কিছুই হয় না। শরীরটা ইমপর্টেন্ট, কিছুদিন সেটা নিয়ে ঠিকঠাক চলে, তারপর সব কলগুলো বিগড়োতে থাকে, তেলহীন যন্ত্রের মতন···

'তোমার কোর্টশিপ কেমন চলছে?' ইয়ার্কি করে বলেছে অপরা। মেয়েটা পাগলের মত বাজার করেছে। শুধু সন্তুর জন্য। প্যান্ট কিনল, দুটো শার্ট। পিঠে ফেলে ফেলে যখন শার্টের মাপ মেলাচ্ছে তখন সন্তুর অমন বাধ্য ভঙ্গিতে পিঠ বাড়িয়ে দেওয়ার রকম দেখে হাসি পাচ্ছিল ওর। করে নাও, করে নাও, যাদ্দিন পারো।

একটা দামি চামড়ার বেল্টও কেনা হল। সত্যি বেল্টটা ভালো। অপরার চয়েস। দেখে লোভ হল। তপোব্রতও কিনল নিজের জন্য একটা, তারপর মন খুঁতখুঁত: ধুর, কি হবে এত দামি বেল্টে?

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার কিম্ভূত লাগছিল। মেয়েরা এত পণ্য চেনে! এত কিনতে ভালোবাসে। অপরা নিজের জন্য কিনছে না অবিশ্যি, তবু, একদিনে সন্তুকে ফুলবাবু সাজানোর চেষ্টা কেন? মেয়েরা এই পণ্যায়িত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিকার, কি সহজে খেয়ে যায় বিজ্ঞাপনের টুপিগুলো···

বেল্টটা ঘ্যাম হয়েছে, না তপোব্রত ? অপরা তৃপ্ত গলায় বলল।

হ্যাঁ, ভাল। ঠোঁট দুমড়ে হাসল তপোব্রত। সন্তুর দিকে ফিরে একটু চোখ মেরে বলল ঃ বউ পেটানোর পক্ষে আইডিয়াল।

হেসে উঠল অপরা। তোমার বেল্টটা তো তাহলে জলে গেল!

প্রত্যেক ব্যাপারে অপরার একটা করে কমেন্ট করা চাই।

বাড়ি ফেরার পর লম্বা হয়ে শুয়েছিল ওরা বসবার ঘরের মেঝেতে। গদির উপরে। তিনজনেই। অপরার কোনো আড়ষ্টতা নেই। সালোয়ার কামিজ পরা পা'দুটো বেতের চেয়ারে লটকানো। আগে এসব দেখলে দিব্যি ইমপ্রেসড হত তপোব্রত। এখন কেমন মা-ঠাকুমার মত কণ্টকিত হয়ে ওঠে। একটু বেহায়া, অশালীন মনে হয় অপরাকে। মেয়েদের মেয়ে মেয়ে থাকাই ভালো মনে হয়। যতটা সম্ভব দূরত্ব সম্ভ্রম বজায় রাখাই ভালো।

কলকাতায় কি কি চলছে রে? সন্তুকে জিগ্যেস করছিল তপোব্রত। অনেকদিন কলকাতা ছাড়া। কারা কবিতা লিখছে এখন, কারা গান গাইছে? সুমনের কি খবর? জয় গোস্বামী দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কার পেলেন? ঋতুপর্ণ কেমন করল রে পরের সিনেমাটা?

সন্তু বলল দুহাজার সালে বাঙালিরা চমকাবে। কোন্ একটা কাগজে দিয়েছে যে, যে দশজন বাঙালি দুহাজার সাল শাসন করবেন তাঁদের মধ্যে এক-নম্বরে জয় গোস্বামী, ইন্টার ন্যাশনাল ফিগার হতে আর বেশি দেরি নেই।

তপোব্রত উঠে বসেছিল, আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং? আর কে কে আছে রে ঐ দশজনের মধ্যে?

আছে আছে, আরো আছে, ঈষৎ ঢুলু ঢুলু হয়ে বলল সন্তু, বড় একটা হাই তুলল মুখ বিকৃত করে। 'তুই যাদের কথা ভাবছিস ঃ তপোব্রত চৌধুরী আর সনৎ মুখোপাধ্যায় তো থাকছেই।'

দুজনেই হ্যা হ্যা করে হাসল খানিকটা। তপোব্রত চৌধুরী। বাঃ। সনৎ মুখোপাধ্যায়। গপ্পোটা ভালই। এমন নির্দোষ হাসি বহুদিন হাসেনি তপোব্রত। বহুদিন। অপরা চুলের ক্লিপ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। হাসতে হাসতে উঠে বসল। সত্যি তপোব্রতর অনেক সম্ভাবনা ছিল কলেজে পড়ার সময়। অরিজিন্যাল কাজ করার ইচ্ছে ছিল সোসিওলজিতে। আর সনৎ? অপরা মুঠি করে চুলটাকে একসাথে করে ক্লিপ আটকালো। সনৎ, মিষ্টি ঠান্ডা

সনৎ, কবিতা লেখে তো এখনও। অপরা এবার ব্যাগ থেকে কি যেন বার করছিল···

সন্তুর পরস্পর পিঠ চুলকোনো সমিতি দারুণ পটকা ফাটিয়েছে। এখনও ওদের ঐ হাসির নরম বুদ্বুদ ঠোঁটের কোনায় কোনায়···অপরা টুথব্রাসে পেস্ট লাগাতে শুরু করল: তোমাদের মেমরির কি দুরবস্থা! দুহাজার সাল শাসন করার জন্য আর একজন মেজর ক্যান্ডিডেট ছিল কিন্তু—তার নাম করতে তোমরা ভুলেই গেলে।

—কে? সন্তু সত্যিই আগ্রহী।—কে বলত মালটা? সত্যি কোনো মূল্যবান কবি বা গায়কের নাম ওরা ভুলে যাচ্ছে মনে করে গদির উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল তপোব্রত।

'কেন, অপরা দাশগুপ্ত?'

গজেন্দ্রগমনে অপরা উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। জামা চেঞ্জ করবে, শোবে এবার।

যবনিকা পতন। হঠাৎ নীরবতা। বাথরুমে দরজা আটকানোর শব্দ হল শুধু।

আজ বাদে কাল যার রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট বাজারে বেরোছে সে তো কথাটা বলতেই পারে। অ্যাটলান্টিস মিউজিক, তিরিশ টাকা, তুমি রবে নীরবে। অপরার দেওয়া ধাক্কাটা তপোব্রতর ভেতর আর একবার জ্বালা ধরায়।

মেয়েদের যে কি হয়েছে! □

বই মেলায় বেরোচ্ছে
ছোটদের গল্পের বই
সাগর বিশ্বাসের

সাত আকাশের তারা

সুমতি পাবলিশার্স

শীতলতম দিন

আরতি মুখোপাধ্যায়

হাড় কাঁপানো শীত। লেপ, কম্বল, চা, কফি—কিছুতেই আর ঠান্ডা কাটছে না। কাজকর্মের কোন তাগিদেই আর সাড়া দিতে ইচ্ছে করছে না। শরীর রোদ্দুর চাইছে, মন আরাম। গুটি গুটি পায়ে ছাদে গেলাম। নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়ে রোদ্দুরও যেন দেড় চোখে চেয়ে আছে। তাপের থেকে শৈত্য বেশি, পুরো ব্যাপারটাই যেন দায়সারা।

শহরতলী। বাড়িগুলো প্রায় এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। না আছে কোন প্ল্যান—না কোন ব্যক্তি চেতনা। এক ইঞ্চি জমিও কেউ খেচ্ছায় ছাড়বে না। ফলে এর ছাদে, ওর ছাদে বড্ড বেশি মাখামাখি। আমাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরেই থাকেন বাসুসাহেব। হ্যাঁ ঐ নামেই উনি পরিচিত হতে ভালোবাসেন। বসু-বাবু—নাঃ বড্ড নিম্নবিত্ত-নিম্নবিত্ত ব্যাপারটা। পাড়ার ছেলেরা ওকে 'অমলদা' বলেও ডাকতে চেষ্টা করেছে। না-শোনার ভানে এগিয়ে গেছেন। অতএব 'বাসুসাহেব'। কোনও এক বিজনেস্ হাউসের সর্বোচ্চ পদে আসীন। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় গাড়ি আসে—সুসজ্জিত বাসুসাহেব অফিস যান। গ্যারেজের গাড়ি স্ত্রীর জন্য। রূপসী, বিদুষী, সর্বকর্মে পারদর্শিনী। আমরাও ওঁর গুণপনায় মুগ্ধ। কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন—তাহলে, উনি শহরে না থেকে, তলীতে কেন? এও এক রকমের দম্ভ। পার্কস্ট্রীটে ফ্ল্যাট কেনা আছে, কিন্তু সেখানে তো অমন শ'য়ে শ'য়ে সাহেব। কেউ কাউকে চেনে না। চেনবার আগ্রহটুকুও দেখায় না। কিন্তু এখানে— স্বমহিমায় তিনি দীপ্যমান। সবার থেকে আলাদা—আবার সবার মধ্যে থাকাও।

মিঃ অ্যান্ড মিসেস বাসু ছাড়াও পরিবারে আছে আরো চারজন। দুই মেয়ে, বৃদ্ধ শ্বশুর আর কাজের লোক। এই সব সংসার আমাদের মতন এরে সেরে ভাবে চলে না। বড় মেয়ে ডাক্তারি আর ছোট মেয়ে কনভেন্টে পড়ে। দু'হাজার ওয়াটের আলো জেলে যখন মেয়েরা বেরোয়—সত্যিই তখন নিজেদের বেশ দীন লাগে। এর পাশে পতিত পাবনী বিদ্যালয়ে পড়া নিজের মেয়ের জন্য মনটা মমতায় ভরে ওঠে। আহা কতকিছুই তো ওকে দিতে পারি না।

কিন্তু ইচ্ছে তো করেই। ভেতরে ভেতরে একটা অসুস্থবোধ মশার হুল্ ফোটাতে থাকে, ফোটাতেই থাকে, থামতে চায় না। ওদের কাজের লোকেরও মাপা হাসি, মাপা কথা। চলনে-বলনে 'আম্মোও বা কম কিসে'র মতন আচরণ।

কিন্তু, ব্যতিক্রম কি আর নেই? আছে। আর তা ঐ বৃদ্ধ শ্বশুরে। ছাদে এলেই বৃদ্ধকে দেখা যায়। চারতলার এক প্রান্তে, এক ঘরে ওঁর অবস্থান। বয়সের ভারেই হোক—অথবা অন্য কোন কারণে—কেমন যেন স্বাভাবিক নন উনি। যখনই দেখি—কাগজ পড়ছেন। কাগজ পড়ছেন আর কাগজ পড়ছেন। কৌতূহল হয়। কি এতো পড়েন উনি? এত কাগজই বা আসে কোথা থেকে?

ঠিকে কাজের লোকেরাও তো স্বেচ্ছাসেবী সংবাদ সংগঠন। তুমি শোনো আর নাই শোনো, লোকের বাড়ির খোশ গল্পে এদের জুড়ি নেই। অমন একটির যাতায়াত ও বাড়িতেও আছে। প্রতিদিন ভোর বেলা চায়ের সঙ্গে নিত্য নতুন লোকাল নিউজের সংযোজন।

—জানো বৌদি, দাদুর না বড় কষ্ট।

—কেন রে?

—কি মুক করে সব্জি মিলে। এমন কি রাধাও।

—কেন?

—কেন আবার বার বার খেতি চায় যে।

—কেন, ওঁকে কেউ যত্ন করে না?

—যনত, রাকো দিকিনি তোমার কতা। বাবুরা খায় টেবুল-চিয়ারে, কাঁচের থালায়, আর দাদুর জন্যি—কলায়ের থালা, ঠিক আমাদের মতন।

অবাক হই। কিছু বলতে পারি না। নিজের বাবার কথা মনে পড়ে। কি পরম যত্নে আর সেবায় তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁর দাদার ছেলে। কিন্তু আমি কিছু না বললেও কি আর লক্ষ্মী থামবে!

—হেই ছেদিন গো। খাবার সময় ঢুকি পড়িছিলো ঘরে—তা রাধা টান্তি টান্তি নে গেলো। বুড়োর ভীমরতি ধরেচে, নীচে নেবেচে। চল—চল ওপরে। যেতি কি চায়—খালি বলে, আমিও তোদের সঙ্গে খাবো। বোঝো আবদার।

—লক্ষ্মী, তোর এখনও তিন চার বাড়ির কাজ বাকী। গল্প রাখ। হাত চালা। সেদিনের মতন থামে লক্ষ্মী। মনের মধ্যে যন্ত্রণার কুয়াশা ধীরে ধীরে

প্রগাঢ় হতে থাকে।

একদিন দেখি রাস্তায় নেমে পড়েছেন ভদ্রলোক। চমকে উঠি। উনি বাসুসাহেবের বাবা! তেলচিটে জামা কাপড়, খরায় খাওয়া লোলচর্ম, কত দিনের টান-না-করা চেহারা। হা ঈশ্বর—প্রদীপের নীচে এতো অন্ধকার। ইনিই মিঃ বাসুর সৃষ্টিকর্তা! আঙুল তুলে তুলে কি যেন বলে চলেছেন। জানি—সামনেই বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। ঠিক তাই—একটা মুসকো মতন লোক এসে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেলো ওঁকে। ওদের বাড়ির ড্রাইভার। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়।

এরপর কিছুদিন আর ওঁকে দেখতে পাই নি। একদিন থাকতে না পেরে অগত্যা লক্ষ্মীকেই জিজ্ঞেস করি—

—হ্যাঁরে, দাদুকে দেখতে পাই না কেন?

—তেনার যে বড় অসুক গো। বুকে ঠাণ্ডা নেগেছে। ডাক্তার বলেছে, নিমুনি।

নিমুনি!

তাহলে—জানলা খোলা কেন? চেপে যাই। এ বাড়ির কৌতূহল যদি আবার ও বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়—লজ্জার অন্ত থাকবে না।

কয়েকদিন পর, হঠাৎ দেখি ওঁদের বাড়ির সামনে লরী ভর্তি, বালি, সিমেন্ট, স্টোন চিপস্ আর লোহার রডের ছড়াছড়ি। সংবাদ-দাত্রী জানায়—

—পাথর বসবে গো। দাদা-বৌদির ঘর হবে, এ ঘর পাল্টাবে। দোতলায় ওনাদের আর ভালো লাগতেছেনি। দাদুর ঘরের নাগোয় ঘর হবে। ঐ ধিক্‌টাতেই তো সব থেকে আলো হাওয়া।

—তা হবে।

সময় আসে, সময় যায়। সে কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকেও টুক্‌টাক্ কথা কানে আসে। শুনি না। নিজের আবর্তে নিজে ব্যস্ত থাকি।

আকাশ দেখার বাতিক আমার ছেলেবেলা থেকে। রাত্রি আমাকে টানে। কি বিপুল রহস্যে ঘেরা এই অনন্ত আকাশ। কত শত কন্‌স্টিলেশান। মেষ, বৃষ, সিংহ, কন্যা,—সপ্তর্ষি, ছায়াপথ, সন্ধ্যাতারা, ধ্রুবতারা। নাবিকের দিশারী। হারিয়ে যাই—মাটিতে পা ফেলতেই ইচ্ছে করে না। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য ছাদে যেতে পারি না।

হঠাৎ সেদিন কি হলো। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে এতোতো বড়ো থালার মতন চাঁদকে দেখতে পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। টি. ভি.তে তখন খবর হচ্ছে। বছরের শীতলতম দিন। সোয়েটারের ওপর সোয়েটার, তার ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে—চুপি চুপি ছাদে। পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে আলোয় আলোয়, স্বপ্নময় লাগছে চারিদিক। এত সুন্দর স্বপ্নকে—কেন যে আমরা বাঁচতে দিই না।

হঠাৎ দেখি বাসু সাহেবের বাবার ঘরের জানলায় এক জমাট বাঁধা অন্ধকার। কেউ যেন দুহাত দিয়ে খুলে দিচ্ছে জানলার কপাট। যাতে এতটুকুও অবরোধ না থাকে। একি আমার দৃষ্টি-বিভ্রম না সত্যিই। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নীচে নেমে আসি।

পরের দিনের খবর। না—স্বেচ্ছাসেবী সংবাদদাতা নয়। সে আজ কাজে আসেনি। ও বাড়ির দাদু মারা গেছেন ভোর রাত্রে। সারা বাড়ি শোক স্তব্ধ।

যথা সময়ে ৺গঙ্গা লেখা শোভন সুন্দর চিঠি আসে বাড়িতে। ক্যাটারিং, ডেকরেটর, ফুল, মালা, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কোন কিছুরই ত্রুটি নেই। মিসেস বাসুও খোঁপার পিনে ঘোমটা আটকিয়ে যথাবিহিত আপ্যায়ন করেন। কোথাও কোন ঘাটতি নেই। আয়োজন নিখুঁত।

লক্ষ্মী আবার কাজে আসে। বিমর্ষ হয়েও অনেক অনেক কথা বলে। বক্ বক্ করে। কিছু শুনি, কিছু শুনি না। সাড়ম্বরে শেষ হয় ও বাড়ির রিনোভেশনের কাজ। মিঃ অ্যান্ড মিসেস বাসুর পাথর-ঘর তৈরী। আলো ঝলমল্ শয়নকক্ষ।

কেবল আমার বুকের মধ্যে পীন্ পীন্ করে বাজে—বছরের শীতলতম দিনে নিমোনিয়া রোগীর ঘরের জানলা খুলে দিচ্ছিলো কে? □

প্রশংসিত দুটি বই

বিষ্ণু বিশ্বাসের গল্প সাত পুরুষের গোরস্থান
একুশ শতাব্দী

মলয় দাশগুপ্তের কাব্য পোড়া মাটির কবিতা
অতএব

কবিতা

প্রেম ঃ পেছন ফিরে দেখা / নির্মলেন্দু গুণ

প্রেমসুখে নয়, অর্থলোভে গ্রহণ করেছি প্রস্তাব,
এখন কবিতা লিখতে বসে মহাবিপদে পড়েছি।
আমার বিপদের কথা বিশ্বাস করবেন না জানি
'মানবজমিন' কাগজের রাজু আলাউদ্দিন, তাঁর
বিশ্বাস, তরুণ কবিদের মতোই এখনও আমার
বুকের ভিতরে রয়েছে টগবগে প্রেমের আগুন।

কি জানি, থাকতেও পারে, এমৎ বিশ্বাসে সিনা
টান করে, কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড
ভারশান ৫.১এ খুলে মধ্যরাতে লিখতে বসেছি।

কম্পিউটারে লিখি ঠিকই, তাই বলে কম্পিউটার
লেখে না কবিতা, মাইকেল শ্রীমধুসূদনের মতন
এ অধমকেই ডিকটেশন দিতে হয় বানানসমেত।

ঐরূপ ডিকটেশন দিতে গিয়েই আজ মনে হলো
আছে আজও প্রেম আছে, আজও প্রেম আছে।
মনে হলো রাজু আলাউদ্দিনই সত্য, আমি ভুল,
এইতো দেখতে পাচ্ছি অন্তগামী প্রেমের মাস্তুল
তোমার কটির ভাঁজে প্রস্ফুটিত তিলের মতোন
ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছে জীবনের দরিয়ায়।

ঐরূপ ডিকটেশন দিতে গিয়েই আজ মনে হলো,
আছে ; অধরা, অচিন পাখির মতোই সে আছে
বাড়ির পাশের আরশি নগরে, ঢাকায়, নিউয়র্কে ;
সে আছে কোলকাতায়, কুমিল্লায় বা মেলবোর্নে…
ফুসফুস ভরা বসন্ত—মাতাল বাতাসে, আমাদের
জীবনের পাশে চির-আয়ুষ্মতী হয়ে সে আছে।

হে যৌবন-বাগানের ফুল, হে সুসংস্কৃত কাম,
আমি ভেবেছিলাম ট্রাসবন্ধে ডুবে গেছো তুমি---
আমাকে উন্মাদ করতে তুমি আর আসবে না।
তবে এতকাল পর কেন এই কষ্ট দিতে এলে।
যা নাই তার পেছনে ছোটার দণ্ড দিতে এলে?

কম্পিউটারেরর আচরণ দেখে আজ মনে হলো—
ভাষা যত দখলে এসেছে, প্রেম তত আসেনি।

ভাতাল / ফেরদৌস নাহার

বালুর মাঝে শুয়ে থেকে
একদিন প্রচণ্ড তেতে পুড়ে
ফোসকা উঠাব ব'লে ঘরে ফিরিনি
এই দ্যাখ জ্বলজ্বলে জলে জলে টইটুম্বুর
এই দ্যাখ ক্লান্ত দেহ,
আকাশ বিন্যাস করে
বাতাসে বিনুনী বাঁধে
রাঙাবউ তোর হাতে শাকমাখা ভাত খাব ব'লে
খিলখিল হেসে ওঠে নয়নের মণি

চোখেরও ঘোমটা আছে
আর আছে খসে পড়া আঁচলের ধ্বনি
ভয় হয় কোনো দিন তোকে চিনে
ফোসকা গায়ে যদি ফিরি চড়াল রোদে
পুবে জানালা কি ঠাস্‌ঠাস বন্ধ হবে?

ঘামে ভিজে শেষ রাতে নেয়ে ওঠা
মলগুলে গল্প ভারে লাবন্য পুড়ে যায়
আর যায় স্টেশনের শেষ মালগাড়ি।

কাঠ / রেজাউদ্দিন স্টালিন

কাঠ খুব সুখে ছিলো অন্নবস্ত্রহীন
কবির জন্মদিনে নেতা বলেছিলো ভুল উচ্চারণে ঃ
তুমি এইভাবে দীর্ঘজীবী হও
জনতাও চেয়েছিলো তাই

কবি খুব সুখে ছিলো দীর্ঘজীবনে
অনাহারে অর্ধাহারে কায়ক্লেশে বেঁচে বর্তে থেকে
পূর্ণ করে দিয়েছিলো নেতা আর জনতার দাবি
সততার সব দায় একলা কবির ছিলো
তার যত দুঃখ শোক মনস্তাপ থাক, লিখে যেতে হবে
এসব দেখার দায় নেতা কিংবা জনতার নয়
কবিকে ভাবার মতো সময় কি তাহাদের আছে

তবে তাঁর মৃত্যুদিনে ঘটা করে নেতা পরেছিলো গরদের বেজায় পাঞ্জাবি
জনতাও এসেছিলো কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে
ভুল বাক্যে নেতা বলেছিলো তুমি তো অমর, তোমাকে মারিবার সাধ্য কারো নাই

কবি খুব সুখে ছিলো মৃত্যুর পরে

যখন খুবই / দিলারা হাফিজ

যখন খুবই দুঃখে তুমি একা
কারণ-জলে করলে অশ্রুপাত—
গুচ্ছে-গুচ্ছে দুঃখ তোমার ধার করেছি যতো
সেই সময়ে করলে না দৃক্‌পাত

এখন খুবই সুখে আছো সখা
পুরোনো সেই নষ্ট প্রেমে নয়া
কষ্ট যখন আমার মতোই একা
কী লাভ গিয়ে মরা কিংবা পয়া···

অসীমের অনন্ত নিবিড়ে / রবিউল হুসাইন

আমি তো বেঁচেই আছি, সে তো বেঁচে নেই,
এই দ্বন্দ্ব চেয়ে চেয়ে দেখি প্রতিটি মানুষের গভীরে।
ভালোই তো এই মনোরম বাঁচা, মাঝে মাঝে
মনের মধ্যে সে সশরীরে হাজির হয়। জোরে বলি,

এর কোনো মানে হয়, যেতে হলে একসঙ্গেই যেতাম।
যেমন এ্যাতোদিন গেছি পূর্ণিমার রাতে কিংবা মানুষের
কান্না অথবা শিশুদের কলতানিতে, কী এমন
ক্ষতি হ'তো সেই যৌথ যাত্রায়, তবু সে চ'লে গেলো।

শুনলো না কথা। নিঃশব্দের একটি সাহস আছে।
সেই সাহসে বলীয়ান হয়ে মানুষ খুব শক্তিধর হয়।
আমি তাই ভীষণ সাহসী, একা একা পাড়ি দিই
দুর্গম রাত্রি, ঠান্ডা অন্ধকার, অসহনীয় নিঃসহায়তা।

ধীরে ধীরে ডুবে যাই বিমর্ষ হলাহলে, বিষ নয়, মধু নয়
যাপিত জীবনের অনবদ্য অস্তিত্বে, অসীমের অনন্ত নিবিড়ে।

রাত্রিকথা / টোকন ঠাকুর

শুধু রাত্রি জানে—আমার চোখের নিচে
এক ফালি অন্ধকার কেন জ্বলছে···

আর এই রাত্রির কুয়াশা জানে—আমি কতবার
পথ ভুলে গেছি প্রান্তরের অচেনা প্রবাহে···

আর ওই শেষ তারাটিও মুছে যাওয়ার আগে
যা জেনেছে আমার যন্ত্রণা—আমি তবু এই রাত্রিকে
বিশ্বাস করেছি—
আর একফালি অন্ধকার জালিয়েছি
আমার চোখের নিচে····

এই চক্ষু আলো চেয়ে অন্ধ হয় তবে ?

আজন্ম বাতিক বাতিময় / শওকত হোসেন

চর প'ড়ে থাকি নদীর গভীরে, একদিন জাগি।
শাদা তিমি-শুষুকের পিঠ মাঝির মাস্তুল
যে কোনো দুপুরে জাগি এই সব খেলায়
চিক্‌চিক্‌ রোদ্দুর বুনে সামর্থে অতোখানি
ঢেউয়ের গভীরে নিমজ্জিত ঢেউ—কখনো
উঠে আসে নি, আজন্ম বাতিময়
বিপদসংকেতে ইচ্ছের সবটুকু দূর
ফেনায়িত আকাশে—সমুদ্রনীল।

দিগন্তের অন্ধকারে / অসীম সাহা

দিগন্তের অন্ধকারে শিমুল তুলোর মতো উড়ে যায় শতাব্দীর মেঘ ;
গোধূলির অন্তিম আকাশে তার রঙিন আবেগ
আমাদের ব্যথার ভেতরে তোলে স্বপ্নের, প্রত্যাশার ঝড় ;
শান্ত, স্থির সমুদ্রসৈকতে জাগে প্রাচীন যুগের এক মায়াবী নগর।
তুমি হও মাথার উপরে তার নক্ষত্রের সোনার মুকুট ;
মরুভূমি পার হয়ে যেইখানে উড়ে যায় বেদুইন আর তার সুগভীর উট।

মহাভারত / রাসেল আশেকী

তার চোখ আমাকে দেখালো, গীতার প্রথম হরফ ;
তার বুক আমাকে শোনালো, বাইবেলের শেষ মন্ত্রপাঠ ;
তার লাশ আমাকে বোঝালো, কুরানের জীবন্ত প্রতিবাদ ;
তার হাড় আমাকে চেনালো, এশুকে ফানাফিল্লাহ্‌র দুর্গাহাট !

আর আমি অমৃতপুত্র আশেকী ; কৃষ্ণের বাঁশি হাতে
ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর বিতাড়িত মুহাম্মদের মতো মুখ বুঁজে
উঠানের দেয়াল এবং পৃথিবীর ছাদ ভাঙতে শুরু করলাম।

আঁধারের প্রেমিকা / জীবন নজরুল

সরলরেখা বরাবর হাঁটতে থাকলাম—
উপবৃত্তাকারে আমার বোধ. কেন্দ্রে স্বপ্নগুলো।
আমি স্বপ্নযাজক—ছুঁয়ে দিলাম ঋতুবতী সকাল।
তৃষ্ণার্থ চাতক সর্বস্ব পান করি প্রেম-ভালবাসা আর
আমাদের প্রিয়তমরা সম্মুখে নয় পিছনে তাকায়।
অংকের সঠিক প্রমাণ না জানা কিশোরীকে বলি কানে কানে
পিছনে তাকানো মানে ততটুকু সামনে দেখা
নিরবতা ভঙ্গ করে অন্ধকার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে।
আবহাওয়া বিদ্যা শিখে নিই আমরা ভিনগ্রহী দু'জন।
রোদ্দুরের লোভে তস্কর ঢুকি তোমার প্রথম
লালিত বৃষ্টি উঠোনে।
সরলরেখা বরাবর আমি হাঁটতে থাকলাম—
উপবৃত্তাকারে আমার বোধ, কেন্দ্রে স্বপ্নগুলো
আমাকে ভালবেসেছে আঁধারের প্রেমিকা।

দৃশ্য / আহমেদ স্বপন মাহমুদ

কেন যে কবিতা লেখা এই প্রশ্ন বড়ো উদাসীন।
কেন না পাতা ঝরার দিনে তুমি বসেছিলে
আম বাগানের অনতিদূরে,
পাতা ঝরা দেখো আর শোনো মর্মরিত উদা
একটিও আম পড়েনি, তবু শব্দ হলে দৌড় ;
এইসব হলুদ পাতারা জমে গেছে বড়ো বেশি
ঝরা-শিল্প তুমি বাসো ভালো
তাই কবিতা, হাতি-পাল মারাকদের
ভাঙে আবাসন, পড়ে থাকে খড়কুটো
একসাথে মদ ও বাইবেল
অথৈ উদ্বিগ্ন ভবিষ্যৎ চোখ ;
এবং টিলাবনে ঝুলে আছে হাতিদের ভীতি
এইসব দৃশ্য-রেণু শুনোভাসিত বালিকাদের রাঙা উপ-চোখে
পিপাসায় পার হয়ে পাখি উড়ে যায় অবহেলায়
কেন যে কবিতা লেখা প্রিয় মাংস-হৃদয়
এই প্রশ্ন বড়ো উদাসীন!

কি হবে কবিতা লিখে / নন্দদুলাল ভট্টাচার্য

যতই বলিনা কেন কথা
মরমে পশেনা বুঝি নিশ্চিন্ত বেলায়
অমোঘ মর্মার্থ তার
নিরর্থক নিথর ঝংকার
বোধে অবরোধে বিমূঢ় চৈতন্য তোর
সংঘাতের রক্তে আজ কেন পোড়া মেঘ দাউ দাউ জ্বলে
যে মেঘ বৃষ্টি দিত
শস্যের সোনালি গুচ্ছ অনন্ত আশ্বাস
চাষীর আনন্দ
আজ কেন পোড়া মেঘ দাউ দাউ জ্বলে

দিগন্তে যতই দেখ করুণ শূন্যতা
বিষাদ বলয়
অবলুপ্ত সবুজ আরাম সৃষ্টির প্রলয়ে নষ্ট আহত পলাশ
বুকভরা পবিত্র নিঃশ্বাস অমৃত সমান প্রাণ
সূর্যাস্তের বিপরীতে নেভে না চোখের আলো
সেইখানেই স্বর্ণউষা সূর্যের উদয়
চিরন্তন ভোরের আজান
একদিন ছিলবুঝি ফুলন্ত বাগান ফুল ফল
ব্যাবিলনে
তার জন্য স্বপ্ন রোমন্থন
কর কেন বিপন্ন সময় বলে নগ্ন সমর্পণ

কি হবে কবিতা লিখে
শত শত শব্দ উচ্চারণ বীজ হয়ে চষা ক্ষেতে যদি
না হয় রোপন রূপায়নে অমোঘ প্রয়োগ
জীবনে জীবন যোগ চিত্তে উন্মিলন
নিঃসংশয় হবে নিত্য আরোগ্যের সফল প্রার্থনা
যত কথা বলিনা কেন

সজ্জিত পঙক্তিমালা রুদ্র রায়মঙ্গলের মত্ত ঢেউ
যদিনা ছলাৎ ছল হৃদয়ের সুপ্ত তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
অনুরাগে আবেগে সরবে
একে দিতে পারে তপ্ত
চুম্বনের রক্তিম গোলাপ
কি হবে কবিতা লিখে
নিরর্থক।

জলছবি / শিখা ঘটক

জলছবি মোছ কেন ? জান নাকি জলই জীবন ?
পদ্মপাতায় জল, চোখের পাতায় ভরা জল
অশ্রু দেখনা কেন ! অশ্রুতে বিম্বিত ঝিকিমিকি সূর্যকিরণ।

এ বড় অবাক প্রয়োজন
হয়ত অসম্ভব আজীবন একসাথে মৃত্যুযাপন
তপ্তক সময়ের সঙ্গে নিবিড় বেচাকেনা
বাণিজ্য আর বাটপারি—
ক্ষুধার লগ্ন এলে কে কবে খুঁজেছে অভিধান।

আমাকে নষ্ট করে,
বাসর বঁধুর বেশে একা যাবে বিবাহ সভায়।
তাই মোছ জলছবি, হারিয়ে গিয়েছে ঢেউ
ঢেউ খুঁজে ক্লান্ত হয়েছ !

সব অবৈধ ভালবাসা—
জলছবি হয়ে থাকে
ইতিহাসে, পাথরে, পাহাড়ে।
এই তো জীবন, এই অপ্রেম,
অভিশাপ, মোহ আর তৃষ্ণা অপার।

ঔদাসীন্যে জড়ো হয়েছে শব্দসকল / সমর্পণ মুখোপাধ্যায়

এখন ঘুমের জগতে ম্লান হয়ে ভাসে
অপরিচিত আরও কিছু বাণী
হাতে হাতে গোনা গাথা তাহারা ;

এ ঔদাসীন্যে জড়ো হয়েছে আরও কিছু শব্দ সকল।

কোন কিছু
বেশিদিন স্থায়ী হয় না—
সৃষ্টি ছাড়া ঃ অন্য সম্ভাবনা।

এলোমেলো / /অরিন্দম দত্ত

আমাদের একটি বাড়ি হবে
যার নাম হবে নিরিবিলি
তুমি বলবে—'ও নামে আমাদের
বাড়িই হবে না
আমাদের বাড়ির নাম হবে এলোমেলো'
সে বাড়িতে তুমি আমার কপালে
আলপনা এঁকে দেবে
বুকে এঁকে দেবে কালপুরুষ
আমাদের ঘরে—দোলনা ছাড়া
আর কোন আসবাব থাকবে না।

বাড়ি / পীযূষ ধর

ঘন নরম ঘাসের চারদিকে গাছের সংসার তৈরী করে
দৃশ্য, ভোরের ফেনায় ভেজা রোদ্দুর—মেঘেরা স্নান সেরে
কালো চুলের বিছানো পথে, সূর্যকে কাছাকাছি টেনে, ঠোঁট বন্দী করে
প্রেম। তরুণ ফুলের চোখে, এই উষ্ণ অক্ষর, তখন রক্ত মাংস ফিরে পায়,
ছায়াপথ হাঁটে পাতাছাওয়া ধ্যান মগ্ন বাড়ির অঞ্চল,
কাঁচা রাস্তা-রগ্ন মাটি—আমাদের পত্রালাপ…।

এসো / ব্রত চক্রবর্তী

আজ সকালেও তোমার কথা
মনে পড়ল।

শতাব্দী শেষ হতে আর মোটে একবছর।
মনে হয় তারপরও আমাদের বা
অন্যদের ভালবাসা থাকবে।

ভালবাসা থাকলেই হল।
মিয়নো, ম্লান আর সমস্তকিছু
সেঁকে নেওয়া যাবে ভালবাসার তাপে।

তার আগে এই একটা জীবন,
এসো আঙুল বসিয়ে দিই সবকিছুতে। ালবেসে।
আঙুল, সিলমোহরের ছাপগুলোই
নতুন শতাব্দীতে আমাদের
ভিসা, পাশপোর্ট।

চেরাগ ওম / অনিমা মিত্র

আজ দূরে দূরে অলিন্দে অলিন্দে জ্বলে উঠছে
মাঘের চেরাগ। আর কত বীণাবাদিনী নগরবালা
আঙুলে কাঁদছে মিশ্ররাগ পানশালাঘরে।

আর যত নিরন্ধ্র রাত্রিবালি একাকিত্বের থাম খুলে
হু হু বাতাস নিয়ে ঢুকছে নীলঘরে। মাঘের শীতলস্পর্শ
দু চোখ কাঁদালে আমি বুক খুলে বালিতে ঠেকাই।

বিপননশরীরে মোম গলে আর মুঠো খুলে
ঝুরো বালি পিছলে পড়ে।

আজ দূরে দূরে অলিন্দে অলিন্দে জ্বলে উঠছে
মাঘের চেরাগ সমস্ত বিপনিবাহার উষ্ণ ওম
পাবে বলে।

এই যে আমি / নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

খণ্ড করলাম।
এবং সঙ্গে সঙ্গে সব দাবিদার এসে তুলে নিয়ে গেল।

কবিতা নিল
গদ্য নিল
ছবি নিল

মৃত্যু বলল ঃ আমার ?

এবার পুনরায় খণ্ড করি।
কেউ হাত পাতে না।

শূন্যে তুলে তুলে ধরে বলি, অয়মহং ভোঃ।

পরিপূর্ণ / শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য

যে রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে তার পায়ের তলা থেকে
পথ সরে যাচ্ছে, আকাশ নেমে আসছে মাথার কাছে
অথবা দুলছে পায়ের পাতায়।

এক বোষ্টমী অজান্তে ঢুকেছে তার হৃদয় গভীরে।
গুনগুন করে সুর ধরেছে—'অষ্টম গর্ভের সন্তান,
আমার ইষ্টনাম', চোখের সামনে চান্দ্রমায়ায় গোয়ালিনী
ঘাট মুছে যাচ্ছে।

রাখালের দেহ আর মন যুক্ত হচ্ছে এক সত্তায়, তার
অন্তরের আগুন সে নেভায় এই দীর্ঘ মানব জীবনের
অনু পরমাণু আর ধুলো দিয়ে।

রক্তপাত / মানসকুমার চিনি

অন্ধকারে মিশে থাকে ভুলবোঝাবুঝি
যাবতীয় দুর্ঘটনা
আর সংবাদ মিথ্যে হলে
ফুটতে থাকে অজস্র সমস্যা····

অন্ধকার, অবলুপ্তির পথে
জানালা খুলে গেলে চোখে পড়ে
থলথলে রক্তের একমুখ, ভয়াবহ ।

যে গান গাওয়া হয়নি / সুমিত্রা দস্তচৌধুরী

এক

প্রকৃত ভালোবাসা মানে নিজেকে বিসর্জন
এরকমই চায় যারা ভালোবাসে যাকে
গ্রাস করে, বাঁধে, ছিন্ন ভিন্ন নখরে নখরে,
আমি দেখি আর কেঁপে কেঁপে ওঠে অস্তিত্বের শিকড় বাকড় ।

দুই

ভালোবাসা ধরে রাখতে পারিনা করতলে
কেবলি হারিয়ে ফেলি,
গুছিয়ে, বুঝিয়ে, সাজিয়ে মানিয়ে খেলতে পারিনি খেলা
শুধু গভীরে আরও গভীরে অন্তঃসলিলা করে রাখি কাকে
ভালোবাসা আসে, যায়, ভেসে যায় শিকড় বিহীন ।

হনন / দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

গনগনে হাড়িকাঠে মাথা রাখা ।
নির্দয় দড়িতে বাঁধা চার হাত পা এই,
তাতে লুকোন অজস্র ভয় ।
শুধু 'মুক্তি দে মুক্তি দে' বলে
ঠিকরে বেরিয়েছে চোখ অন্ধ-পরিক্রমায় ।

এখানে আতঙ্ক কাল, উদ্ধার শর্ত সাপেক্ষ।
কুয়োতে কুঁকেছে তার প্রেত-শিরা ভ্রূণ,
গর্ভাশয় ভেঙে পড়ছে অপ্রসব যন্ত্রনায়।
কতকাল সহ্য হবে বলো।
দুঃশাসন টানের ব্যথা অপমান?

এই অপেক্ষার রাত প্রহরবিহীন
বিনিদ্রায় কবন্ধ কাঁদে যত,
নালিপথে ভয়-রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে
ধুয়ে দেয় তার যাবতীয় ব্রত।

শীতের রোদ এবং / শচীন দত্ত

হিমেল শীতের গায়ে বরফ চাদর
আকাশের চিত্রলিপি ধূসর মলিন
ধানের মঞ্জরী হাতে রমণী চপল
হাঁটুর ওপারে শাড়ী ছোপানো রঙিন।

কলকণ্ঠি সে নারীর চোখে স্বপ্ন ছায়া
কাটা ফসলের গুচ্ছ আছে স্তূপাকারে
মিঠে রোদে চক্ষু ঘষে দুটো কবুতর
আগুনের ঝড় বয় রমণী শরীরে।

প্রভু পোখরাণ, আমরা প্রেম বলি / তাপস রায়

দুঃখ বর্ণনা করি, সোমরস ক্রমশ অভাব
দুঃখ বর্ণনা করি, চিঠি নেই, প্রাপ্তিই খরা

ঘন্টা বাজতে বাজতে চলে যায়, উৎসব কোথাও আগুন
নির্ভরতা দাঁতে কেটে খুলে ফেলে গিট, জগৎ বন্ধন
মুঠি খুলে ভাত দেখি কমলে কামিনী
আবার ঘন্টা বাজে শহরের প্রকৃতি পোহানো
কখনো লিখিনা চাঁদ, মেয়েটিও বুক খোলে
পুরনো সাহস
স্বর্গ বর্ণনা করি, মনসার ফণা ভাঙে, মরুভূমি আলো

সূর্যাস্ত / অরুণাংশু ভট্টাচার্য

হ্যাঁ, সবই হলো, আমি বানান করে পড়লাম সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, আমি কঙ্কাল হলে আপনি তবে জ্যোৎস্না অনুবাদ
নিজেকে ময়ূরী ভাবেন, ভদ্রে দেখুন এই যে সন্ধ্যা
আর করুণার মতো অন্ধকার ভেদ করে ওঠা ওই নির্নিমেষ চাঁদ
কেমন অনিবার্য বস্তুজগতের দিকে ধাববান—
দেখে ঠাট্টা করলেন, ভাবলেন
আচ্ছা লোকের হাতে পড়া গেছে
এ ব্যাটা অরণ্যকে নদী ভাবে
এমন যে দুরন্ত চাহনি তার কোনও দাম নেই সোনা !
তুমি শুধু ময়ূরপুচ্ছের কাছে—

তারও তো বানান হয়, তাকে ভদ্রে অঙ্গুলিহেলনে
বিনষ্ট কি করা যায় ?

আসলে সূর্যাস্ত সততই সচেতন মন্দিরের মতো

উল্কাপাত / অভিজিৎ পালচৌধুরী

শহরের প্রাচীর তখন চৈনিক পরিব্রাজক ভেবে এক মৌলবাদীকে
প্রণাম করছিল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে—
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছে দ্রুত।
সাম্প্রতিক উল্কাপাত দেখতে, শহর ছেড়ে গিয়েছিলেন
যে সব নাগরিক, স্থানীয় পৌরসভা তাদের
নৈশভোজের কোন ব্যবস্থাই করেননি।
অথচ আমি নদীর ধারে, হোগলা পাতার ঘরে,
রেড়ীর তেলের প্রদীপ জেবলে দেখি, কবিতার মধ্যে উল্কাপাত,
গদ্যের মধ্যে উল্কাপাত, নাটকের মধ্যে উল্কাপাত,
সংসার, জীবন, মনন, অস্তিত্ব সর্বত্র এক অদ্ভুত উল্কাপাত,
সক্রেটিসের মতন আমি এক মূর্খ কূটনীতিবিদ্—
যাদের নামে রাস্তা হয় না, বিমানবন্দর হয় না
জন্মদিনে ফুল চাষীরা আহ্লাদিত হয় না কখনো
ফাটলহীন জীবন মানুষ মনে রাখতে ভালোবাসে না কোনদিন।

● স্মরণের আবরণে

কবিতা সিংহ

(১৯৩০-১৯৯৮)

বাঙলা কবিতার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কবিতা সিংহ আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। বিদেশে অসুস্থ অবস্থায় কন্যা পরমেশ্বরীর কাছে ছিলেন শেষ সময়টিতে। এই করুণ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের দেশে, উপনিবেশের অবসানের পরেও উপনিবেশিক সংস্কৃতির দেশে কবিতা সিংহ ছিলেন মূর্তিমতী ব্যতিক্রম এই যুগের এই দিনের নয়। আগামী যুগের আগামী দিনের মানবী ছিলেন তিনি। জন্ম ১৯৩১ সালের ১৬ অক্টোবর কলকাতায়। তার শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগের পেছনে বাবা মায়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরী ছিল। বাবার মাধ্যমেই বিদেশী সাহিত্যের সাথে পরিচয়।

বেশ কয়েকটি উপন্যাস, অনেকগুলি ছোট গল্প এবং প্রচুর কবিতা তিনি রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৪০। সমস্ত রচনার মধ্যেই এক প্রতিবাদী আপোশবিহীন চারিত্র্য ধরা পড়ে আমাদের কাছে। যে নারীবাদী সাহিত্য আজ প্রবল জোয়ারের মতো এসে পড়েছে আমাদের জীবনে তার প্রথম দিকের প্রথম সারির লেখিকা কবি ছিলেন তিনি। তিনিই বলেছিলেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কেননা ঈশ্বর ও শয়তান দুজনেই পুরুষ। এই ভান ভণ্ডামি ভরা পুরুষ প্রাধান্যের সমাজে তাঁর প্রতিবাদ ছিল প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ। তাঁর 'সাজে সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণা বৈরী', তিনটি কাব্য গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখের ও মনোযোগের দাবি রাখে। ১৯৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লীলা পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন অমৃতবাজার পুরস্কার এবং নাথমল ভুয়ালকা পুরস্কার। আরো বিশিষ্ট পুরস্কার তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। সুদীর্ঘ এবং সুযোগ্য কর্ম জীবন ছিল আকাশবাণীতে। ১৯৭৯ সালে জার্মানী যান উচ্চতর কুশলতা অর্জনের জন্য। '৮১তে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লেখক ওয়ার্কশপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে আন্তর্জাতিক বইমেলায় আমন্ত্রন পান। বিশিষ্ট লেখক বিমল রায় চৌধুরী ছিলেন কবিতা সিংহের বিবাহসঙ্গী; তাঁদের তিনটি পুত্রকন্যা, কনাদ, রাজেশ্বরী, পরমেশ্বরী।

বাঙলা কবিতার সঙ্গে প্রাণবান বেগবান ধারাটির সঙ্গে কবিতা সিংহের নাম সুদীর্ঘ দিন জড়িত থাকবে। □ কৃষ্ণা বসু

পোড়া তামাকের গন্ধ □ প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
সংরাগ □ ২০ টাকা

প্রত্যুষ অতিশয় রোমান্টিক কবি। তার রোমান্টিকতায় মেশে আধুনিক বিষাদ, মেশে শহুরে ক্লান্তি, কাব্যের ইতিহাস তার জলছাপ রেখে যায়, এবং উত্তর বোদলেয়রীয় রোমান্টিকতার বিমর্ষ ক্লিন্ন ভূমিতে এক অপর হয়ে ওঠে, প্রেম ঠেকে পরা বাস্তব চড়ায় ঃ

"ঝকঝকে সাদা ওয়াশ বেসিন সদ্য তরুণির মতো
চিবুকটি তুলে আছে ; লোকচক্ষুর আড়ালে দ্রুত প্রক্ষালন সারো"

তবে, এই একমাত্রা নয়, মূল স্বরও নয়। তাঁর কাব্যশরীর সবুজ, যদিবা পাহাড় গুল্মের কৃষ্ণসবুজই বা হয়। তাতে বিধৃত থাকে জলজ ফার্ণের স্পর্শকাতর পেলবতা, এবং কখনও অলক্ষে কখনও প্রকাশ্যে উপমা সঙ্কুল পাথর বেয়ে নামে যৌনতার সজীব প্রকাশ। তিনি কুণ্ঠিত নন এই স্টেটমেন্টে ঃ 'শুধু একটা পথের শেষে নদী, শুধু একটা পথের শেষে তুমি'।

তবু তিনি খুঁজে নেন নানা পথ। নাগরিক জীবনের জানলার ফ্রেমে তিনি দেখেন ঃ "ভেসে যাচ্ছে শ্বেত হংসী গ্রীবাহীন ছিন্নমস্তা চাঁদ, / রাত্রির মধ্য প্রহরে মনে পড়ে তাকে, শীতোজ্জ্বল / লোভাত' দুপুরে নৌ-নীল পশমের গোলা, / দু হাতে বুনবার ছ'নম্বর কাঁটা, সাদা তাঁত শাড়ি/ঘর তুলে তুলে আশ্চর্য প্রোফাইল রচনা করে / দীর্ঘচেনা সেই মুখে ম্লানকাঁটা হাসি।"

নির্মাণে কখনও অবিন্যস্ত, কিছুটা অতিকথনের প্রবণতাও আছে, আছে অনিবার্য বলিষ্ঠতাও ঃ "ইথারের সেতু পেরিয়ে মেঘ আসছে, তিল পরিমান / থেকে সার্কাসের তাঁবুর মতো, / প্রসারিত দৈত্যের মতো, বুকের কৃষ্ণরোম ছেয়ে ফেলছে / তীব্র চাবুকের হাল্কা, আলতো দাঁত বসানোর ছায়া / আসমুদ্র পৃথিবী ঢাকছে, কতদূর সরে যেতে পারবে !"

তবু সরে যায়, জীবন থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে নারী, তিনিও সরে আসেন, নারী থেকে কবিতায়, শিল্পে ঃ "তুমি তো তখন আর নারী নও, / তখন তুমি গান শিল্প সুখের বিভ্রম আলো, বিমূর্ত' বেহালার ছড়," এবং এখান থেকে আবারও শরীরি নারীতে ফেরা, নাহোক স্মৃতিতেই সই ঃ "তৃতীয় রাত্রি দিয়েছিলো অমৃত / উদযাপনের কৌটো, ময়ূরের পালক বিভার গোটা সৌরজগত দেখেছি। আকাশ জুড়ে আমার ডমরু হৃদয়ে সেই থেকে শ্বাস পড়ছেনা...।"

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে, অযৌক্তিকতার পথে বছর গুণতির দশমিক প্রথায় অনেক কিছুই বদলে যায়। আর বেশিদিন হয়তো এভাবে কবিতা লেখা হবে না। শেষ বিকেলের আলোয় তাঁর কবিতাও হেসে ওঠে, সহজ হয়ে ওঠে ঃ

"সূর্য তোমার হাত ধরেছে বিকেল বেলার মাঠে
এবার তুমি ছড়িয়ে যাচ্ছো আকাশ থেকে আকাশ
কোথাও কোন শব্দ নেই, বুকের মধ্যে জলের ঢেউ ওঠে
কোথাও কোন শব্দ নেই ভালবাসায় কলস ভরে যায়।"

এটি কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, আছে চৌষট্টিটি কবিতা, রচনাকালের অনুল্লেখ আশ্চর্য করে। ঝকঝকে ছাপা সুবিন্যস্ত এই বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব বহন করে সচেতন ভাবনার লগ্নীর। প্রচ্ছদে তামাক-বাদামী রঙের উপর পাথর ছাপের চিত্র। প্রচ্ছদ লিখনে পুরাতনী টাইপ ফেসের ব্যবহার, এ সবই অতিস্বাদু। এবং সেইজন্যই স্থানবিশেষে অক্ষরের অস্পষ্টতা বেশি পীড়া দেয়। এবং বলতে বাধ্য হই, চল্লিশোর্ধ পাঠকের কথা ঃ দশ পয়েন্টের ঘনবিন্যাসে ছাপা কবিতা চোখে যে চাপ ফেলে, তা যে কাব্যে মনভাসানোর পথ আগলে দাঁড়ায়! □

অভিজিৎ ঘোষ

কিছু ব্যক্তিত্ব কিছু ঘটনা □ **অমিত মুখোপাধ্যায়**
পরিবেশক কলিকাতা সাহিত্যিকা □ **১৩০ টাকা**

বহুদিন যাবত মনে মনে জমে থাকা বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র চিন্তা ভাবনা বিস্তৃত অভিজ্ঞ লেখক অবশেষে পরিণত বয়সে আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ সংগ্রহ "কিছু ব্যক্তিত্ব কিছু ঘটনা"। প্রয়োজনীয় 'পরিশিষ্ট' (পৃ. ২৫৮-৭১) সহ মোট ১৬টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। মূলত বাঙলার বেশ কিছু কৃতী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের এবং দেশবিভাগ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিটলার ও চার্চিল সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা বিষয়ক মননশীল আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধগুলির পরিধি ও ব্যাপ্তি, যথা—রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত। প্রবন্ধগুলির রচনা সম্পর্কে লেখক নিজেই তাঁর সংকলনের ভূমিকায় জানিয়েছেন—"লিখতে গিয়ে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ এসে গেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মহাপ্রতিভাধর মণীষীদের ব্যক্তিত্ব

বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিলক্ষণ অবদান ছিল। চৈতন্যদেব আজ থেকে ৫১০ বছর আগে, 'আপনাতে আপনি বিকশি' ফুটে উঠেছিলেন, বাইরের সাহায্য ব্যতিরেকেই। আজকের দিনে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে, মনকে জড়তামুক্ত করতে। স্বাধীনতা লাভের পর সত্যজিৎ রায়ই সেই বিরল ব্যক্তিত্ব —যিনি নিজের চোখের দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানীগুণীজনের শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ করেছেন, সেই সঙ্গে যারা দেশকে গৌরবান্বিত করতে পেরেছেন আপন প্রতিভার বলে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পর, ধরণীটি তার কিন্তু ব্যাপ্তিতে বিশালতায় বাংলার নবজাগরণের মণীষীদের মতো। এই ধরায় তাই তিনি এসে গেছেন সহজেই"—(কথামুখে)।

আবার, সমকালীন ঐতিহাসিক রূঢ় বাস্তব সত্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতেও লেখক দ্বিধাহীন, নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছেন—"আজ যে পশ্চিমবঙ্গে ভাষা ধর্ম বা বর্ণ নিয়ে দাঙ্গা হয় না, তার কৃতিত্ব রাজ্য সরকারের থেকে অনেক বেশী প্রাপ্য অতীতের এইসব মনীষী-গণের। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় যে ভীষণ দাঙ্গা হয়, যা দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে দেশবিভাগে পরিণতি পায়, তার সম্পূর্ণ দায় ও দায়িত্ব তখনকার মুসলীম লীগ পরিচালিত বাংলা সরকারের, জিন্নার ও জাতীয়তাবাদী জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই দলটির শক্তি বৃদ্ধিতে যাঁরা সহায়তা করেন আমাদের সেই বোধবুদ্ধিহীন নেতৃবৃন্দের। ষাটের দশকের শেষের দিকে ও সত্তরের দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা anarchy-র দিকে চলে যায়, তখনও কিন্তু কেউ যে স্বতন্ত্র বাঙ্গালীস্থান দাবী করেন নি, তার কৃতিত্ব বাংলার নবজাগরণের মণীষীদেরই প্রাপ্য, এই মনীষীগণ তাঁদের সম্মিলিত দানে বাঙ্গালীর মধ্যে সেই পরিণত মানসিকতা বা maturity of outlook আনতে পেরেছিলেন, যার ফলে এ দাবী এখানে কেউ তোলেনি"।—এসব কথা আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই।

বইখানিকে সক্রেটিস গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশক রচনাটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু ছোট হরফ, অস্পষ্ট ছাপা (bad impression) এবং চড়া দাম ও পাতলা সাধারণ কাগজের মলাট ইত্যাদি বইখানি সংগ্রহে আগ্রহী পাঠকদের পক্ষে কিছু বাধা সৃষ্টি করলেও বইখানির উপজীব্য বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশের বিচারে বইখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে, এই আশা করা অসংগত হবে না। □ অ-গ্রন্থাগারিক

ফিরে আসি কোলাহলে □ সমর্পণ মুখোপাধ্যায়
কবিতা সীমান্ত □ কুড়ি টাকা

পরিণতি উৎসের দিকে শেষবারের মতো একবার অন্তত যেতে চায়—এই দার্শনিক সত্য যাঁর কবিতায় নিভৃত আত্মার মতো, সেই কবিকে তো খ্যাতি নেই বলে অমনোযোগে রাখা যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র কাব্যপ্রতিভা নিয়ে মনোযোগে আসতে কে কবে পেরেছেন? তা যদি সম্ভব হতো তাহলে এক একটি খণ্ড সময়ে বহুজন কবি সমাদৃত না হলেও সামান্য গ্রাহ্যটুকু থেকে বঞ্চিত হতেন না। কবিজীবনের এই ট্রাজেডি চিরকালীন।

থাক এসব কথা। আমি বলছিলাম সমর্পণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'ফিরে আসি কোলাহলে' কাব্যগ্রন্থখানির কথা। এমন কোনও অত্যাশ্চর্য গভীর গহন কালজয়ী কাব্য এখানে নেই, আমি অন্তত তা পাইনি এখানে। কিন্তু এ কবির কবিতা খুঁজে দেখলে অদ্ভুত এক অনুভবের ভুবনে থাকা যায়। এ গ্রন্থ পাঠের লাভ এই অনুভব, যার সঙ্গে চমক নেই, চাতুর্য নেই, গলা উঁচু করে বলা কোনও ঘোষণা নেই। কবি এবং তাঁর কবিতা যেন একজন শান্ত শুভময় নিরীহ মানুষের স্বপ্নের কথা। এর খাঁজে খাঁজে দর্শনের নিরুচ্চার পদরেখা।

যে-কথা দিয়ে শুরু করেছি তার সূত্রটি একটু উল্লেখ করি, নাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে না।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'গড়ে দিই আর এক বেড়াজাল' কবিতায় কবি বলছেন: এইসব পাতারা খসে পড়বার আগে পেতে চায় বৃন্তের পরশ / আর একবার। এই কবিতার পঞ্চম লাইনে এসে কবি বলছেন নদীর কথা। অর্থাৎ নদীও পুনর্বার ঝর্ণাধারায় ফিরে যেতে চায়। কত সহজে কবি জীবনের নিবিড় সত্যকে তুলে ধরেছেন যা পাতা ঝরা এবং নদীর বহমানতার মতো সাবলীল। এখানেই কবির আত্মগত অনুভবের মৃদু লয়। কোথাও কোনও শাব্দিক আত্মম্ভরিতা ছাড়াই একেবারে সাধারণ কোনও কথার মতো

করে কবি বলেন : একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে আর এক / লোকালয়ে ফিরে আসার কথা।

তাহলে; আমাদের, আমাদের এই জগতের জন্মের আগের অবস্থাটি ছিল স্বপ্নের এবং এ জীবন, এই সংসার-জীবন, লোকালয় ইত্যাদি কি গভীর অর্থবহই না হয়ে ওঠে! 'ভাবনার বলয়' কবিতাটির কথা এই পরিপ্রেক্ষিতে এসে পড়ে। এও জীবনকে দেখার এক আশ্চর্য নির্লিপ্তি। নিরুত্তাপে এবং আবেগের বাইরে নিজেকে রেখে কঠিন সত্যকে উপলব্ধি। কতখানি মুক্ত মন থাকলে বলা যায়—সমস্ত ঋতু ঘুরে ফিরে নাকি একই কথা বলে এবং জগতে স্থির নক্ষত্রের নিচে একটি নতুন শব্দও আর সংযোজিত হয় না। তবে ওই মূল জায়গায় কবি অবিচল, তা হল—মঙ্গল ও কল্যাণ।

'ভেজা পায়ের আলতামাখা ছাপ' কবিতার স্তরে স্তরে সেই কথা এবং সর্বশেষে এই ছাপ যেন সুগন্ধি হয়ে ওঠে।

তবু মনে হয়—কবির মন কি একটু গেরুয়া রাঙানো নয়? ইতিবাচকতা আছে, আছে কল্যাণবোধ, মঙ্গল চেতনা। কিন্তু এর আধার যেন নির্লিপ্তিই। 'গড়ে নিই আরও কিছু খবর', 'ভোলা যায় না কিছুই', 'এ মৌনতা শুধু একার', 'অনেক কথা', 'নদীর নাম পালান' ইত্যাদি কবিতায় এই সুর বাজে। সর্বত্র যে এই সুর ধ্বনিত হয়েছে তা অবশ্য নয়। কবির চেতনার ধারাটি কোথাও কোথাও এসে যেন তাঁর অন্তরের সত্যের স্বরূপ জানার তপস্যায় মগ্ন হতে পারেনি। ভাবনা প্রবাহের প্রাথমিক স্তরেই কবিতাটি রূপ পেয়ে গিয়ে কবিকে নিবিড় হতে দেয়নি। এসব জায়গায় একটু অতৃপ্ত হতে হয়। উপরন্তু, কবিতাগুলিতে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার যেন গাঢ়তা নষ্ট করেছে। 'কবিতার ভাবনা' কবিতায় কবি নিজেই স্পষ্ট করে দিলেও সন্দেহ জাগে—শুধু কি এই? তবু বলবো—নাম ডাকের মিথ্যা আচরণ ভেদ করে যাঁরা 'কবিতা' খোঁজেন তাঁরা এ কবিতা পেলে লাভবান হবেন। □

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

INDIAN RICE MILL STORES

(ESTD : 1948)

MANUFACTURERS EXPORTERS & IMPORTERS
MACHINERY & ORDER SUPPLIERS

71A, Netaji Subhas Road, (Gupta Mansion), Calcutta-700 001
Phone : 2431019, 2426137, Resi : 276930, Gram : Mill Goods
Factory : 40, Q. Road, Belgachia, Howrah-711 104
Fax : 91-33-2433120, 2426139

Eastern Monochem (P) Ltd.

Manufacturer of various Chlorinated Products

Office :

L-10, Nabadarsha Society
Calcutta-700051
Phone : 512-4326

Nabarun Seva Niketan

Vill + PO. : Pulsita

Dist : Midnapur

Phone : 03228-56251

EKUSH SHATABDI

A Distinctive Bengali Periodical ☐ RN 68099/96
Vol. 3 ● No. 4 ● October—December 1998 ● Rs. 10

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও
নিভৃত কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণে
একুশ শতাব্দীর
আগামী প্রকল্প

দুই কবি : দুই দিগন্ত

●

জন্ম শতবর্ষে কথা সাহিত্যিক
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে
সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়
একুশ শতাব্দী

●

আগামী সংখ্যাগুলিতে বাঙলার এই মহান
লেখকদের প্রতি ফিরে তাকাতে
একুশ শতাব্দী দায়বদ্ধ

ডালিয়া রায় (সত্ত্বাধিকারী) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন-২১ নবাদর্শ, কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক ☐ সাগর বিশ্বাস